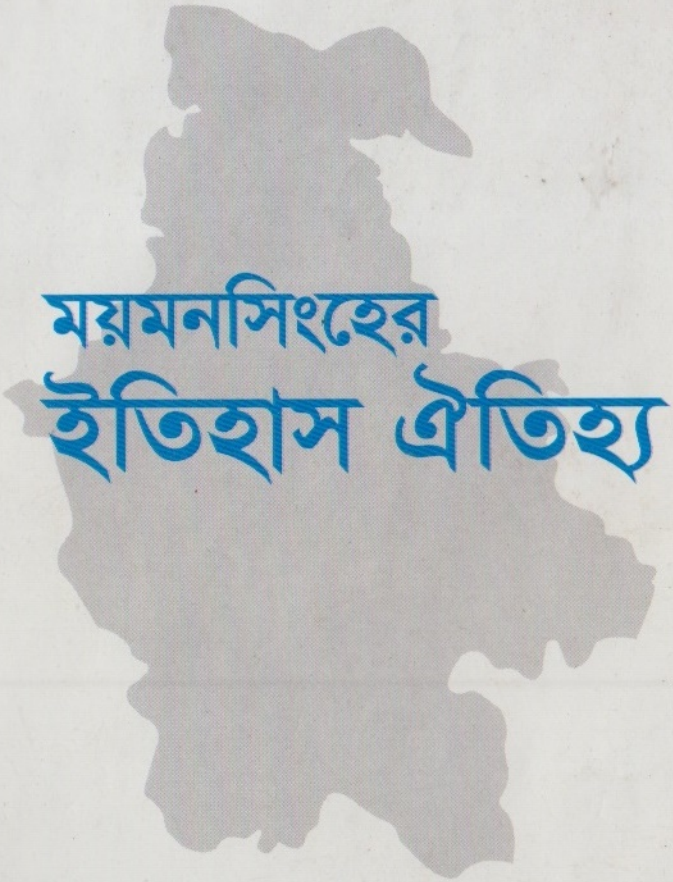

ময়মনসিংহের ইতিহাস ঐতিহ্য

আবদুর রশীদ
গাউসুর রহমান

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রশীদ ১৯৫১ খিস্টাব্দে ৯ এপ্রিল গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতায় এ পরিবারটির ঐতিহ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতা আবদুল করিম এবং প্রপিতামহ আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) প্রাতস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঐতিহ্যের এমন সমৃদ্ধ ও উদারনৈতিক ধারাটির সংগে উত্তর প্রজন্মে আবদুর রশীদ নিজেকে যুক্ত করেছেন শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বহুমাত্রিক আঙ্গিকে। যেখানে সেতুবন্ধন হয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক দৃষ্টির মনোসমীক্ষণ রীতি।

আবদুর রশীদের প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

তুমি আছো বলেই, কেউ জানে না, গাজীপুর জেলার ইতিহাস, ময়মনসিংহের রাজ পরিবার, আবদুর রশীদের নির্বাচিত কবিতা, তিন মনীষীর গল্প।

www.pathagar.com

দেশ বরেণ্য লখক গাউসুর রহমান নেত্রকোণায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকতা আলহাজ্ব আবদুল মান্নান এবং মাতা হোসনেআরা বেগমের জ্যেষ্ঠপুত্র। সহধর্মিণী কামরুন নাহার ও পুত্র সুহৃদ রহমানকে নিয়ে ছোট্ট গৃহকোণে বিচিত্র বিষয়ে তার লেখালেখি ইতঃমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট হিসেবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্নাসসহ এম.এ.এল.এল.বি. ডিগ্রি নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করছেন।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "ঝিনুকে নেই মুক্তো" ও "তাসখেলা পাশাখেলা" পাঠক সমাদৃত হয়েছে।
প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে "নজরুলের কবিতার দশ-দিগন্ত", "জসীম উদ্দীন ও অন্যান্য", (প্রবন্ধ গবেষণা) 'ইসলামী রেনেঁসার কবি ফরুরুখ' (প্রবন্ধ-গবেষণা)"

মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার মানুষ, আলোকিত মানুষ গাউসুর রহমান ছাত্রজীবনে ছিলেন তুখোড় বিতার্কিক। তুখোড় বাগ্মী গাউসুর রহমান জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের ইতিহাস ঐতিহ্য

আবদুর রশীদ
গাউসুর রহমান

টুম্পা প্রকাশনী
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক
টুম্পা প্রকাশনী
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৪৮৬৩

গ্রন্থসত্ব
হাদি-উর-রশীদ (হাদি)

টুম্পা প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ
২১ বইমেলা ২০০৮

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৩

প্রচ্ছদ
মকবুল হোসেন

কম্পিউটার কম্পোজ
মফিজ উদ্দিন

মুদ্রণ
আল মদিনা প্রিন্টিং প্রেস
টিপু সুলতান রোড
ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৩০০.০০

পরিবেশক
নূর কাশেম পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN-984-31-0950-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় ময়মনসিংহবাসী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ময়মনসিংহ এক গৌরবময় জনপদ। দীর্ঘদিনের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার এই ময়মনসিংহ। এককালের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ আজ আর এতো বড় জেলা না হলেও হারানো ঐতিহ্যকে নবীভূত করে ময়মনসিংহ নিঃসন্দেহে অন্য দশটা জেলা থেকে কিছু কিছু দিক থেকে আলাদা ঐতিহ্যের অধিকারী। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র আন্তর্জাতিক খ্যাতি নিয়ে মহুয়া, মলুয়ার এই দেশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উজ্জ্বল পাদপীঠ এই ময়মনসিংহ। এক কালের সোনালী আঁশ পাট এই ময়মনসিংহেই সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হতো। রাজনীতি ও জীবন সচেতন ময়মনসিংহের মানুষ বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ ও ময়মনসিংহের মানুষের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিক আবুল মনসুর আহম্মদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সাবেক রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী, বিচারপতি টি.এইচ.খান, বিচারপতি আবদুর রউফসহ অনেক কীর্তিমান মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এই ময়মনসিংহে। যে কোনো বিবেচনায় ময়মনসিংহের রয়েছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস।

ময়মনসিংহের উপর এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। যে দু'একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে সব গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন পাঠক অবগত। ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর গ্রন্থ রচনা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। 'ইতিহাসের শেষ নেই, শুরু আছে'-এ বিবেচনায় আলোচ্য ইতিহাস গ্রন্থও পূর্ণাঙ্গ নয়। ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কবি, গবেষক আবদুর রশীদ এবং কবি, গবেষক, কলামিস্ট, সহকারী অধ্যাপক গাউসুর রহমান যৌথভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করেছেন জেনে আমি আনন্দিত। "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থের লেখক আবদুর রশীদ ও গাউসুর রহমানকে আমি সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের শ্রম, মেধা, নিষ্ঠার ফসল হিসেবে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে।

এ ধরণের উদ্যোগ সাধারণতঃ সরকারি উদ্যোগে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে লেখক দু'জন ময়মনসিংহের প্রতি দায় ও দায়িত্ববোধ থেকে এ কঠিন কাজটি করেছেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করে তাঁরা যে সদিচ্ছা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা অভাবনীয়। আমি আবদুর রশীদ ও গাউসুর রহমানের প্রতি এ কারণে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর গ্রন্থ রচনার জন্যে ময়মনসিংহবাসী আবদুর রশীদ ও গাউসুর রহমানকে অনেক দিন মনে রাখবেন বলে আমি আশা করি। গবেষণামূলক কাজে লেখক দু'জনের কলম সচল থাকলে ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু তাঁরা পাঠকদের দিতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

মোঃ শাহ আলম বকশী
জেলা প্রশাসক,
ময়মনসিংহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

অনেক গৌরবের সাক্ষী ময়মনসিংহ। অবিভক্ত ভারতের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ এখন আর এতো বড় জেলা নয়। ঘটে ঘটে বিলি হওয়ার মতো ময়মনসিংহ ভাগ হতে হতে এক কালের সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণ মহকুমা নিয়েই বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার সীমানা। আয়তন কমেছে বটে, কিন্তু তাই বলে ঐতিহ্য, গৌরব খন্ডিত হয়নি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বর্ণ-জনপদ হিসেবে ময়মনসিংহের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্যের হিরন্ময় অহংকার। এই ময়মনসিংহকে ইতিহাসের দরবারে হাজির করার অফুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে চঞ্চল আমাদের মন। মনের বীজগণিতকে শুদ্ধ করতে এবং ময়মনসিংহের প্রতি এক ধরণের দায়বদ্ধতা থেকে আমরা "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হই। কাজটি বিশাল এবং দুঃসাধ্য। কঠোর শ্রমেরও। অনেক দিনের শ্রম-ঘাম আর নিষ্ঠার ফসল "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থ। গ্রন্থটির পান্ডুলিপি অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয়-এই দু'খন্ড বের করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করি আমরা। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হলো। এ ধরণের কাজ সরকারি উদ্যোগে সাধারণতঃ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু, ময়মনসিংহের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমতার ফলশ্রুতি হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে গ্রন্থটি প্রকাশ করতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। যার জের হাড়ে হাড়ে টের পেতে হচ্ছে। তারপরও আমরা তৃপ্ত। ভবিষ্যতে হয়তো সরকারি উদ্যোগে কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। গ্রন্থের মান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে যে কথাটি আমরা বলতে চাই, তা হচ্ছে- আন্তরিকতার উত্তাপই এ গ্রন্থের পুঁজি। আমরা সচেষ্ট থেকেছি-গ্রন্থটির মান নিয়ন্ত্রণে, তত্ত্বে, তথ্যে, বিশ্লেষণে সচেতন ও মনোযোগী হতে।

একটি কথা এখানে বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই-"ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন ময়মনসিংহের সাবেক জেলা প্রশাসক ও বর্তমানে সচিব জনাব জাফর আহমেদ চৌধুরী, সাবেক জেলা প্রশাসক, বর্তমানে যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা প্রশাসক, বর্তমানে যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, এবং জেলা প্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ। পরবর্তী সময়ে বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শাহ আলম বকশী আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সুলতান আলম উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের অনেক

www.pathagar.com

অনেক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এই বইয়ের অন্যতম লেখক আবদুর রশীদের কন্যা মাহফুজা নীরা তাঁর বাবার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে আর্থিক সহযোগিতা দিতে কার্পণ্য করেনি। তাঁর প্রতি জানাই স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া, জেলা পরিষদের সচিব শ্রী হরিপ্রসাদ পাল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব ফারুক আহাম্মদের সহযোগিতাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

পেশাদার ইতিহাসবিদ না হয়েও আমরা "ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থ রচনা করেছি সদিচ্ছা থেকে। আমাদের সদিচ্ছা কতোটা ফলবতী হয়েছে, তার বিচারের ভার পাঠকের উপরই ছেড়ে দিলাম আমরা। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে গড়তে হয়। একটি জনপদের ইতিহাস ঐতিহ্য তাই যে কোনো বিবেচনায়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিঃশেষ অনুপ্রেরণার উৎস। এ গ্রন্থ রচনায় আমাদের ব্যর্থতা, অযোগ্যতা, সীমাবদ্ধতা সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে বিনীতভাবে প্রত্যাশা করছি।

"ময়মনসিংহের ইতিহাস-ঐতিহ্য" গ্রন্থের প্রথম খন্ড রচনায় যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ভবিষ্যতেও তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের কাছে পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে জনাব খন্দকার আবদুল গনি, কবি আমিনুল হাসান, কলামিস্ট শ্রী নিরঞ্জন সরকার বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আবদুল ওয়াদুদ ভূঞা এডভোকেট। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আবদুর রশীদ
গাউসুর রহমান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম খন্ড

১.	সীমানা ও প্রাথমিক তথ্য	১১
২.	প্রাচীন মানুষের আগমন	১৭
৩.	প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা	২৪
৪.	মৌর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রশাসন	২৭
৫.	প্রাক গুপ্তযুগ	৩১
৬.	গুপ্তযুগ	৩৩
৭.	পালরাজগণ	৪০
৮.	খরগ ও বর্ম রাজবংশ	৪৩
৯.	সেনরাজ	৪৭
১০.	ময়মনসিংহ ঃ প্রথম মুসলিম বিজয়	৫০
১১.	সিকান্দার শাহ্	৫৫
১২.	গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্	৫৮
১৩.	রাজা গণেশ ও সুলতান জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ্	৬০
১৪.	শামসুদ্দিন আবুল মুজাহিদ আহম্মদ শাহ এবং অন্যান্য	৬২
১৫.	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্	৬৩
১৬.	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদশাহ্.....	৬৬
১৭.	আবুল মুজফফর নসরত শাহ্	৬৮
১৮.	বাঙলায় শের শাহ্ ও অন্যান্য	৬৯
১৯.	সম্রাট আকবর ও বারভূঁইয়া	৭৬
২০.	মসনদে আলা ঈসা খাঁ'র মৃত্যু	৮৪

www.pathagar.com

২১. পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজ-উ-দ্দৌলা ৮৬
২২. নবাবী আমল ১০৪
২৩. কোম্পানি আমলে ময়মনসিংহ ১৩৩
২৪. বাইশ পরগণা হস্তান্তর ১৪৩
২৫. সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ১৪৯
২৬. মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ ১৫৩
২৭. হাতিখেদা বিদ্রোহ ১৫৮
২৮. খাজা ওসমান, সখিনা ও সোনাভান ১৫৯
২৯. ময়মনসিংহের উপজাতি (গারো, হাজং, কোচ)..... ১৬৫
৩০. ময়মনসিংহ নামের প্রেক্ষাপট ১৯৪
৩১. জেলা স্থাপন ও সাধারণ প্রশাসন ১৯৮
৩২. উপজেলা পরিচিতি ২০২
৩৩. জেলা বোর্ড (লোকাল গর্ভমেন্ট)/ জেলা পরিষদ ২৭৬
৩৪. ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য ২৮৪

www.pathagar.com

সীমানা ও প্রাথমিক তথ্য

জেলা ময়মনসিংহ। অনেক গৌরবের স্বর্ণচিহ্ন। ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতির সুতিকাগার। এককালের বৃহত্তম জেলার তক্‌মা এই ময়মনসিংহ জেলাই পেয়েছিল। সেই স্বর্ণতিলক এখনও একেবারে মুছে যায়নি আজো বরং আলোয় আলোয় আশ্চর্য এক দিগন্তরেখা হয়ে আছে। যদিও ময়মনসিংহ জেলা ছ'টুকরো হয়েছে, তবুও ময়মনসিংহ বলতে বিশেষ অর্থে এখনও মানুষ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাকেই বোঝেন। পাহাড়, নদী, বন-বনানী, শ্যামল নিসর্গে ঘেরা অপরূপ এই ময়মনসিংহের দিকে তাকালে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, চির-সবুজ বাংলাদেশের ছবিই রূপময় হয়ে ওঠে। প্রকৃতি বুঝি এখানে তাঁর অদ্ভুত খেয়ালে সৌন্দর্যের নতুন নতুন অন্বেষণে ব্যস্ত-সমস্ত।

কি নেই ময়মনসিংহে ? এর ভূমিকন্যারা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিংবা শ্যামল নৈসর্গের জন্যেই গর্বে মাথাতুলে দাঁড়িয়ে হাজির থাকে। মহুয়া-মলুয়া ও চন্দ্রাবতীর আশ্চর্য্য লীলা-ভূমি বৃহত্তর ময়মনসিংহ তো ময়মনসিংহ জেলাই। ঐতিহাসিক মানচিত্রে তাই তো ময়মনসিংহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা। এই ময়মনসিংহে আছে মেঠোসুরের আলাপন, ফসলের গান, নবান্নের উৎসব আর গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ। যদিও জন্মের উন্মাদনায় উন্নয়নের অনেক প্রচেষ্টাই ভেসে যাবে বলে আশংকা করেন এই জনপদের মানুষ। তবুও দীনতা কিংবা হীনতার কালিমা ময়মনসিংহকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা-কৃষ্টি, ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্বে আলোকিত ঠিকানা ময়মনসিংহকে পেছনে তাকাতে হয়নি। রত্নগর্ভা ময়মনসিংহ প্রকৃত স্বর্ণখচিত এক জনপদের নাম। উৎস মুখ যেন তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য, তার যাত্রা কেবলই সামনের দিকে। এগিয়ে যাওয়া আর জিতে নেয়া অনেক কিছু। ময়মনসিংহ মানে প্রাণের উৎসব। "আমার লোকেরা গান গায়" বলেইতো ইংরেজিতে এর নাম হয়েছে "Mymensingh"।

তখন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১মে। গোড়াপত্তন হলো ময়মনসিংহ জেলার, হলো শুভজন্মের প্রাণঢালা অভ্যর্থনা। চলারপথ কোন সময়ই সমান্তরাল থাকে না। পাহাড় কেটে সমতল ভূমি তৈরীর কঠোর ও রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই ময়মনসিংহকে পথ চলতে হয়েছে বিরামহীন। এ চলার শেষ নেই, যেতে হবে অনেক দূর, দূর-বহুদূর এই বুঝি ময়মনসিংহের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়। অনেক উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে বর্তমান ময়মনসিংহ তার নিজস্ব আদল পায় ১৯৮৪ সালে রূপ-রূপান্তরের খেলায়।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলার অবস্থান ২৪°০২´ ৩১´´থেকে ২৫°২৫´ ৫৬´´ উত্তর অক্ষাংশের ৮৯° ৩৯´ ০০´´ থেকে ৯১° ১৫´ ৩৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে । আয়তন ৪,৭৮৭ বর্গ মাইল। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৮৭১ সালের জেলা কালেক্টরের রিপোর্ট মনে করতে পারি। রিপোর্ট থেকে জানা যায়–তখন এর পরিধি ছিলো ৬,৪৬৪ বর্গমাইল। ১৮৭৪ সালের সীমানা কমিশনের রিপোর্টে এর আয়তন ছিলো ৬,৩১৬.০২ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালের রিপোর্টে এর আয়তন উল্লেখ করা হয় ৬,৩৬১ বর্গমাইল ।

বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা, উত্তরে গারো পাহাড়বেষ্টিত ভারতের আসাম রাজ্য, শেরপুর ও জামালপুর, পশ্চিমে টাঙ্গাইল, আর দক্ষিণে গাজীপুর জেলা। সব মিলিয়ে অনেক ভৌগলিক বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ময়মনসিংহ।

জেলার আয়তন, জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ঘনত্ব (১৮৭২-২০০৪)

লোক গণনায় বছর	আয়তন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	হ্রাস	ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইল
১৮৭২	১৬,১৬৯.৫১৯	২৩,৫৪,৭৯৪	-	-	৩৭৭
১৮৮১	১৬,১৬৯.৫১৯	৩০,৫৮,৩২২	+২৯.৯	-	৪৯১
১৮৯১	১৬,১৬৯.৫১৯	৩৪,৭৪,৯২৫	+১৩.৬	-	৫৬৮
১৯০১	১৬,১৬৯.৫১৯	৩৯,২২,২৪৭	+১২.৭৫	-	৬৩০
১৯১১	১৬,১৬৯.৫১৯	৪৫,৩০,৮৮১	+১৫.৫২	-	৭২৭
১৯২১	১৬,১৬৯.৫১৯	৪৮,৪২,৪৬৭	+৬.৬৮	-	৭৭৭
১৯৩১	১৬,১৬৯.৫১৯	৫১,৩৫,২৬৪	+৬.০৫	-	৮২৪
১৯৪১	১৬,১৬৯.৫১৯	৬০,২১,৫৩৩	+১৭.৪১	-	৯৬৮
১৯৫১	১৩,১১৬.০২৬	৪৫,৫৭,৯৩৯	৪.০৬	-	৯০১
১৯৬১	১৩,১২৬.৩৯৪	৫৫,৩২,৩১৮	+২১.৩৮	-	১,০৯২
১৯৭৪	"	৭৫,৬৬,৮২৫	৩৬.৭৭	-	১,৪৯৪
১৯৯৫	১১৮৯.০০	৪২,৪৩,৯৩৬ (৫০,০০,০০০ আনুমানিক)	-	-	-
২০০৪	১১৮৯.০০	৫৭,০০,০০০ আনুমানিক	-	-	-

www.pathagar.com

১। আয়তন	ঃ	৪৫৮৭ বর্গ কিলোমিটার।
২। লোকসংখ্যা	ঃ	৪২,৪৩,৯৩৬ জন (১৯৯৫ ইং পর্যন্ত) বর্তমান আনুমানিক ৫৭,০০,০০০।
৩। উপজেলা	ঃ	১২টি (ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, ভালুকা, মুক্তাগাছা, ফুলপুর,ফুলবাড়ীয়া, গৌরীপুর, নান্দাইল, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, ধোবাউড়া ও হালুয়াঘাট।)
৪। ইউনিয়ন	ঃ	১৪৬ টি ।
৫। উপজেলা ভূমি অফিস	ঃ	১২ টি ।
৬। পৌর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ	১৪৪টি ।
৭। জলমহাল	ঃ	৪৬ টি ।
৮। হাট-বাজার	ঃ	৩২১ টি।
৯। পৌরসভা	ঃ	১০ টি(১ম শ্রেণী ১টি, ২য় শ্রেণী ২টি, ৩য় শ্রেণী ৭টি)
১০। মৌজা সংখ্যা	ঃ	২,১৭৫ টি ।
১১। গ্রামের সংখ্যা	ঃ	২৮৩৬ টি ।
১২। শিক্ষার হার	ঃ	৪৮.০৬%, মহিলা-৪৪.৮৬%, পুরুষ-৫১.০৩% ।
১৩। পরিবার সংখ্যা	ঃ	১০,২০,৭৮৭ ।

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি
১	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,২৪৯ টি	৭৯৪ টি
২	এন. জি. ও স্কুল	-	১,০৬৫ টি
৩	কিন্ডার গার্টেন	-	৩৩ টি
৪	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	-	৮৬৮ টি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি
১	সরকারি বানিজ্যিক কলেজ	০১ টি	-
২	গার্লস ক্যাডেট কলেজ	০১ টি	-
৩	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	১২৯ টি
৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯ টি	৩৬৮ টি
৫	মহাবিদ্যালয়	৫ টি	৫৭ টি
৬	মাদ্রাসা	-	৩৪৪ টি

উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি
১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০১টি	-
২	আনন্দ মোহন কলেজ	০১ টি	-
৩	মুমিনুননেছা সরকারি মহিলা কলেজ	০১ টি	-
৪	ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	০১ টি	০১ টি
৫	পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট	০১ টি	-
৬	প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১ টি	-
৭	ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১ টি	-
৮	ভকেশনাল ইনস্টিটিউট	০১ টি	-
৯	হোমিও মেডিক্যাল কলেজ	-	০১ টি

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি
১	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	০১ টি	-
২	মাধ্যমিক টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১ টি	-

www.pathagar.com

৩	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	০২ টি	-
৪	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর প্রাইমারি এডুকেশন	০১ টি	০১ টি
৫	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা ও আর্ট স্কুল	০১ টি	-

এছাড়া ত্রিশাল উপজেলায় নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও নজরুল নিকেতনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

স্বাস্থ্য সেবা ঃ

ক্রমিক নং	হাসপাতাল	সরকারি	বেসরকারি
১	ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	০১ টি (বেড সংখ্যা-৫০৩)	০১ টি
২	সি. এম. এইচ	১ টি (বেড সংখ্যা-১৪১)	-
৩	টি. বি ক্লিনিক	০১ টি	-
৪	স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিক	০১ টি	-
৫	মিশনারি হাসপাতাল	-	১টিবেড১৪১
৬	হোমিও হাসপাতাল	-	০১ টি
৭	কুষ্ঠরোগ হাসপাতাল	-	০১ টি
৮	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১১ টি (বেড সংখ্যা-৩১৪)	

জেলার শিল্প কারখানা ও বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য ঃ

বিবরণ	বৃহৎশিল্প	মাঝারী শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	কারুশিল্প
খাদ্যজাত	-	২ টি	-	৭২১ টি
পাটজাত	০১ টি(শম্ভুগঞ্জজুটমিল)		১১ টি	১২৬ টি
বস্ত্রজাত	৩ টি	২ টি	৩২৩ টি	৮৩২ টি
বনজাত	-	-	৬০ টি	-
মুদ্রণ	-	০১ টি	২৭ টি	-
চামড়াজাত	-	-	৩৫ টি	-
অন্যান্য	-	-	৩১৪ টি	৬৪৩ টি
মোট	৪ টি	৫ টি	৭৭০ টি	২,৩২২ টি

www.pathagar.com

কৃষি বিষয়ক তথ্য ঃ

১। মোট জমি	ঃ	১০,৮৬,৯৭৫ একর ।
২। মোট আবাদী জমি	ঃ	৮,৫৫,২৫৫ একর ।
৩। এক ফসলী জমি	ঃ	১,৫৮,৯৩৩ একর।
৪। দু'ফসলী জমি	ঃ	৬,০০,৪১৮ একর ।
৫। তিনফসলী জমি	ঃ	৯৫,৯০৪ একর।
৬। সেচেরআওতাধীন জমি	ঃ	২,৭৩,৪২৭ একর ।
৭। শস্য উৎপাদনের নিবিড়তা	ঃ	২০০% ।
৮। প্রধান প্রধান ফসল	ঃ	ধান, পাট, গম, আলু, মসুর, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, পান, কলা, আনারস, কাঁঠাল ও শীতকালীন শাকসব্জী।
৯। বনাঞ্চল	ঃ	৩৮,৭০১.২৬ একর।
১০। মৎস্য খামার	ঃ	৬৭ (সরকারি ৭টি, বেসরকারি ৬০টি)।
১১। মুরগী খামার	ঃ	৩৯০ টি (২৩৫ টি এবং ব্রয়লার ১৫৫ টি)।
১২। ছাগল খামার	ঃ	১৩৬ টি ।
১৩। মহিষ খামার	ঃ	৭ টি।
১৪। দুগ্ধ খামার	ঃ	১৩০ টি ।

www.pathagar.com

প্রাচীন মানুষের আগমন

প্রাচীন মানুষদের নিয়ে কথকথার শেষ নেই। কতো কথা, কতো কিংবদন্তী। আলোছায়ার খেলা। ঐতিহাসিক সত্য, ঠিক রেখে প্রাচীন মানুষের আগমনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে অনেক বিতর্কের অবসান ঘটবে। বিজ্ঞানের আলোকে ও মুক্তচিন্তার অনুরোধেই আমরা প্রাচীন মানুষের আগমন ও ভবিষ্যত যাত্রাকে বিবেচনা করবো।

সুদূর অতীত, সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল । তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে মানব গোষ্ঠীর জন্ম লক্ষ কোটি বছর আগে। প্রত্নবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত যে, আদিকালে বাংলাদেশে দুটি পথ ধরে প্রাচীন মানুষের আগমন ঘটে। একটি উত্তর পশ্চিম গিরিপথ, অপরটি পূর্ব গিরিপথ। এ ধারণার পশ্চাতে সমর্থন যোগায় চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু পাহাড়ে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পাথরের কাটারি প্রাপ্তির মাধ্যমে। কাটারির গঠন ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগীয় কাটারির সাথে হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তর যুগীয় নিদর্শনাদির সাথে গঙ্গার অববাহিকায় প্রাপ্ত প্রস্তরযুগীয় নিদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়ায় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা আরো সুদৃঢ় হয়। তবে এ উপ-মহাদেশের কোথায় প্রথম আদি মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, তা হলফ করে আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেননি। আমরা যতদূর জেনেছি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির অদূরে সোয়ান নদীর তীরবর্তী একটি পাহাড় খনন কার্যের পর একেবারে নীচের স্তরে অকর্ষিত ভূমিতে প্রাপ্ত অনেক প্রত্ননিদর্শনের উপর গবেষণা চালিয়ে জানা গেছে সেই অঞ্চলে তিন লক্ষ বছর আগে মানুষ বসবাস করতো। ভারতের দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজের নিকট একই সময়ে মানুষের বসতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অজয় নদীর তীরে ক্ষয়িষ্ণু শৈলাঞ্চল শুশুনিয়া জামথোল পাহাড়ের আশেপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে আজ থেকে এক লক্ষ বছর পূর্বের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারপত্র। এমনকি পশ্চিম বঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারের অদূরে ভাগিরথির তীরে দেওলপোতা নামক স্থানে প্রস্তরযুগীয় মানুষের নিদর্শন পাওয়া গেছে। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে আদিমানবের অনেক নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে সত্য, কিন্তু বিশাল বিরাট বিচিত্র এ ভূখন্ডে কি আদিমানবের আবির্ভাব ঘটেনি ?

তাহলে কি আমরা ধরে নেবো, বরফ যুগে শৈত্য প্রবাহে তাড়িত হয়ে আদি মানবগোষ্ঠি আত্মরক্ষার তাগিদে বাইরে থেকে আমাদের উপ-মহাদেশে প্রবেশ করেছে। যদি তাই হয়, তবে কখন কোন পথ দিয়ে বাইরে থেকে আদিমানবগোষ্ঠী প্রবেশ করেছিল, নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিকদের জন্যে এটি একটি জটিল সমস্যা। প্রত্নবিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সমর্থিত আদিমানব বাংলাদেশে প্রবেশের যে দুটি পথের উল্লেখ রয়েছে, তার সাথে আমরা আরো একটি পথের সংযোগ ঘটাতে চাই। আমাদের ধারণা, শেষ বরফ যুগে আজ থেকে এক লক্ষ বছর পূর্বে সমুদ্রের জল বরফ হয়ে উপরে উত্থিত হয় এবং সমুদ্রগুলো প্রায় শুকিয়ে যায় আর নয়তো জল এতো

www.pathagar.com

কমে যায় যে, আদি মানবের অতিক্রমযোগ্য অবস্থায় এসে পোছে যায়। সে সময় ইন্দোনেশিয়া ও জাভার প্রাচীন মানবগোষ্ঠী খাদ্যের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের পূর্বাঞ্চলে, হয়তো এদের একটি গোষ্ঠী সে সময় প্রবেশ করেছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামে। কালক্রমে এদের বর্ধিত বংশধরগণ ছড়িয়ে পরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন নদীতীরবর্তী স্থান সমূহে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার উপর সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ কথার সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা ভবিষ্যতে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পাহাড়ী উপত্যকার আমজাদ হাট নামক স্থানে ধূসর রঙের একটি পাথরের হাত কুঠার আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এটি জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে। প্রত্নবিজ্ঞানীদের অভিমত যে, কুঠারটি দশহাজার বছর পূর্বে প্রত্নপ্রস্তর যুগীয় মানুষের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো, কুঠারটি ব্যবহারকারী মানুষেরা কি নিজেরা এর উদ্ভাবক না এরা বাইরে থেকে এটি নিয়ে এসে ছিলো ? যে পাহাড়ী উপত্যকায় কুঠারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সে স্থানটি ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় শ্রেণীরই একটা অংশ। ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে চট্টগ্রামের রামগড়, সীতাকুন্ডু, ভারতের ত্রিপুরা পাহাড় অঞ্চল একই বেষ্টনিতে অবস্থিত। এ দিকে এ উপত্যকার সংযুক্তি রয়েছে রামগড় সীতাকুন্ড, পার্বত্য চট্টগ্রাম. কাপ্তাই. আরাকানপর্বত শ্রেণী ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে। অপরদিকে এর সংযুক্তি ত্রিপুরার পাহাড় শ্রেণী, আসামের লুসাই পর্বত ও চীনের সঙ্গে। ধারণা করা অবাস্তব নয় যে, প্রত্নপ্রস্তর যুগের শেষে বরফ যুগের সমাপ্তিলগ্নে চীন সীমান্ত দিয়ে আসামে প্রবেশ করে আদিমানুষের কোন একদল। তার পর সেখান থেকে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরায় তাদের অংশ ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ধারণা যে, ছাগলনাইয়ায় প্রাপ্ত কুঠারটি এ জনগোষ্ঠির হাতে ব্যবহৃত হাতিয়ার। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম-গিরিপথ দিয়ে যে জনগোষ্ঠি বাইরে থেকে প্রবেশ করেছিলো তারও প্রমাণ রয়েছে এদেশে প্রাপ্ত অনেক প্রত্ননিদর্শনে। গঙ্গার অববাহিকায় যেসব প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে পাক-ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের সোয়ান সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। যদিও সোয়ান সভ্যতার প্রভাব সমগ্র উত্তর ভারতে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তবে গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে এর কিছুটা মন্থরগতি লক্ষনীয় হয়ে উঠে। এর কারণ এ পথে আগত আদিমানুষেরা দীর্ঘসময় ধরে এখানে বসবাসের কারণে নিজস্বধারায় এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রভাব ফেলতে পেরেছিলো। যা পরবর্তী সময় ধীরে ধীরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় বিস্তৃতি লাভ করে। আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশের তিনটি পথে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠি প্রবেশের দরুণ বাঙালীজাতির চেহারায় জাতিসত্তার কোন একক আকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এদেশের বিভিন্ন উপজাতীয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন লরিকেল (চট্টগ্রাম ও আরাকান) সমতট (ত্রিপুরা ও নোয়াখালী), বঙ্গ (ঢাকা ও ময়মনসিংহ), পুন্ড্র (বগুড়া ও দিনাজপুর), বরেন্দ্র (রাজশাহী ও মালদহ), এবং রাঢ়ের

www.pathagar.com

(পশ্চিম বঙ্গ), অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। অবশ্য আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে এ পার্থক্য ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে বাঙালি আজ শংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। অতিরিক্ত শব্দালংকার ব্যবহারের ফলে কবিতায় তার মৌলিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যেমন মুশকিল, ঠিক তেমনই বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন গোত্রের অতিরিক্ত মিশ্রণে মূল জাতিসত্তা খুঁজে পাওয়া যায় এভাবে-কোন কোন মানুষের শরীর অত্যন্ত হাল্কা লোমে আবৃত। আবার এমন ধরণের মানুষও দেখা যায়, যে ললাট অপ্রশস্ত্ম, চোখ দু'টি উপরে ললাটের কাছাকাছি, নাক ঈষৎ চাপা। একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই কোন বানর প্রজাতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার প্রশস্ত ললাট, স্ফিত বক্ষ, সুডোল দেহবল্লরি সুঠাম বাহুর মংগোলিয়ান জাতিয় লোকের অভাব নেই এ দেশে। এসব কারণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ভিন্নভিন্ন পথে বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করেছিলো বাংলাদেশে। পূর্বে আলোচিত ভূখন্ডের বেষ্টনি একই হওয়াতে বাংলাদেশের মূলভূখন্ড চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এর পাহাড়ী অঞ্চল, নরসিংদীর উত্তরাঞ্চলের গৈরিক পাহাড়ী ভূমি ভাওয়াল ও মধুপুরগড় তথা এক লালমাটির ক্ষয়িষ্ণু উচ্চভূমি ও উত্তরের পুন্ড্রসহ বরেন্দ্র এলাকা এবং বাদবাকি সমস্ত অঞ্চল ছিলো বিশাল হাওর আর সামুদ্রিক হ্রদে নিমর্জ্জিত। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পরিবেশের বিরূপ আঁচড় ও প্রতিবেশের ঝুঁকি নিয়েই মানুষ তখন তাদের জীবনযাত্রাকে সহজ, সুগম ও গতিশীল করার প্রয়াস চালায়। তাদের এই ক্রমাগত প্রয়াস স্বাভাবিক ভাবেই জয়লাভ করে।

চতুর্থ বা শেষ বরফ যুগের শেষে আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে যেসব আদিম মানবগোষ্ঠি হমোসেপিয়েনসদের (মিশর সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও ব্যবিলনের সভ্যতার স্রষ্টা বলা হয়ে থাকে) অংশ প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায়, তাদেরই ক'টি শাখা ছড়িয়ে পড়ে রামগড় ও ছাগলনাইয়া উপত্যকায়। এরা আগুনের ব্যবহার জানতো না। পাথরের অমসৃণ হাতিয়ার দিয়ে পশুপাখি শিকার করে কাঁচামাংস খেতো আর যাযাবর শিকারীর মতো ঘুরে বেড়াতো। এদেরই বর্ধিত বংশধরগণ খাদ্যের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে সিলেট, কুমিল্লার লালমাই ও ময়নামতি সহ নরসিংদীর উত্তরাঞ্চলের গৈরিক পাহাড়ী এলাকা, গাজীপুরের ভাওয়ালগড় ও ময়মনসিংহের মধুপুর গড় অঞ্চল এবং গারো পাহাড় এলাকায়। সম্ভবত এটি নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনালগ্নে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। সে সময় নতুন কৃষিজমির সন্ধানে উত্তরের আদিমমানুষেরা ছড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মপুত্র নদের-উভয় তীরে জেগে ওঠা নতুন স্থলভাগে আর শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরের গৈরিক উচ্চ ভূমিতে। সম্ভবত এ সময়ই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এসব মানুষ আত্মরক্ষা ও কৃষিকাজের সুবিধার্থে কৌম বা গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। আত্মরক্ষার মাধ্যমে অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে মানুষ তাঁর বর্তমানকে সুরক্ষা ও ভবিষ্যতকে বিনির্মাণ করার প্রয়াস পায়।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলার মূলভূখন্ড সংলগ্ন নরসিংদী, গাজীপুর, টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনপ্রাপ্তির পর অস্বীকার করার মতো কোন কারণ নেই যে এ জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ বসবাস করতো। তবে জেলার কোন অঞ্চলে সে যুগে মানুষের বসতি ছিল তা হলফ করে বলা মুশকিল, এ কারণে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়নি। সাভারের লালমাটির অঞ্চল এবং পুন্ড্র ও বরেন্দ্রের কংকরময় ভুমিতে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান চালালে প্রস্তরযুগীয় নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাকচ করা যাবে না। আমাদের স্পষ্ট ধারণা যে ময়মনসিংহ জেলার লালমাটির উচ্চ টিলাভুমিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসবাস ছিলো। এসব মানুষেরা শীতকালে নিম্নভুমির হাওর আর বিলগুলোতে পাখি শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো আর বর্ষা মওসুমে নিম্নভূমি প্লাবিত হলে লালমাটির পাহাড়ী টিলায় আশ্রয় গ্রহণ করতো। এ সময় তারা বন্য পশুপাখির মাংসভক্ষণ করে জীবনধারণ করতো। সাহসে, সংগ্রামে ও প্রত্যয়ে নিয়োজিত মানুষজন নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে নিজেরাই নিবেদিত হয়েছিলো। মানুষ এ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলো যে, ক্রমাগত এগিয়ে চলার নাম মনুষ্যজীবনের সার্থকতা।

বাংলাদেশের মানচিত্রে ময়মনসিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আসছে সেই আদিকাল থেকেই। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ব্রহ্মপুত্রের পলিজ অবক্ষয়ের দ্বারা গঠিত (বলা যেতে পারে থ্রোইং লেয়ার) উর্বর মৃত্তিকার এই অঞ্চল বহু নদ-নদী ও খাদকে পরিবর্তন ঘটিয়ে টিকে আছে। জেলার উত্তরে গারো পাহাড় ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমে টাঙ্গাইল, দক্ষিণে ঢাকা ও গাজীপুর জেলা এবং পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা আজ থেকে পাঁচ/সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিলো বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। শুধুমাত্র ভাওয়াল ও মধুপুর বনাঞ্চল ছাড়া আদিম মানুষজন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-অঞ্চলে বসবাস করতো। মেগাস্থিনিস খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে ইন্ডিকাগ্রন্থের মানচিত্রে দেখিয়েছেন এ জেলা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বভাগ তখন কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিলো। তবে আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মাটিরস্তর নিরীক্ষায় দেখা যায় ভারতের ভূমন্ডলের তুলনায় আমরা নবীন। মজার ব্যাপার হলো আর্যবর্তকালীন উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের পাদমূলে আদিম মানুষের বসতি ছিলো-এ কথার কোন প্রমাণ নেই। যে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে সেগুলোর সবকটিই বাংলার সমতল ক্ষেত্রগুলোতে আবিষ্কৃত। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে প্রত্নপ্রস্তরযুগের সর্বাপেক্ষা ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। বর্তমান সময়ে যে সকল নিদর্শন বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া ও নরসিংদী জেলার ওয়ারীবটেশ্বর গ্রামে খনন কাজে প্রাপ্তি ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বাংলার ইতিহাসে নতুন সংযোজন ঘটাবে। কেননা সি-১৪ কার্বন টেস্টের মাধ্যমে গাঙ্গেয় সভ্যতার নির্মল প্রাপ্তি শিরোনাম মিলে এভাবে ডাঃ দাস বলেন-"Recently Dasgupta Reports (1968) the findings of animal fossil of elephants, horses, cattle, deers etc, from

www.pathagar.com

Susunia hill area. These animal remains have been attributed to the later phase of Pleistocene. But it has been reported again C-14 analysis attributes 40,000 B.C. as the date of these fossil remains." ১৬ নব্য প্রস্তরযুগের পরে মানুষ পাথরের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ধাতুর সাহায্য নেয়। কিন্তু দুঃসাধ্য। তবে এ ধারণা গ্রাহ্য যে হয়ত বিভিন্নস্থানে ইহার প্রারম্ভ" (বাঙ্গলার ইতিহাস ১ খন্ড রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠা-১৪)।

যদিও খনন প্রণালীতে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন, তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, চারটি পর্বের মধ্য হতে প্রথম অর্ধদগ্ধ ঘন কালো বর্ণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এ পর্বের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। বাঙালিরা তাম্রযুগে পলিমাটির নাব্য উপত্যকায় কখন বসবাস করতো, তা সঠিকভাবে বলার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়পর্বে বাঙালিদের শ্বেতবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণ লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রসমূহ পাওয়া গেছে। তৃতীয় পর্বে নব্যপ্রস্তরযুগের পালিশকৃত দু'টি খোদিত মৃৎপাত্র, তামার শলাকা, পাথরের পুঁথি এবং টেরাকোটা মূর্তির অন্তর্ভূক্তি রয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য কিনা জানিনা, ঐতিহাসিকগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি এ পর্যন্ত বৃহৎ ঢাকা জেলার ইতিহাস যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা অতিযত্নসহকারে প্রতিটি বিষয় আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত "বিক্রমপুরের ইতিহাস", যতীন্দ্রমোহন রায় এর "ঢাকার ইতিহাস" ও জেমস টেইলরের 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' বিশেষ ভাবে গৌরবের স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। আমরা তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকবো যুগযুগ ধরে।

সে তুলনায় ময়মনসিংহের উপর তেমন কোন ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কথা সত্যি যে এই ময়মনসিংহের ফোকলোর "ময়মনসিংহ গীতিকা" সারা বিশ্বে আলোচিত, সমাদৃত এবং সাড়াজাগানো একটি আকরগ্রন্থ। এই ময়মনসিংহে যে সকল প্রবাদ পুরুষ জন্মেছিলেন এবং এখনো যারা আছেন তাঁরাইবা কম কিসে? কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইতিহাস সন্ধানে তাঁদের অবস্থান খুঁজে পাওয়া ভার। বর্তমান সময়ে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যে অত্যন্ত মৌলিকভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করে তাকলাগিয়ে দিতে পারেন। শুধু পারেননা আমাদের হাতে অতীতের তথ্যউপাত্ত না থাকার কারণে।

কোন জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস লিখতে হলে প্রথমেই পুরোবাংলার আলোচনা দিয়েই শুরু করতে হয়। যা কিনা ময়মনসিংহের বেলায়ও ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা জানি আর্য জাতি বলে এক জাতি ছিলো এবং তারা বাইরে থেকে আমাদের এই বঙ্গে এসেছিলো। তা হলে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে এ রাজ্যে কোন জাতির বাস ছিল?

আমরা দেখতে পাই ঐতরেয় গ্রন্থে বঙ্গদেশের লোকদের সম্পর্কে অনেক নিন্দা সূচক কথা লিখিত আছে। উল্লেখিত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ দেশে চন্ডাল জাতি বাস করে। এদের ভাষা পক্ষীর মতো। কোন আর্য সন্তান এ দেশে প্রবেশ করলে, তাকে

www.pathagar.com

প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ কথার উপর ভিত্তিকরে পন্ডিতেরা ধারণা করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পুর্বে গঙ্গা অববাহিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোয় আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। এমনকি প্রাচীন পুন্ড্ররাজ্যে (উত্তর বঙ্গ) এ সময় আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু এ সময় বঙ্গরাজ্যে আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ নিদর্শন এখন পর্যন্ত পন্ডিতদের হাতে নেই। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গদেশের নিন্দাসূচক কথা লিপিবদ্ধ থাকায় পন্ডিতেরা ধারণা করেন যে, দূর্ধষ্য চন্ডালবাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের মুখে আর্যরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করতে না পেরে আরণ্যকে তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে "আংগুর ফল টক" শব্দটির প্রয়োগই যথার্থ বলে মনে হয়। অবশ্য রামায়ন গ্রন্থে বঙ্গরাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। রাজা দশরথ তাঁর মহিষী কৈকেয়ীকে বলেছেন কৌশল, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ আমার করতলগত। বঙ্গের রাজাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীবাসুদেব ও চন্দ্রসেন বলে। রামায়ণের উদ্ধৃতির এ অংশটুকু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে তা কতটুকু সত্য। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসারে রামায়ণের ঘটনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দের কাছাকাছি। আর রামায়ণে বর্ণিত রাজাদের নামগুলো আর্যভাষা-ভাষী। অতএব খ্রিস্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দের কাছাকাছি বঙ্গরাজ্য গঠিত হয়েছে বলে পন্ডিত- মহল ধারণা পোষণ করেন না। অন্যদিকে, বঙ্গরাজ্যের রাজাদের নামগুলো আর্যভাষা-ভাষী হওয়ায় গবেষকদের স্পষ্ট ধারণা যে, সেসময় বঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব বঙ্গরাজ্যের তৎকালীন রাজার নাম হওয়া উচিত ছিলো অনার্যভাষায়। রামায়ণের ঘটনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দের কাছাকাছি হলেও রামায়ণ রচিত হয়েছে খ্রিস্টাব্দ সূচনার অনেক পরবর্তীকালে। তাই রামায়ণের উল্লেখিত ঘটনার কোন ভিত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তী সময়ের ঘটনা, মহাভারত গ্রন্থের সভাপর্বে ভীমসেন কর্তৃক পূর্বদিকে বঙ্গরাজ্য বিজয় অভিযানের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ আছে। ভারতীয় প্রত্নবিজ্ঞানী শ্রী বি.বি.লালের নেতৃত্বে হস্তিনাপুরে খননকার্য করা হয়। প্রতিবেদনে যুধিষ্টিরের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী বলে উল্লেখিত হয়েছে। যদিও এ সময়কাল কিছুটা গ্রহণযোগ্য বটে, তবু যেহেতু খ্রিস্টাব্দের অনেক পরবর্তীকালে মহাভারত রচিত হয়েছে, সেহেতু তৎকালীন বাংলাদেশে আর্যবিজয় কোনভাবেই স্বীকৃত নয়। এ ক্ষেত্রে বলাবাহুল্য যে, আর্যব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যবাদপুষ্ট নরপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থে অতিরঞ্জিত গল্পকাহিনীর একাংশ হলো তৎকালীন বঙ্গদেশে আর্য বিজয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধের নন্দরাজাদের পুন্ড্রনগর (বগুড়া মহাস্থান গড়) অধিকারের সম্ভাবনা কোন কোন পন্ডিত নাকচ করেননি। কিন্তু, প্রাচীন বঙ্গরাজ্যে নন্দরাজাদের অধিকার একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন। ঠিক তিনশত বছর পর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক কর্তৃক সর্বপ্রথম বঙ্গবিজিত হলে গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল জেলা সমূহ উত্তর ভারতীয় বৃহত্তর রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ইতোপূর্বে অশোক কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের কথা ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করতেন।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে অশোকের একটি ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কারের পর ঐতিহাসিকগণ তাদের মতপরিবর্তন করেন। সাম্প্রতিককালে গাজীপুর জেলার ভাওয়াল গড়ের অগ্রবর্তী পূর্বাংশে শীতলক্ষ্যার পূর্বতীরে নরসিংদীর পাহাড়ী জনবসতিতে অসংখ্য মৌর্য রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গেছে যে, ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত মৌর্যমুদ্রার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। অন্যদিকে ভাওয়াল গড়ের পশ্চিম প্রান্তে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত ভাওয়াল মির্জাপুর বাজার থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শাকাশর গ্রামে অতিপ্রাচীন একটি প্রস্তর স্তম্ভের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ডাক্তার ওয়াইজ লিখেছেন-"At mirzapur in Bhowal an up right slab called siddhi Madhave is worshipped by the inhabiants, muhammadans sacrificing cocks and hindus swine" স্টেপলটন এটিকে উল্লেখ করেছেন বিষ্ণুস্তম্ভ বলে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম.এ, এর মতে এটি গুরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভটি উচ্চতায় ৬ ফিট বেস্টনি ১ ফিট ৫ ইঞ্চি অষ্টকোণ সমন্বিত। স্তম্ভটি স্থাপনাকাল হতেই যদি বিষ্ণুস্তম্ভ বলে পরিচিতি লাভ করতো, তাহলে বরাহ ও কুক্কুটাদি জবাই/বলি প্রথা প্রচলন হবার কারণ কি থাকতে পারে, কেনইবা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মান্য করে? মাধব শব্দের অর্থ মহাভারত, মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি। মৌনধ্যান ও যোগদ্দারা আত্মার উপাধিভুত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব। ব্রহ্ম বৈর্বত পুরানের ১১০ অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ডে লিখিত আছে-

"মাচ ব্রহ্ম স্বরূপা যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়নীতি বিখ্যাত বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥
মহালক্ষ্মী স্বরূপা বেদমাতা সরস্বতী ।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাংগ্বামীছ মাধব ॥"

এ শ্লোকটির মাধ্যমে জানা যায় যে, মাধব গঙ্গার প্রতিক আবার মহাদেবকে বোঝাতে পারে। মাধবী অর্থ দূর্গা, মাধবস্য পত্নী বলে উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধদেব ও শঙ্কর মহাযোগী। সুতরাং এটি জয়স্তম্ভ হিসেবেই আমরা গণ্য করবো। কারণ মৌর্য সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ ধর্মরাজিকা প্রতিস্থাপন করেছিলেন সমগ্র ভারতে। ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত স্তম্ভের সাথে এই স্তম্ভটির হুবহু মিল রয়েছে, সেটি পূর্ব বাংলার অন্য কোথাও আর নেই। এসকল প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, সম্রাট অশোক পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ ময়মনসিংহ সম্রাট অশোকের অধীন মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত ছিলো।

www.pathagar.com

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের যাপিতজীবনের অধ্যায় ছিলো বিসর্পিল। প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরুদ্ধ প্রতিবেশ নিয়েই প্রাচীন সমাজের নিত্যদিনের পথচলা। ময়মনসিংহ জেলার উঁচু ভূমিতে আদিম মানুষের শিকারিজীবন থেকে কৃষিজীবনের উত্তরণ ঘটে। ফলে মানুষের প্রয়োজন দেখা দেয় স্থায়ীভাবে বসবাস করার। কারণ, জমি থেকে ফসল ফলাবার জন্য একটি দীর্ঘসময় ব্যয় হতো। তারপর ফসল উত্তোলন ও মাড়াই করার জন্যও প্রচুর সময়ের প্রয়োজন ছিলো। এ অবস্থায় তখনকার মানুষজন নলখাগড়া ও লাল শক্ত আঠালযুক্ত মাটির সাহায্যে ঘরবাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ইতিপূর্বে শিকারি মানুষদের যাযাবর জীবন-যাপনের ফলে স্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরির প্রয়োজন ছিলো না। তারা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো আর যেখানে প্রচুর শিকারের জীবজন্তুর সন্ধান পেতো সেখানেই তারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করতো। তারপর আবার নতুন কোন শিকারের সন্ধানে ছুটতো। এ কারণে তারা সমাজ জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু কৃষিজীবনে প্রবেশের ফলে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন দেখা দেয়, যার ফলে তখন থেকে একটি প্রাথমিক যুগের স্থায়ী 'সমাজ ব্যবস্থা' গড়ে ওঠে। অবশ্য এ সময় সমাজগুলো অধিক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠলেও পরিবারগুলো ছিলো একই গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত। অতএব এ সময় গোষ্ঠিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো বলে মনে হয়। আর এ সমাজ পরিচালনার জন্য গোষ্ঠির একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির উপর থাকতো সর্বময় কর্তৃত্ব। গোত্র পরিচালনার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম-কানুন ও অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তির বিধান ছিলো। এমনকি অপরাধীদের সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিলো। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির মধ্যে যেমন শৃঙ্খলা থাকে, তেমনি শৃঙ্খলা এবং শক্তি ছিলো প্রাচীন মানুষের সমাজ জীবনে, সামাজিক আবর্তের পরতে পরতে ।

ঠিক এ সময়েই সমাজে কাজের শ্রেণীবিন্যাস ঘটতে শুরু করে। এক একটি পরিবার কৃষিকাজের এক একটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটি পরিবার যন্ত্রপাতি তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে। অপর পরিবারগুলোও আলাদা কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। যেসব পরিবার সরাসরি কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকতো, তারা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ বন্টন করে দিতো। এর পরিবর্তে কৃষকদের ঘর তৈরি থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র অন্যান্য পরিবারগুলো তৈরি করতো। এই কাজের শ্রেনীবিন্যাস থেকে পরবর্তীকালে মানুষের সামাজিক মর্যাদার শ্রেণীবিন্যাস আরম্ভ হয়। কামার, কুমোর, যুগী, জোলা, সুতার এসব পেশাগত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এ সময়েই। তারপর ধীরে ধীরে এসব পেশাগত মানুষের সন্তান-সন্ততিগণও উত্তরাধিকার সূত্রে নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকে। বিভিন্ন পেশাগত শ্রমজীবী মানুষের বংশবৃদ্ধির ফলে এরা আলাদা স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করে

www.pathagar.com

বসবাস করতে থাকলে ওইসব স্থানের নাম পেশাগত পদবির সাথে সম্পৃক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে এজেলার ক'টি গ্রামের নামের সঙ্গে পেশাগত পদবি যোগ হবার বিষয় লক্ষণীয়। যেমনঃ কুমারগাতা, সুতা তৈরি হতো বলে সুতিপাড়া, যুগিরা বসবাস করতো বলে যুগিপাড়া, জেলেরা যে স্থানে বসতি স্থাপন করতো সেস্থানের নাম হতো জেলেপাড়া। এ ছাড়া প্রাথমিক যুগের জনবসতিগুলোর নামের প্রেক্ষাপট আরো তলিয়ে দেখা যেতে পারে। যেমন একটি গ্রামে বৃহৎ বটগাছের অবস্থান দেখে নাম হয়েছে বটতলা, কদম গাছের অবস্থিতিতে কদমতলী, পিপলগাছের অবস্থিতি লক্ষ্য করে নাম হয়েছে পিপলিয়া। আবার গোত্র বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বাসস্থান হিসেবে স্থানগুলোর নামকরণ লক্ষ্য করার মতো যেমন কোচেরগাঁও, বামন পাড়া, দত্তেরগাও, শম্ভুগঞ্জ, পালপাড়া, জয়মন্ডপ, কালীর বাজার, শ্যামনগর, ভাটগাঁও গুপ্তবৃন্দাবন, কৃষ্ণপুর, তুলন্ধর, সুন্দাইল, চন্ডীপাশা, তারাকান্দা, কাঠালিয়া, বেগুনবাড়ি, তাজপুর, খানপুর, গিয়াসপুর ইত্যাদি। পারিবারিক, সামাজিক জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন মানুষের সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

মৌর্য যুগের গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও বহিরাগত আর্যদের আক্রমনের মুখে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন গোত্রগুলো সাময়িকভাবে হলেও ঐক্যজোট গড়ে তুলতো। মৌর্যযুগে এ অঞ্চলে ক্রমাগত উত্তর ভারতীয়দের হামলার মুখে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতগুলো গোত্র একত্র হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ সময় কয়েকটি পাটক বা পাড়া নিয়ে হতো একটি গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হতো একটি বীথি (কুঞ্জ), কয়েকটি বীথি নিয়ে বিষয় (জেলা), কয়েকটি বিষয় নিয়ে হতো একটি মন্ডল (বিভাগ), আর কয়েকটি মন্ডল নিয়ে হতো একটি ভুক্তি বা প্রদেশ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এই বিন্যাস নিঃসন্দেহে কার্যকরি প্রশাসনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো। প্রশাসনিক পুণর্বিন্যাসের এই উদ্যোগ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পেরিপ্লাস তাঁর "আরেত্রি মরিসাস" গ্রন্থে এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন বীথির নাম উল্লেখ করেছেন। সেটি হলো সুবর্ণ বীথি। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ সোনারগাঁও ভূ-খন্ডকেই প্রাচীন সুবর্ণ বীথি বলে সনাক্ত করেছেন। শীতলক্ষ্যার পূর্ব দক্ষিণে সোনারগাঁও থেকে এর পশ্চাতে উত্তরে টোকনগর পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত লালমাটির ভূ-খন্ড ছিলো প্রাচীন সুবর্ণ বীথির অন্তর্গত। শীতলক্ষ্যার পশ্চিম তীর ভাওয়াল ও মধুপুরগড়ের অন্তর্ভূক্ত সকল লাল মাটির অঞ্চল মৌর্যযুগে কি নামে পরিচিত ছিলো, তার কোন প্রমাণ আজ অবধি ঐতিহাসিকদের হাতে নেই। তবে জনবসতি ও তৎকালীন ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবর্ণ বীথির বিস্তৃত অঞ্চল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে তখন ঘন বসতি ছিলো বলে মনে করা যায় না। কারণ, এ সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনবসতিগুলোর নাম পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রাচীন বসতিগুলোর নামের সংগে জড়িয়ে আছে মাগধী, প্রাকৃত ও শৌরসেনী শব্দ আর

www.pathagar.com

মধ্যযুগীয় বসতিগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত শব্দ। তবে বৌদ্ধ শাসিত এলাকায় কিছু পালি ও মুসলিম শাসিত অঞ্চলে আরবী ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, আধুনিক যুগে প্রতিষ্ঠিত জনবসতি গুলোর নামকরণের সংগে কিছু ধর্মীয়প্রভাব থাকলেও অনেক নিখাদ বাংলাশব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। আধুনিক বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলার তথা জনসবতি গুলোর নাম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নামের যে শব্দটি শেষে রয়েছে-সেটি বিভিন্ন অক্ষর বা শব্দ, এ কারণে তাঁর ব্যাখ্যা অবশ্যই গবেষণার দাবীদার। যেমনঃ দহ, ডাংগা, দীপুর, গ্রাম, গাঁও, গঞ্জ, তলা, দিয়া, কান্দা, পাড়া ইত্যাদি। আবার কোন নামের শব্দের শেষের অক্ষরটির সঙ্গে একটি আকার অথবা ইকার দিয়ে উচ্চারণ হয় রসপী, সুবচনী, ডেমরা, কসবা ইত্যাদি। আলোচিত এসব নামের অর্থ ও ভাষা নিয়ে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। তবে ভাওয়াল, ময়মনসিংহ ও সুবর্ণ বীথির কিছু অঞ্চলের জনবসতি নামের শেষে 'ব' সংযুক্ত রয়েছে, যেমন টেংড়াব, বরাব, টাঙ্গাব, উজলাব ইত্যাদি। 'ব' যুক্ত প্রতিটি গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করা হয়েছে। সবগুলো গ্রামই লাল মাটির উচ্চভূমির উপর কোন না কোন নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। শব্দগুলোর ভাষা এবং শেষে সংযুক্ত 'ব' এর অর্থই বা কি, এ এক বিরাট জিজ্ঞাসা ! কিছু কিছু পন্ডিত মনে করেন যে, নামের শেষে 'ব' যুক্ত গ্রামগুলো এ সকল অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন গ্রাম। এমনকি এসব গ্রামের প্রতিষ্ঠাকাল মৌর্য আমলেরও অনেক আগে হতে পারে। এর পিছনে ভাষাতাত্ত্বিক সমর্থন খুব একটা পাওয়া না গেলেও পন্ডিতগণের এই অনুমান তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মৌর্য পূর্ব সময় এ অঞ্চলের সমাজ, জীবিকা, শিল্প ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা করা যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে এদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের বিষয় সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না। এটি সত্য যে, সামাজিক কাঠামো সুসংহত না হওয়ায় এবং সমাজের সবক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা বিরাজ করায় ধর্ম, সংস্কৃতি, মানুষের আচার-আচরণের একটি প্রমিত মানদন্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে যৌথভাবে বসবাসের প্রয়োজনে প্রাচীন সমাজের মানুষদেরও কিছু অনুশাসন ও মূল্যবোধ নিয়ে জীবন-যাপন করতে হতো। সে মূল্যবোধ উচ্চমাপের না হলেও মূল্যবোধের শূন্যতার মধ্যে এসব অনুশাসনই ছিলো এক ধরণের পূর্ণতা।

www.pathagar.com

মৌর্য, হিন্দু বৌদ্ধ প্রশাসন

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা যে কোনো প্রশাসনের জন্যই গুরুত্বপূর্ন। এটি মৌর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রশাসনের ক্ষেত্রেও খাটে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারাবাহিকতায় প্রাচীন বাংলার পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ হচ্ছে একটি। এই পাঁচটি রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও নিজ নিজ সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তবে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য বিতর্ক ছিলো এই বলে যে, বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ ও চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ নিয়ে বৃহৎ বঙ্গের অবস্থান ছিলো। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এখন একমত পোষন করেন যে বৃহত্তর ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত ছিলো প্রাচীন বঙ্গরাজ্য। প্রাচীন বঙ্গের সীমানা নির্দেশ করেছেন পন্ডিতগণ এভাবে-পূর্বদিকে মেঘনা নদী, পশ্চিমে যমুনা, উত্তরে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিনে বড়গংগা (বুড়িগংগা)। খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে গ্রীক ভৌগোলিক দিওদোরাস ভারত বর্ষ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দিতে টলেমি তাঁর গ্রন্থে এ দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে তিনি বঙ্গরাজ্যের নাম উল্লেখ করেননি। তাহলে আমরা ধরে নেবো এ সময় বঙ্গ অন্য কোন নামে পরিচিত ছিলো? আধুনিক পন্ডিতদের সিদ্ধান্ত যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে মেঘনার পশ্চিম ও বর্তমান যমুনার পূর্বতীরের ভূখন্ড নরসিংদীর লাল মাটির পাহাড়ী অঞ্চল, গাজীপুরের ভাওয়াল গড়সহ সমগ্র লাল মাটির অঞ্চল, ঢাকার সাভারসহ সমগ্র লাল মাটির অঞ্চল, টাংগাইল জেলার লাল মাটির উচ্চ ভূমি ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর গড়সহ লাল মাটির অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিলো গোড়ার দিকে প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য এবং এ এলাকাগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দিতে সম্রাট অশোকের বিজয়ের মধ্যদিয়ে সর্বপ্রথম আর্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। লাল মাটির পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের একটি গভীর খাদের পাশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবিস্কৃত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বের আকরিক লোহায় তৈরি অসংখ্য হাত কুঠার, অনেক বর্শাফলক ও ধনুকে ব্যবহারযোগ্য পাথরের গুটিকা। তাছাড়া অশোকের একটি অনুশাসন আধুনিক জালালাবাদে পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে এই ধারণার সমর্থন মেলে যে পশ্চিমে আরাকোশিয়া থেকে পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) রাজ্য বস্তুত মৌর্য সাম্রাজ্যেরই অংশবিশেষ ছিলো। ইতিপূর্বে এ তথ্য গ্রীক সূত্রে পাওয়া। সূত্রে বলা হয়েছিলো চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তির ফলে এ রাজ্যটি চন্দ্রগুপ্ত লাভ করেছিলেন। চীনা পরিব্রাজকের বিবরণ থেকে জানা যায় কাশ্মীরের একটি অংশ অশোকের অধীন ছিলো। আর শ্রীনগর শহর তাঁর সময়েই নির্মিত হয়েছিলো। নেপালের কিছু অংশও একই রাজ্যের করতলগত ছিলো। আবিস্কৃত শিলালিপি ও লিখিত সূত্র থেকে জানা যায় বঙ্গদেশও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃ-তাত্ত্বিক নিদর্শন অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। মৌর্য আমলে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন রাজা। যিনি ক্ষমতার চক্র আবর্তিত করেন। তিনি পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ডের মালিক ছিলেন। সংক্ষেপে বলতে হয় ভারতীয় রাষ্ট্র বিকাশের এক নতুন স্তরে এটা তাঁর তাত্ত্বিকরূপবৈকি। বংশ পরম্পরা সূত্রে

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারের নীতি মেনে চলা হতো। রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তানই সিংহাসনের আসন পেতো। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যেতো রাজার ছেলেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো দীর্ঘদিন ধরে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় নিযুক্ত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিস কর্তৃক একটি শিলা লিপিতে বর্ণিত হয়েছে "দুষ্ট ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার ভয়ে রাজা দিনের বেলা ঘুমোন না, এমনকি রাত্রেও থেকে থেকে বিশ্রাম স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন তিনি। রাজা যখন শিকারে বেরোন তখন তিনি পরিবৃত থাকেন স্ত্রীলোক দিয়ে, আর স্ত্রী সঙ্গিনীদের আবার ঘিরে থাকে বর্শাধারী দেহরক্ষীদের ব্যূহ। রাজার মৃগয়ার যাত্রাপথ ঘেরা থাকে দু'দিকে টানা দড়ির বেষ্টনি দিয়ে। একমাত্র পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকদেরই এই দড়ির বেষ্টনির মধ্য দিয়ে হাঁটার অধিকার আছে। অন্যকোন হঠকারি ব্যক্তি এই বেষ্টনির মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সর্ম্মুখিন হতে হতো।" মৌর্য রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো রাজপুরোহিত। যে ব্যক্তি রাজপুরোহিত নির্বাচিত হতেন, তাঁকে কঠিন পরীক্ষার সর্ম্মুখিন হতে হতো। রাজা রাজকর্মচারিদের উপর গোয়েন্দাগিরির প্রচলন অব্যাহত রাখতেন। শুধু রাজকর্মচারিদের উপরই যে তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখতেন তা নয়, শহর ও গ্রামের সাধারণ অধিবাসীও এর কবল থেকে মুক্ত থাকতেন না। কৌটলীয় অর্থ শাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে রাজা রাজপুত্রদের উপর বিশেষভাবে নজর রাখতেন যাতে "পিতাকে ভক্ষণ করে বাগদা চিংড়ি" এ মতো ঘটনা না ঘটে যায়। রাজা, রাজপুত্র, রাজার মৃগয়ায় গমন, রাজার স্ত্রীসঙ্গিনী বেষ্টিত থাকা, রাজ কর্মচারী ও প্রজাসাধারণের উপর নজরদারির ক্ষেত্রে মৌর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রশাসনও সচেষ্ট ছিলো।

রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যাস্ত ছিলো রাজার মন্ত্রীমন্ডলীর উপর। তবে মৌর্য আমল থেকেই এটির প্রচলন শুরু হয়েছিলো এ কথা হলফ করে বলা যাবে না। "জনপ্রতিনিধি সভা" যেমন তৎকালীন একাধিক সূত্র থেকে জানা যায় অশোক স্বয়ং রাজ সভার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। যেটি আমরা পিতঞ্জলির ব্যাকরণে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দি) দেখতে পাই। এ সমস্ত তথ্য প্রমাণের আলোকে ইতিহাসের পাতাকে আলোকিত করলেই ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি দূর হয় এবং ইতিহাস তার আপনগতিতে অগ্রসর হতে পারে।

খ্রিস্টিয় তৃতীয় চতুর্থ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ গুপ্ত, খড়গ, পাল বর্মন ও সেন রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হয়েছে। এ রাজবংশগুলো হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারি ছিলো। প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলো অনুশীলনে দেখা যায় যে, এ দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় মৌর্য শাসনের অবিকল ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান। রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল ক্ষেত্রে মৌর্য শাসনের মৌলিক রীতিনীতি অক্ষুন্ন রেখে কোন কোন সময় ঈষৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে মাত্র। মৌর্য শাসনের আদলে বাংলাদেশ শাসিত হবার বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে।

মৌর্য আমলের প্রশাসনিক 'উপবিভাগ মন্ডল' ছিলো আধুনিক বিভাগের সমতুল্য, আর 'বিষয় উপবিভাগ' ছিলো জেলার সমতূল্য। গুপ্তআমলে বিষয়কে আধুনিক বিভাগ আর মন্ডলকে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক উপবিভাগে পরিণত করা হয়। ক্ষুদ্র প্রশাসনিক

www.pathagar.com

উপবিভাগ "বর্গ" এর অবলুপ্তি ঘটিয়ে "কুল" নামক একটি নতুন উপবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলাদের পদবির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদবি পরিবর্তন করে মহামাত্র এর স্থলে উপরিক বা "মহাউপরিক" রাখা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে সময়ে সময়ে। সময়ের প্রয়োজনে এবং প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থেই তা করা হয়েছে। আমলাদের পদবি পরিবর্তন হয়েছে কখনো কখনো প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে। আবার কখনোবা নিছক খেয়ালের বশে কিংবা আমলাদের তুষ্ট করার জন্যে। আকর্ষণীয় পদবী আমলাদের কাজকর্মে গতিশীল হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করে বলেই এমনটি করা হয়েছে।

রাজকুমারগণ ভূক্তির শাসনকর্তা নিয়োজিত হলে তার পদবি হতো মহাউপরিক। সম্রাট স্বয়ং রাজ পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ পদে নিয়োগের (বিধান) ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। যুদ্ধে পারদর্শিতা, অমিততেজ, বিশ্বস্ত ও অসীম সাহসিকতা ছিলো এ পদে নিয়োগ লাভের প্রধান যোগ্যতা। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এক ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। কর্মের স্বীকৃতি লাভের জন্যে তখন সকলেই সাধ্যমতো নিজদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন।

সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ, অর্থ ও রাজস্ব বিভাগ এবং ধর্মীয় বিভাগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হতো। প্রত্যেক বিভাগ পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োজিত ছিলো। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুকরণে প্রদেশেও রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত ছিলো। ভূক্তির প্রাদেশিক শাসন কার্যে উপরিককে সহযোগিতা করতেন প্রাদেশিক রাজস্ব কর্মকর্তা মহাভৌগিক, বিচারপতি মহাদান্ডিক, পুলিশ কর্মকর্তা মহাপ্রতিহার ও সেনা বাহিনী প্রধান মহাবলাধ্যক্ষ। এ সব কর্মকর্তাদের ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর ও তাঁদের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োজিত ছিলো। সে আমলের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় যে সব প্রশাসনিক উপবিভাগ ও আমলাদের পদবির কথা জানা যায় তাদের একটি তালিকা প্রণিত হলোঃ

প্রশাসনিক কেন্দ্র	প্রশাসনিক অধিকর্তা	রাজস্ব বিভাগীয় অধিকর্তা	বিচার বিভাগীয় অধিকর্তা	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহামাত্র	মহাভৌগিক	মহাদান্ডিক	মহামহত্তর
মন্ডল (বিভাগ)	মান্ডলিক	ভৌগিক	দান্ডিক	মহাত্তর
বিষয় (জেলা)	বিষয়পতি	ভোগপতি	দান্ডপাশিক	নাগরিক
বীথি (থানা)	বিথীপতি	শৌল্কিক	দন্ডশক্তি	স্থানিক
বর্গ (ইউনিয়ন)	বর্গিক	গোপ	দাশাপরাধিক	দাশবর্গিক

সপ্তম শতকের শুরুতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজস্ব ইউনিট হিসেবে গড়ে ওঠে। এ সময় থেকে খর্গপাল ও চন্দ্র রাজাদের অপ্রতিহত শাসন ক্ষমতা একাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দীর্ঘ এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের শাসন যন্ত্রে আরো অনেক নতুন আমলার পদসৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী প্রভূত উন্নতি লাভ করে, ফলে

www.pathagar.com

নতুন নতুন হাতিয়ার ও যানবাহনের সংযুক্তি ঘটে। ঠিক এসময়ে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। সৃষ্ট এ বাহিনীর পদগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই ধারণা করা যায়। যেমন-তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কঃ শরভংগ, হস্তিবাহিনীর অধিনায়কঃ মাহাপিলু-পাতি, উষ্ট্রপাল বাহিনীর অধিনায়কঃ ব্যাপৃতক, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধিনায়কঃ সীমান্তপাল, দুর্গ অধিনায়কঃ কোটপাল, যানবাহনের অধিনায়কঃ বাহনায়ক, গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানঃ গুঢ়পুরুষ ইত্যাদি। তবে প্রশাসনিক ইউনিটগুলো ভেঙ্গে আরো ক্ষুদ্রতর করা হয়। বীথি উপবিভাগ বিলুপ্ত করে দাশ গ্রাম নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতির কারণে সূক্ষ্ম প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে সমাজের সর্বাঙ্গ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় জড়িয়ে যায়। ফলে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। যদিও এ সময় পূর্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর অনুকরণেই শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিলো। এর পরও পুরোনো শাসনযন্ত্রের সাথে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আরো কিছু উপবিভাগ ও আমলার পদ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে জটিল করে তুলেছিলো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বিভাগের দায়িত্ব একই ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত থাকায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার ইংগিতও পাওয়া যায়।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্মন ও সেন রাজত্বকালের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ, উপবিভাগ ও আমলাদের একটি তালিকা সন্নিবেশ করা হলো ঃ

প্রশাসনিক বিভাগ	আমলার পদবী
ভূক্তি/প্রদেশ	মহা-মাত্যাধিকরনিক
মন্ডল/জেলা	মন্ডলাধিকরনিক
খন্ডল/মহকুমা	খন্ডলাধিকরনিক
অষ্টকুল/থানা	অষ্টকুলিক
কুল/ইউনিয়ন	কুলিক

খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘসময়ের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, সুদূর অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশে সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো এবং এর পাশাপাশি বিশৃঙ্খলাও বজায় ছিলো। যার বিস্তৃত বিবরণ জানার উপকরণ আমাদের হাতে অবশিষ্ট নেই। তবে মৌর্য ও গুপ্ত আমলে ময়মনসিংহ, প্রাগজোতিষপুর কামরূপ ও আসাম একই ইউনিট হিসেবে শাসিত হতো। এ দিকে চীনা পর্যটকের মতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল কামরূপ ও পশ্চিমাংশ পুন্ড্রবর্দ্ধনের অধীন ছিলো। কেবল চীনা পর্যটকের ভাষ্য নয়, ইতিহাসবেত্তাদের বক্তব্য থেকেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের এই ভৌগলিক প্রেক্ষাপট সঠিক ইতিহাস রচনার স্বার্থেই জরুরী।

www.pathagar.com

প্রাক গুপ্তযুগ

মৌর্যযুগের শেষে এবং গুপ্তযুগের পূর্বে এই দীর্ঘ সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস অত্যন্ত রহস্যাবৃত। শুংগযুগের বেশকিছু পোড়ামাটির ফলক বগুড়ার মহাস্থানগড়ের অনতিদূরে মঙ্গলকোট নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুশাণ যুগের কনিস্কের একটি তাম্রমুদ্রা ও হবিস্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা একই স্থান থেকে পাওয়া গেছে। এ দুটো মুদ্রা ও পোড়ামাটির ফলকের উপর নির্ভর করে পন্ডিতগণ উত্তর বাংলায় শুংগ ও কুশাণ শাসনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে আগ্রহী। তবে আমরা এ যুক্তিতে মোটেই আগ্রহী নই। কারণ দু'টি মুদ্রা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বা অন্যকোন কারণে স্বরাজ্যসীমা অতিক্রম করে ভিন্নরাজ্যে যেতে পারে। আর যদি ধরে নিতে হয় যে, উত্তর বাংলা শুংগ ও কুশাণ সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিলো। তবু জোরকরে বলা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ববাংলা তথা বংগ ও সমতটে শুংগ ও কুশাণ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ, মৌর্য শাসনের শেষ এবং গুপ্ত শাসনের মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ভারতের এলাহাবাদে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের একটি বিজয়স্তম্ভে তাঁর সভাকবি হরিসেন কর্তৃক রচিত প্রশস্তিতে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত কিছু রাজ্য ও রাজার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রশস্তিতে বলা হয়েছেঃ- গুপ্তসাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কামরূপ, কর্তৃপুর, নেপাল, সমতট ও ডবাক নামে পাঁচটি মিত্ররাজ্য অবস্থিত। এতে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত পাঁচটি রাজ্য বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের নাগপাশ ছিন্ন করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলো। আলোচ্য রাজ্যগুলোর মধ্য হতে শুধুমাত্র ডবাক ছাড়া বাকী সবকটি রাজ্যই পন্ডিতগণ সনাক্ত করেছেন অত্যন্ত সহজেই। কারণ এসব রাজ্যগুলো পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে স্বনামে টিকেছিলো এবং বিভিন্ন লেখমালায় এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ডবাক রাজ্য সনাক্তকরণে আধুনিক পন্ডিতগণ জটিল সমস্যার কথাও স্বীকার করেছেন।

একথা সত্যি যে, বাঙালা নামের সঠিক উৎপত্তিকাল কোন সময়ের তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ মুসলিম আগমনের পূর্বেই বহু শিলালিপিতে আমরা বঙ্গ ও বাঙালা নামের সাথে পরিচিত। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়ের শিলালিপিতে খোদিত রয়েছে বঙ্গাল শব্দ। গঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ হলো গাঙ। এ গাঙের জল পতিত হতো সমুদ্রে। তাহলে ব্রহ্মপুত্রের জল প্রবাহিত হতো কিভাবে? আমরা লক্ষ্য করেছি প্রাগজ্যোতিষপুরের অনেক নদ-নদীর আখ্যান মিথিলার সাথে জড়িত। সমস্যা হলো বাঙলার জলবায়ু দেশের প্রাচীন কীর্তিরক্ষার অনুকূলে ছিলোনা। এরপরও আসামে প্রচুর প্রাচীনকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। আসাম রাজ্যের ভার যখন আর্যজাতিরা পেলো তখন অনার্য নামগুলোও লোপ পেলো। যোগিনীতন্ত্র গ্রন্থমতে প্রাগজ্যোতিষপুরের সীমানা দেখানো হয়েছে এভাবেঃ উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে দিলু

www.pathagar.com

নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষ্যাসঙ্গম আর উত্তরখন্ডের নাম সৌমার খন্ড। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হোয়েনসাং কামরূপ আসেন। তিনি তখন কামরূপের রাজাসনে অধিষ্ঠিত কুমাররাজ উপাধিধারী ভাস্করবর্মাকে দেখতে পান। ধর্মে ওরা ছিলেন হিন্দু। রাজা বিদগ্ধজনের সমাদর করতেন। হোয়েন সাং তাঁর গ্রন্থে লেখেন "রাজ্যের বেষ্টনী দশ হাজার লি অধিবাসিগণ ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণভপীতবর্ণ, তাহাদের স্বভাব উগ্র ও রুক্ষ; কামরূপের পূর্বাঞ্চলে দলেদলে হস্তী বিচরণ করে; চীন রাজ্যের সীমা নিকটবর্তী বটে, কিন্তু পথ অতি দূর্গম। সেই সময় পশ্চিম আসাম, মনিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ, জয়ন্তিয়া কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল"। একারণেই তৎকালীন ও তৎপূর্বে বহমান জলের সঙ্গে আনীত মৃত্তিকা দ্বারা বাঙালাদেশ গঠিত হয়েছে। আধুনিক কালে সুবর্ণগ্রাম, রামপাল বিক্রমপুর, সাভার ঢাকা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ বাঙালাদেশের অন্তর্গত।

www.pathagar.com

গুপ্ত যুগ

গুপ্তরাজ ও গুপ্তযুগ ইতিহাসের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আনুমানিক ৩৫০-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালীন হিমালয় হতে দক্ষিণ নর্মদার উপকূল পর্যন্ত যাঁরা রাজাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করতেন, তাঁরাই গুপ্তরাজ হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। বিভিন্ন শিলালেখ, তাম্রলিপি, মুদ্রা এবং বৌদ্ধ ভ্রমণবিদ ফাহিয়ানের ভ্রমণ থেকে জানা যায় গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "গুপ্ত"। তবে, তিনি কি শুধু গুপ্ত নামেই পরিচিতি লাভ করতেন? যে তথ্য আজ আমাদের হাতে আছে তাতে একথা হলফ করে বলা মুশকিল। এই গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গুপ্ত, "লেখমালায়" দেখা যায় "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত, আর তিনি মগধের কাছাকাছি ২৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। ঐতিহাসিক ননী গোপাল মজুমদারের মতে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বাংলাদেশ সম্ভবত কুশাণ রাজ বংশের শাসনাধীন ছিলো। তিনি দেখিয়েছেন হুগলি ও উত্তর বংগের কয়েকটি জেলাতে সে আমলের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। যা হোক সম্ভবত সে সময় সামন্তরাজ মহারাজ শ্রীগুপ্তের সময় মৌখরি, ভাবশিব বা বাকাটক বংশের কোন রাজা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, এ বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণ আজ অবধি পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের এই দ্বিধা ও সংশয় সত্ত্বেও যতোটা সম্ভব ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই ইতিহাসের জটিলগ্রন্থি মোচন করতে হবে।

৩২০ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসে নিজেকে একজন স্বাধীন নৃপতি বলে ঘোষণা দেন এবং "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। গুপ্ত বংশের তিনিই হলেন সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র নেতা যা ইতিহাসবিদগণ মনে করে থাকেন। প্রাচীনকালে লিচ্ছিবি জাতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে একটি আলাদা জাতিসত্তা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলো। প্রথম চন্দ্র গুপ্ত এ জাতির রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিয়ে করেন এবং পরে পাটলীপুত্র হস্তগত করেন। জানা যায় লিচ্ছিবিগণ চন্দ্রগুপ্তকে যৌতুক হিসেবে পাটলীপুত্র দান করেছিলেন। এই বিয়েকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়? তাতে প্রতিকৃতি ছিলো পত্নী কুমারদেবীর মূর্তি ও অপর পিঠে সিংহ বাহিনী লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও "লিচ্ছবয়"। চন্দ্রগুপ্ত এ বিয়েতে এতটাই লাভবান হয়েছিলেন যে মগধ হতে সমস্ত গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তৃত প্রদেশই তার রাজ্যভুক্ত হয়েছিলো। তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় একটি নতুন সংবর্তন প্রবর্তিত হয়েছিলো। ইতিহাসে এটি গুপ্ত সংবর্ত নামে প্রসিদ্ধ। ৩১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে এ সংবর্ত চালু হয়েছিলো।

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেই দেশীয় ক্ষত্রপদের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন, রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন এবং বিক্রমাদিত্য (সূর্যের মতো মহা পরাক্রমশালী) উপাধি গ্রহণ করেন। পন্ডিতেরা মনে করেন, এ সময় তিনি সমতট, ডবাক এবং পুন্ড্রভূক্তির অঞ্চল সমূহ দখল করে নেন। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে এফথ্যালাইটদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভিত দূর্বল হয়ে যায়। এ সাম্রাজ্যের দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো পুনরায় স্বাধীন হয়ে যায়। যার প্রমাণ মেলে কুমিল্লার ১৮ মাইল দুরে গুনাই ঘরে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপিতে।

www.pathagar.com

উক্ত তাম্রলিপির মাধ্যমে জানা যায় মহারাজ বৈন্য গুপ্ত ১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭) তাঁর রাজধানী ক্রীপুর থেকে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছেন। তাম্রলিপিতে উল্লিখিত "ক্রীপুর"কে পন্ডিতগণ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা নামক স্থানকে সনাক্ত করেছেন। পন্ডিতদের ধারণা যে কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো গুপ্ত রাজাদের অবিন্যস্ত একেক জন উপরিক বা প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হতো। তাম্রলিপি প্রদাতা মহারাজ বৈন্য গুপ্তও রাজধাণী ক্রিপুর থেকে বংগ এবং সমতট মন্ডল সামন্ত রাজ্য হিসেবে শাসন করতেন। বৈন্য গুপ্তের নামে কোন মুদ্রা না পাওয়া গেলেও ময়নামতি ও অন্যান্য অঞ্চলে রাজার নামবিহীন অনেক গুপ্ত অনুকৃত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এতে মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে, সে সময়ে মহারাজ যাতে কোন ভাবেই ক্ষুদ্র রাজগণের প্রতি রুষ্ট না হন, সে কারণেই স্বঘোষিত রাজাগণ নিজ নামে মুদ্রা অংকন করতেন না, শুধু মহারাজ বা রাজা খেতাব গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। গুপ্ত অনুকৃত অনেক স্বর্ণমুদ্রা নরসিংদী, গাজীপুরের কাপাসিয়া (সিংহশ্রী), শ্রীপুরের গেসিংগা, কালিগঞ্জ থানার বেলদী ও সাভারের রাজাসনে পাওয়া গেছে। তবে ময়মনসিংহ এলাকার কোন পাহাড়ী এলাকা বা নিম্নভূমিতে পাওয়া যায়নি। যদিও এ জেলায় উল্লেখিত স্থানগুলোর সমকক্ষ বয়েসি ভূমির অবস্থান বর্তমান পর্যায়ে টিকে রয়েছে পূর্বের ন্যায়। বৈন্যগুপ্তের একটি মাত্র তাম্রলিপি ব্যতীত এ অঞ্চল যে গুপ্তদের শাসনে ছিলো তার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। বৈন্য গুপ্তের তাম্রলিপিটি পাওয়া গেছে শ্রীপুর থানা সদর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে পনের একর জমি জুড়ে অবস্থিত দীঘি ও এর আশেপাশে পুরোনো ইটের টুকরো প্রাপ্তির মাধ্যমে। এ দীঘিটির নাম বৈন্যার দীঘি, ধারণা করা অসংগত হবে না যে ভাওয়ালগড়-মধুপুরগড় এলাকায় প্রাচীন কালে দীঘি খনিত হতো অনাবৃষ্টির সময় জমিতে জল সেচের জন্য। বৈন্য গুপ্ত কর্তৃক খনিত দীঘিটি দীর্ঘসময় ধরে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে বৈন্যার দীঘিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে গুপ্তদের সময়ে প্রচলিত অনেক মুদ্রাপ্রাপ্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রাদেশিক রাজধানী পুন্ড্র নগর (বগুড়া মহাস্থানগড়) থেকে ময়মনসিংহ, গাজীপুর জেলার অঞ্চল সমূহ শাসিত হয়ে আসছিলো। পরবর্তী সপ্তম খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ সমতট এলাকা খড়গ রাজাদের করতলগত হয়। নরসিংদী জেলার আশরাফপুর গ্রামে আবিস্কৃত একটি তাম্রলিপি মহারাজ দেব খড়গ কর্তৃক প্রদত্ত, অপরটি তার পুত্র রাজা রাজভট্ট কর্তৃক উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠোদ্ধারে জানা যায় 'পেরনাটন' বিষয়ে (জেলায়) চারটি বৌদ্ধ বিহারের অধীক্ষক সংঘমিত্রকে নয় পাটক দশ দ্রোণ ভূমি দান করেছেন মহারাজা দেব খড়গ বিহার গুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্যে। উদ্দেশ্য রাজপুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা। তাম্রলিপিতে দানকৃত নয়টি পাটক বা গ্রামের নাম উল্লেখ আছে। সবক'টি গ্রামই নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানা, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ ও শ্রীপুর থানার অন্তর্গত ছিলো। প্রাচীনকালের গ্রামগুলো বর্তমানেও একই নামে পরিচিত। আশরাফপুরের তাম্রলিপিতে উল্লেখ রয়েছে সুবর্ণ গ্রাম(সোনারগাঁও) কে পেরনাটন বিষয়ের অস্থায়ী শাসন কেন্দ্র হিসেবে। তাই আমরা বিবেচনায় আনতে পারি মেঘনা নদীর পশ্চিম তীর, বংশী নদীর পূর্ব তীর, সমগ্র

www.pathagar.com

ভাওয়াল, মধুপুর, ময়মনসিংহ মধ্যবর্তী ভূভাগ পেরনাটন বিষয় নিয়ে একটি মন্ডল (বিভাগ) গঠিত হয়েছিলো এবং কয়েকটি মন্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিলো। অবশ্য কয়েকটি মন্ডল নিয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হতো। অবশ্য বৃহৎ রাজ্যগুলোয় কয়েকটি মন্ডল নিয়ে একটি ভুক্তি বা প্রদেশও গঠিত হতো। আর একাধিক ভুক্তি নিয়ে গঠিত হতো একটি সাম্রাজ্য। খড়গ রাজাদের আমলে সমতট মন্ডলের কয়েকটি বিষয়ের নাম জানা যায়। ময়মনসিংহ জেলার সমগ্র অঞ্চল সমতট মন্ডলের অধীন পেরনাটন বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলো বলে অনুমান করা হয়। যার অস্থায়ী ইউনিট ছিলো সুবর্ণ বিথি (সোনারগাঁও)। আমরা একারণে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে মেঘনা অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম তীর সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল পেরনাটন বিষয়ের অধীন ছিলো- ইতিহাসের সমর্থন নিয়েই একথা বলা যায়। যদিও এক্ষেত্রে তথ্য-প্রমাণের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি সত্ত্বেও মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো ঐতিহাসিক সমর্থন অবশ্যই পাওয়া যায়।

খড়গ রাজাদের ক'টি তাম্রলিপি উদ্ধার হয়েছে। এতে বলা হয়েছে তাঁদের রাজধানী ছিলো "কর্মান্ত বাসক স্থানে"। ঐতিহাসিক ডক্টর আহম্মদ হোসেন দানী কুমিল্লা জেলার বড় কামতা নামক গ্রামকে প্রাচীন কর্মান্ত্ম বাসক বলে সনাক্ত করতে আগ্রহী। আর এগ্রামেই আবিস্কৃত হয়েছে দেবখড়গ কর্তৃক নির্মিত লিপিযুক্ত স্বর্ণমন্ডিত শর্বানী মুর্তি। আমরা এখানে ডক্টর দানীর সাথে একমত পোষণ করতে পারছিনা। কারণ তাম্রলিপিটি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, কর্মান্ত বাসকের পরে আরো একটি শব্দ রয়েছে যা অস্পষ্টতার দরুণ গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এখানে কর্মান্ত বাসক শব্দটি রাজধানী বা তার সমার্থক শব্দকে বুঝিয়েছে। আমরা শব্দটির অর্থ এভাবে দাড় করাতে পারি, কর্ম+অন্ত= কর্মান্ত, যার অর্থ হলো কাজের শেষে। বাসক অর্থ যেখানে বাস করা হয়। পোরা শব্দটির অর্থ হলো ঃ-কর্মশেষে বাসস্থন। যেমন পালদের একটি তাম্রলিপিতে বলা হয়েছেঃ-জনকভু অর্থাৎ জন্মভূমি। এপর্যায়ে বুঝা যায় যে, কর্মান্ত বাসক কোন স্থানের নাম নয়, শুধুমাত্র রাজধানী অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের মতের স্বপক্ষে নিচের উদ্ধৃতিটি ঢাকার ইতিহাস লেখক যতীন্দ্র মোহন রায় লিখেছেন, খড়গ রাজগণ বংগের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার দিগের রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাহাদের রাজধানীই বা কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা অদ্যাপি তিমিরাচ্ছন্ন রহিয়াছে।" ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় A forgotten kingdom of east Bengal. নামক প্রবন্ধে এবং 'পূর্ব বংগের একটি বিস্তৃত জনপদ' নামে মাসিক প্রতিভায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অনেক পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, খড়গ রাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন এবং কুমিল্লার অনতিদূরে অবস্থিত বড় কামতা নামক স্থানে এ বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিলো। তাঁর এ সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হলো নরসিংদীর আশরাফপুর তাম্রলিপিতে উৎকীর্ণ দু'টি লাইন। "লিখিতংজয় কর্মান্তবাসকে পরম সৌগতো পাসক পুরদাসেন" এবং "জয় কর্মান্ত বাসকাৎলিখিতং পরম সৌগত পুরনাসেনেতি"। এ লাইন দু'টিতে উল্লিখিত কর্মান্ত বাসক শব্দে শ্রদ্ধেয় ভট্টাশালী

www.pathagar.com

মহাশয় ধারণা করেছেন যে, কর্মান্ত বাসক কোন স্থানের নাম। অপর দিকে বড় কামতা নামক স্থানে একটি পাথরের নটরাজ মূর্তির পৃষ্ঠদেশে কুসুমদেব নামক জনৈক কর্মান্ত পালের নাম খোদিত থাকায় এবং মহারাজা দেব খড়গ কর্তৃক নির্মিত শর্বানী মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভট্টশালী মহাশয়ের ধারনা আরো বদ্ধমূল হয়।

গুপ্তরা ৩য় শতকের মধ্য থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করতেন। এ কথা সত্যি যে, তারা ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে অপ্রতিহত শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। গুপ্ত রাজাদের উপাধি ছিলো 'দৈবত' অর্থাৎ সম্রাট স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, সাম্রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই সামন্তরাজাগণ শাসন করতেন। সম্রাট বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিগণ মাথা ঘামাতেন খুব কম। তবে এসব অধীনস্ত রাজাগণ কেন্দ্রের সকল আইন-কানুন মেনে চলতেন। বিদেশী আক্রমণ মোকাবিলায় ও সৈন্যাভিযানের সময় তারা সৈন্য যোগানসহ নিজেরাও অনেক সময় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। মহারাজা খেতাবও গ্রহণ করতেন। পাঠকদের সুবিধার্থে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রণীত হলো ঃ

প্রশাসনিক কেন্দ্র	প্রশাসনিক অধির্কতা	রাজস্ব বিভাগীয় অধির্কতা	বিচার বিভাগীয় অধির্কতা	পুলিশ বিভাগীয় অধির্কতা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহামাত্র	মহাভৌগিক	মহাদান্ডিক	মহামহত্ত্বর
মন্ডল (বিভাগ)	মান্ডলিক	ভৌগিক	দান্ডিক	মহত্ত্বর
বিষয় (জেলা)	বিষয়পতি	ভোগপতি	দান্ডপাশিক	নাগরিক
বীথি (থানা)	বীথিপতি	শৌল্কিক	দন্ডশক্তি	স্থানিক
বর্গ (ইউনিয়ন)	বর্গিক	গোপ	দাশাপরাধিক	দাশবর্গিক

একটি বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে, গুপ্তগণ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ইউনিট গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বরেন্দ্রভূমে। যা অন্য কোন স্থানে সম্ভব হয়ে ওঠেনি বিশেষ বিশেষ কারণে। গুপ্তরাজাগন বাংলার সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত শাসনে রাখতে পেরেছিলেন তার সঠিক হিসেব আমাদের কাছে না থাকলেও এ কথা সত্যি যে, যেসকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে জানা যায় পৌন্ড্রবর্দ্ধন থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে যে সব শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় মহাস্থানগড়ের ধ্বংসস্তুপগুলির পরিধি ছিলো চার মাইল। ইদানিং মহাস্থানগড়ে খনন কাজ চলছে, আমরা আশা করছি একাজের নমুনা ও অন্যান্য বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো নতুন তথ্য খুঁজে পাবো। এখানে উল্লেখকরা প্রয়োজন যে, সমুদ্রগুপ্তের দরবারে সভা কবি হরিসেনের রচনা হতে জানা যায় যে সমুদ্র গুপ্ত আর্যাবর্তের (গাংগেয় উপত্যকা) নয়জন, দক্ষিণ ভারতের বারোজন রাজাকে পরাস্ত ও বশীভূত করেন। 'অরণ্য রাজ্যসমুহ' অধিকার করেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। আমাদের এসকল তথ্য বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও

www.pathagar.com

রয়েছে। সভাকবি হরিসেন বর্ণনা করেন ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রাচ্যের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। এ সময় গুপ্ত রাজ্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক। এলাহাবাদ লিপিতে উল্লেখ রয়েছে,'রাজা সমুদ্র গুপ্ত ছিলেন ত্রিভূবনজয়ী'। গুপ্ত যুগে এ বাংলা যে ওদের অধীন ছিলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে সেকালের ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে। জানা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকাই ছিলো তখন ব্যবসা বানিজ্যের প্রধান এলাকা। ওই এলাকার প্রধান কেন্দ্র ছিলো পশ্চিমে ভারুকচ্ছ (গ্রীকদের কাছে বারিগাজ্জা নামে পরিচিত) সিন্ধুর বদ্বীপ (পাটালিন নামে পরিচিত) উত্তর পশ্চিমে, পুস্কলাবতীতে এবং পূর্বে তাম্রলিপ্তিতে (তমলুকে)। সেসময় পূর্ব ভারতে উচুঁদরের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রির জন্যে বারাণসী, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী বিখ্যাত ছিলো। পেরিপ্লুস এরিথ্রিইতে উল্লেখ রয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপকুল ধরে দক্ষিণ দিকে সিন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ ও করমন্ডলের উপকুলে জাহাজ চলাচল করতো। আমরা কালিদাসের বর্ণনা হতে জানতে পারি সে সময় বঙ্গ নামে যে দেশটি ছিলো তার রাজধানী ছিলো বিক্রমপুর। তবে অনেক পন্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদগনের মতে এবং এ বিষয়ের বিশারদ ভাণ্ডদাঞ্জীর মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ভুভাগই বঙ্গরাজ্য ছিলো। তিনি নিশ্চয় করে বলতে পারেননি নির্দিষ্ট স্থান। তবে সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলায় রাজাদের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এ কথা সত্য। আমরা সুপন্ডিত ভ্রমণবিদ ইউ-য়ান চুয়াঙ্গের বিবরণে দেখি। সেই সময় বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর শাখা বিস্তৃত ছিলো। অন্যদিকে তিনি বঙ্গদেশের শালিধানের চমৎকার বিবরণ দিয়ে গেছেন এভাবে "সেকালে বঙ্গদেশে বিশেষকরে সমতল ভাগের সর্বত্রই শালিধানের চাষ হতো। এ ধরনের চাল ছিলো সরু ও খেতে ভালো"।

মজার ব্যাপার হলো সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করে 'অশ্বমেধ যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে একটি যজ্ঞীয় অশ্বের প্রস্তর মূর্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে আবিস্কৃত হয়েছে। সেটি বর্তমানে লক্ষ্মৌ জাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে এবং নিবন্ধকার নিজেই সেটি লক্ষ্মৌ জাদুঘরে দেখেছেন। সে সময় সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাদানের উদ্দেশ্যে নতুন সুবর্ণ মুদ্রা নির্মাণ করান। এ সকল মুদ্রা বৃটিশ জাদুঘর, কোলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐ সকল মুদ্রার এক পিঠে যজ্ঞযুগে আবদ্ধ অশ্ব ও অন্য পিঠে প্রধানা মহিষীর মূর্তি অঙ্কিত, বর্তমানে এগুলো দুষ্প্রাপ্য। তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি গৌড় ও রাঢ় এবং পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ গুপ্তসম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তবে এ কথাও সত্য সমতটের অধিবাসীগণ সহজেই গুপ্তদের বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং ময়মনসিংহ অবশ্যই গুপ্তদের শাসনাধীন ছিলো। তবে গুপ্ত শাসনাতিহাস এখনো রহস্যাবৃত। কেননা এ পর্যন্ত যেসকল ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় কোন ঐতিহাসিকই জোরালোভাবে তাঁর দেয়া তথ্যসমূহ সমর্থন করে যাচ্ছেন না অর্থাৎ তিনি নিজেই গোলক ধাঁধায় আটকে আছেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এলাহাবাদ প্রস্তরলিপি হতে জানা যায় যে সেসময় সমগ্র বাংলাদেশ ও কামরূপ তাঁর করতলগত ছিলো অথবা ছিলো প্রভাবাধীন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে জানা যায় কামরূপের রাজ্যসীমা ছিলো ১৬,৬৭০ বর্গমাইল। তখন ভারত সম্রাট হর্ষবর্ধণের অধিনস্ত্ব একজন নরপতি ভাস্কর বর্মন এ অঞ্চল শাসন করতেন। ঠিক একই সময়ে শশাঙ্ক যখন গৌড়াধিপতি তখন তিনি পশ্চিম বাংলায় আগ্রাসন চালাতে

www.pathagar.com

উদ্যত হবার প্রস্তুতিকালে রাজা ভাস্কর বর্মন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাথে মিত্র জোট গড়ে তোলেন। এরপরও রাজা শশাংক উত্তর ও পশ্চিম বাংলাকে তার রাজ্যভূক্ত করতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দক্ষিণ পূর্ব বাংলার বর্তমান ময়মনসিংহ সহ এর অংশ বিশেষ কামরূপ রাজ্যের অধীনে ছিলো। এ কথা ঠিক যে, রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এ এলাকা পুরোপুরি রাজা ভাস্কর বর্মনের অধীনে চলে যায়। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায় তিনি কি তখনও সম্রাট হর্ষবর্ধনের অধীনস্থ নরপতি ছিলেন? এ হিসেব ভবিষ্যত ঐতিহাসিকগণের উপর ছেড়ে দেয়া হলো। রাজা ভাস্কর বর্মন হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিত ও পন্ডিত ব্যক্তিদের অগাধ শ্রদ্ধা করতেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তার দূর্বলতা ছিলো। তিনি আনুমানিক ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বঙ্গ ও সমতটের নরপতিগণের এক বংশলতিকা সন্নিবেশিত হলো।

৩০০ খ্রিস্টাব্দ

গুপ্ত সম্রাটগণের আদি বংশ লতিকা

ঘটোৎকচ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

(৩১৯-৩৪০ খ্রিস্টাব্দ)

সমুদ্র গুপ্ত

(৩৪০-৩৮০ খ্রিস্টাব্দ)

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

(৩৮০-৪১২ খ্রিস্টাব্দ)

গোবিন্দ গুপ্ত

কুমার গুপ্ত

(৪১৩-৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

গুপ্ত রাজ শাখা

স্কন্দ গুপ্ত

(৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

পুর গুপ্ত

নরসিংহ গুপ্ত

দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত

(৪৬৭-৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত

বুদ্ধ গুপ্ত

(৫৩০- খ্রিস্টাব্দ) ?

ভানু গুপ্ত

(৫৩০-৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

www.pathagar.com

বংগ ও সমতট

বৈন্য গুপ্ত
(৫০৭-৫২৪ খ্রিস্টাব্দ)
ধর্মাদিত্য
(৫২৫-৫৫০ খ্রিস্টাব্দ)
গোপ চন্দ্র
(৫৫০-৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ)
সমাচারদেব
(৫৭৫-৬০৭ খ্রিস্টাব্দ)
শ্রীনাথ ?
ভবনাথ
লোকনাথ
(৬৬৩-৬৪৪খ্রিস্টাব্দ)
(৬৬৩-৬৪৫)

সংগত কারণেই গুপ্তদের রাজ্যসীমা আলোচনায় আসা প্রয়োজন। আমরা জানি বিশাল ভারত দেবলীলার মহৎক্ষেত্র। ভারতের কোন রাজবংশই একত্রে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন গুপ্তদের মতো, তার কোন তথ্য প্রমাণ নেই। ভাঙ্গাগড়ার এই দেশে আলেকজান্ডার, তৈমুর লং দিগ্বিজয় করেছেন, চমক লাগিয়ে চলেও গেছেন। আর সমুদ্র গুপ্ত যে কঠিন কাজটি করেছেন সেটি হলো শক্তিকে পুঞ্জিভূত করে সকলকে জয় করলেন আর বশ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ করলেন এবং কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রনে রাখলেন যা অন্য কেউ পারেননি।

সমুদ্র গুপ্ত যে এলাকার রাজাধিরাজ ছিলেন সেগুলো হলো ঃ পূর্বদিকে বঙ্গদেশ ও কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও মালব, দক্ষিণে সিংহল। বিভিন্ন শিলালেখ থেকে আমরা জানতে পারি, অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণমুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় যে প্রতিকৃতি রয়েছে তা ঘোড়ার প্রতিকৃতি। এই যজ্ঞে সিংহলের মেঘবাহন, শক নৃপতিরা (দেবপুত্রাঃ) পেশোয়ারের সাহা ও শাহানসা (কুশান রাজগন) কর দানের জন্য কুসুমপুর রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। চীনা ঐতিহাসিক কর্তৃক বর্ণিত বিবরণ হতে জানা যায় সিংহলের রাজা মেঘবাহন সমুদ্র গুপ্তের নিকট বহু উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। পাটলিপুত্রের রাজাগণ যুগ যুগ ধরে তাদের রাজ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে সময় গুপ্তদের রাজকীয় পতাকায় ছিলো 'গরুড়চিহ্ন'। ওরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধ বিদ্বেষের কোন ছাপ রেখে যাননি। গুপ্তরা তাদের মন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর ব্যবস্থা ও ভিক্ষুদের আতিথ্যের সংস্থান করতেন। গুপ্তরা বহুকাল রাজত্ব করার পর স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধ থেকেই আস্তে আস্তে রাজবিভূতি হারাতে শুরু করে।

www.pathagar.com

পাল রাজগণ

গুপ্তমহারাজ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র দ্বিতীয় গুপ্ত এবং শূরবংশীয় আদিশুরের মৃত্যুর পর মগধ, গৌড় ও বঙ্গে কোন প্রশাসকই স্বীয় প্রাধান্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করতে পারেননি। এসময় প্রাচ্যভূমে সার্বভৌম শাসনতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছিলো। অনবরত রাজবিপ্লবে প্লাবিত হয়ে পড়েছিলো গৌড়বঙ্গ। কান্যকুব্জের যশোবর্মা, গুর্জরপতি বৎসরাজ, রাষ্ট্রকূটের ধ্রুব, কামরূপের হর্ষদেবগণ কর্তৃক অর্থাৎ বারবার বিদেশীগণ কর্তৃক আক্রান্তের ফলে গৌড়বাসীগণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। জানা যায় সে সময় গৌড়বঙ্গে বিশেষ করে উড়িষ্যা, বঙ্গ ও অপর পাঁচটি অংশে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈশ্য পার্শ্ববর্তী ভূভাগে নিজ নিজ অধিকারে প্রাধাণ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে এক অরাজক অবস্থা বিরাজিত ছিলো। সংস্কৃত ভাষায় এ সময়কে বলা হতো "মাৎস্যান্যায়"। এই প্রবর্তিত অবস্থান থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই বপ্যটের পুত্র গোপালদেব গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে আসিন ছিলেন ৭৮০-৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

দেবপালের মুঙ্গেরলিপি থেকে জানাযায়, তিনি তাঁর রাজ্যসীমা সমতট পর্যন্ত বিস্ত্মারিত করতে পেরেছিলেন। গোপালদেব নালন্দ নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন। তারানাথের মতে গোপালদেব ৪৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিঃ স্মিথের মতে ৮০০ খ্রিস্টাব্দে গোপালদেব মৃত্যুবরণ করেন ও পরে তাঁর পুত্র ধর্মপাল পিতার সিংহাসনে বসেন। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে পালরাজাগণ কোন এলাকায় রাজত্ব করতেন, তাঁদের বসতিই বা কোথায় ছিলো? আমরা যতোদূর জানি এ পর্যন্ত পালদেব গনের যে ক'টি লিপিমালা পাওয়া গিয়েছে সেগুলোতে তাঁদের 'গৌড়েশ্বর'ও 'গৌড়াধিপতি' এবং প্রতিহার রাজভোজের সাগরতালের লিপিতে ধর্মপালকে "বঙ্গপতি" ও তাঁর সেনাদের বঙ্গাল (বাঙ্গালী) বলা হয়েছে। অতএব পালরাজগণ বাংলা শাসন করেছেন।

পালরাজাদের নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। সে সময়কার তিনটি ভূক্তির নাম পাওয়া গিয়েছে। পুন্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রীনগরভুক্তি। তবে ওড়িষ্যায় ভুক্তি বলা হতো দন্ডপথকে। আইন-ই-আকবরীতে পাল রাজাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো হিন্দু ঐতিহাসিকগণ মেনে নিতে কুন্ঠাবোধ করেন। তবে পালদের সম্পর্কে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা পাই খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে। এখন জানা দরকার এই জায়গাটির অবস্থান কোথায় ? এটি হলো গৌড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত বিলের কাছে একটি উঁচুস্থান। তাম্রলিপিটি দ্বিতীয় ধর্মপাল কর্তৃক প্রদত্ত যেটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাওয়া যায়। মহিপাললিপিটি পাওয়া যায় দিনাজপুরে, একইস্থান থেকে পাওয়া যায় মদন পালদেবের লিপি। এছাড়া তিনটি লিপি পাওয়া গেছে ভাগলপুর থেকে নারায়ণ পালের। পালরা প্রথমে বিহার, গৌড়সহ সারা বাংলা শাসন করেছেন। এখানে পালরাজগণের একটি বংশতালিকা প্রদত্ত হলো ঃ

www.pathagar.com

গোপালদেব-১

ধর্মপাল-২

বাকপাল

দেবপাল

জয়পাল

রাজ্যপাল

৪-বিগ্রহপাল (১ম)
৫-নারায়ণপাল
৬-রাজ্যপাল
৭-গোপাল (২য়)
৮-বিগ্রহপাল
৯-মহীপাল (১ম)
১০-নয়পাল
১১-বিগ্রহপাল(৩য়)
মহীপাল (২য়)
১৩-শুরপাল
১৪-রামপাল
১৫-কুমারপাল
১৬-গোপাল (৩য়)
১৭-মদনপাল

বাঙলাদেশের রাজপুত্র জাহর প্রদেশের (এলাকার) একজন বৌদ্ধ অধ্যক্ষ নালন্দার বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিব্বত এলাকায়ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পালরাজদের তৈরী নালন্দা বিহার মহারাজাধীরাজ অশোক কর্তৃক প্রভুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছিলো। শীলভদ্রের ন্যায় পন্ডিতও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। জানা যায় এই বিদ্যালয়ে সেসময় ১৫১০ জন শিক্ষক ও দশ হাজার ছাত্র ছিলেন। আমরা গোপালের নাম পাই রাজশাহী জেলার মান্দা নামক এলাকার একটি শৈব-মন্দিরে প্রোথিত একটি প্রস্তরফলক থেকে। এই ফলকে লেখা আছে।

"সুরসরিদুরুবীচিশিকরৈঃ কুন্দগৌরৈ
বিরচিতপরভাগো বালচন্দ্রাবতংসঃ।
দিশতু শিবমজস্রং শম্ভুকোটীরভারঃ
কলমকনিরোচির্ম্মঞ্জরীপিঞ্জবীষু ।।

www.pathagar.com

গোপালদেবের মহিষীর নাম শ্রীদ্দেবী। শ্রীদ্দেবী রাজার প্রণয়-পাত্রী ছিলেন। দেবীর গর্ভে ধর্মপালের জন্ম হয়। পালগণ এক বিশাল রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা বহুকাল রাজত্ব করেন। গোপালদেব ৭৭৫-৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ, ধর্মপাল-২য় ৭৮৫-৮২০ খ্রিস্টাব্দ, দেবপাল-৮৩০-৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ, বিগ্রহপাল দেব ৮৬৫-৯০০ খ্রিস্টাব্দ, ৫ম রাজা নারায়ণদেব পাল-৯০০-৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ষ্ঠ রাজা রাজ্যপাল ৯২৫-৯৪০ খ্রিস্টাব্দ, ৭ম গোপালদেব (দ্বিতীয়) ৯৪০-৯৭০ খ্রিস্টাব্দ, ৮ম বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) ৯৭০-৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, ৯ম মহীপালদেব ৯৮০-১০৩৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ম নয়পালদেব ১০৩৬-১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ বিগ্রহপাল (তৃতীয়) ১০৫৩-১০৬৮ খ্রিস্টাব্দ, মহীপাল দেব (দ্বিতীয়) ১০৬৮-১০৭৮ খ্রিস্টাব্দ, ১৩তম ১০৭৮-১০৯১ খ্রিস্টাব্দ, ১৪তম রামপাল দেব ১০৯১-১১০৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৫তম কুমারপাল দেব ১১০৩-১১১০ খ্রিস্টাব্দ, ১৬তম গোপালদেব (তৃতীয়) ১১১০-১১১৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭তম মদনপাল দেব ১১১৫-১১৩০ খ্রিস্টাব্দ। গোবিন্দপাল দেব ১২৩৫ থেকে রাজপদে বসেন। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার গোবিন্দপাল দেবের রাজ্য অধিকার করে নেন। অন্যদিকে সেনরাজগণ পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে এবং কনৌজ রাজগণ পালাক্রমে পালদের আক্রমণ করে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলে। তবে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন গোবিন্দপাল ৩৩ বছর রাজত্ব করেন। বিভিন্ন শিলালিপি, লেখমালা ও ঐতিহাসিক বিবরণ সাক্ষ্য দেয় যে পালগণ অন্ততঃ তিনশত বৎসর রাজত্ব করেছেন। বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে তাঁরা রাজত্ব করতেন। ময়মনসিংহ এলাকায় ছিলেন (মধুপুর) ভগদত্ত, হুগলীতে হরিপাল, ভাওয়ালের কাপাসিয়াতে শিশুপাল, তালিমাবাদে যশোপাল, সাভারে হরিশচন্দ্র এরা সামন্ত প্রভু হিসেবে অত্র অঞ্চল শাসন করতেন। পরবর্তীতে জানাযায় রাজা লডহচন্দ্র ধীরে ধীরে তার রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য ঢাকার উত্তর পূর্বে ও উত্তর পশ্চিম অংশে সৈন্য পরিচালনা করে সফলকাম হন। একসময় চন্দ্রগণ মধুপুর, সাভার ময়মনসিংহ অঞ্চল অধিকারে নিয়ে আসেন এবং পাল শাসন দক্ষিণ পূর্ববাংলা থেকে চিরতরে অস্তমিত হয় ।

www.pathagar.com

খরগ ও বর্ম রাজবংশ

প্রশাসনের কূটনীতি বর্তমানের মতো জোরালো না হলেও এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমানের মতো না হলেও প্রশাসনিক কূটনীতির ধারাবাহিকতায় খরগ ও বর্ম রাজবংশের প্রশাসনিক গোড়াপত্তন হয়। সমতট অঞ্চলে গুপ্তদের শাসন অবসানের পর পূর্ববঙ্গে চন্দ্র রাজবংশের উদয় হয় (৬১৯-৬৩৭)। এদের রাজধানি কোথায় অবস্থিত ছিলো তা'সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক নগেন্দ্র নাথ বসু বলেনঃ "যে সময়ে বরেন্দ্র বা গৌড়ে পালবংশ, বঙ্গে চন্দ্র বংশ ও রাঢ়ে শূরবংশ আধিপত্য করিতেছিল সেই সময়ই কথিত বর্ম বংশের অভ্যুদয় হয়। এছাড়াও ঐতিহাসিক রাখাল বন্দোপাধ্যায় বলেন আর্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাযাবরজাতির পুরাতন রাজধানি। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ইউয়ান-চুয়াং। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দির মধ্যভাগে সিংহপুর-রাজ্য দর্শন করিয়াছেন"। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে লাক্ষামন্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্মবংশীয় দ্বাদশজন রাজা খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেব চক্রায়ুকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করনোদ্দেশে বোধহয়, এই সিংহপুরের যাদবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরা পথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পুর্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে আবিস্কৃত বজ্রবর্মার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "যাদব সেনার সমর বিজয় যাত্রা করে বজ্রবর্মা মঙ্গল স্বরূপ গণ্য হইতেন। বজ্রবর্মার পূর্বে বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিকার ছিলো"। তবে একথা ঠিক যে বজ্রবর্মা খুব বেশীদিন বিক্রমপুর শাসন করতে পারেননি-লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে লাক্ষামন্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলাশিপি। এ লিপিটি সম্পর্কে আমরা যতোদূর জানি এ'টি ব্রহ্মপুত্র ও শীতল্যাক্ষার মধ্যবর্তী বর্তমান নরসিংদী জেলার বেলাব গ্রামে পাওয়া গিয়েছিলো। ওই তাম্রলিপির মাধ্যমে বঙ্গরাজ্যের রাজাধি রাজগণের প্রশংসাসুচক বাণী রয়েছে।

এই বেলাব লিপিটি পাওয়া যায় এভাবে ঃ এপ্রিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বেলাব গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ তার নিজ বাড়ির নিকট গর্ত খোড়ার সময় মাটির নীচ থেকে হঠাৎ করে লিপিখানি পেয়ে যান। কৃষক ভাবতে লাগলেন এটি সোনার তৈরি এবং উপরওয়ালার দান। তিনি গোপনে তাম্রলিপির শীর্ষে অঙ্কিত রাজমুদ্রাটি চেঁছে ফেলেন। আসলে এটি কি জিনিস? ইতঃমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায় এবং ঢাকা পর্যন্ত মুদ্রাপ্রাপ্তির খবর পৌছে যায়। মজার ব্যাপার হলো ঐ সময় সে এলাকায় সেটেলম্যান্ট বিভাগের কাজ চলছিলো। সেখানে নিয়োজিত ছিলেন সাব-ডেপুটি কালেক্টর জনাব

www.pathagar.com

প্রমথনাথ দত্ত বি.এ. মহাশয়। তিনি একই বছর জুন মাসে এই বিখ্যাত লিপিটি ২ টাকার বিনিময়ে কিনে নেন ও ঢাকায় নিয়ে আসেন। সৌভাগ্যবশত হোক বা যাই হোকনা কেন সেসময় ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। ২৪ জুন' ১৯১২ মুদ্রাটি জনাব বসাক মহাশয় এর নিকট পাঠানো হলে তিনিই এটির পাঠোদ্ধার করেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত বিক্রমপুরের ইতিহাসে বেলাব তাম্রলিপি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতেঃ এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১০ X ৯ ইঞ্চি। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই। আরম্ভে " ওঁ সিদ্ধি" লিখিত আছে। তাহাতে বিসর্গ চিহ্নের অভাব। বংশ-বিবৃতি সূচক ১৩টি শ্লোকের শেষে ২৪ পংক্তি হইতে ৪০ পংক্তি পর্যন্ত গদ্যাংশ এবং সর্বশেষে একটি শ্লোক, তৎপরে লিপিকাল ও স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর। এ লিপিটির বাঙলা ভাষান্তর ঃ

"শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্মদেবের-পাদানুধ্যাত, পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ শ্রীপৌন্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন-মন্ডলে কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খন্ডল (সম্বন্ধ) উপ্যলিকা গ্রামে, ১ পাটক,৯ দ্রোণ (পরিমিত) ভূমিতে, সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রানক, রাজপুত্র, রাজমাত্য, রাজপুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্মাধ্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ বিচারাধিপতি), মহা সান্ধিবিগ্রহিক, মহা সেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত (রাজকীয়"মোহরের"রক্ষক), অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (রাজাগুপ্তজনদিগের অধিনায়ক), মহাক্ষপটলিক (অধিকরণিক অথবা রাজকীয় লেখ্যের রক্ষক), মহাপ্রতীহার (দৌবারিক শ্রেষ্ঠ), মহাভৌগিক (প্রধান অশ্বরক্ষক), মহাব্যুহপতি মহাপীলুপতি (প্রধান গজ-রক্ষক) ,মহাগণস্থ ('গন' নামক সেনা-মন্ডলীর নেতা), দৌঃ সাধিক (দ্বারপাল অথবা গ্রাম-পরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশ-কর্মচারী বিশেষ), নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ সেনাধিকৃত পুরুষ), হস্তিব্যাপৃতক (হস্তিতত্ত্বাবধায়ক), অশ্বব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ), মহিষ- ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ) ও অবিকাদি ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ("গুল্ম" নামক সেনামন্ডলীর অধিনায়ক), দন্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ), দন্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ),বিষয়পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি রাজ কর্মচারী দিগকে এবং অধ্যক্ষ-প্রচারে উক্ত (অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত), কিন্তু এই শাসনে (পৃথকভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে, চট্টা-ভট্ট-জাতীয় জনপদবাসিগণকে , ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণগণকে ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন এবং আজ্ঞা করিতেছেন,(নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলের অভিমত হউক-যথা, স্বস্বীমাবচ্ছিন্ন তৃণ-পূতি-গোচর পর্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ সমেত, লবণোৎপাদক ভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত গর্ত ও উষর ভূমির

www.pathagar.com

সহিত, যাহার (অর্থাৎ,যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট-ভাট জাতির প্রবেশাধিকারবিরহিত, যাহা হইতে কোন প্রকারের করাদি গৃহিত হইবে না, রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদি (সর্বপ্রকারের) আয়ের সহিত উপরি লিখিত ভুমিখন্ড সাবর্ণ গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান-ঔষধ-জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত(ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, যজুর্বেদের কন্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনর্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র,শান্তি গৃহাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্মাকে-এই পূণ্য দিবসে যথাবিধি উদকস্পর্শ-পূর্বক ভগবান বাসুদেব-ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ সূর্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণু-চক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীমান ভোজবর্মদেব প্রদান করিলাম।

এই অভিপ্রায়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছেঃ "ভূমি স্বদত্তই হউক, আর অন্য দত্তই হউক, যিনি ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ ভোজবর্মদেব-পাদীর সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে, নি-বদ্ধ অনু। মহাক্ষ (পাটলিক) নি (বদ্ধ)।"

বেলাব লিপি থেকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা মুশকিল যে বর্ম রাজাদের মধ্য হতে কে, কখন প্রথম পূর্ববঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথমেই দেখা যায় বজ্রবর্মা থেকে বংশের তালিকা শুরু হয়েছে। বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা সার্বভৌম স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। এই প্রসংগে বিক্রমপুরের ইতিহাস গ্রন্থে জাত বর্মা সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে এভাবে"বজ্রবর্মা হইতে জাতবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। জাতবর্মা সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাহাঁকে"সাচ্ছিয়ং বিততবান্দ্যাং সার্বভৌম শ্রিয়ম্" বিশেষনে বিশেষিত করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, জাতবর্মা স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন-"তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে অর্থাৎ, বিপুলশ্রী ধারণ করিয়া, কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া" শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই (সুবিখ্যাত) কামরূপ(রাজ্য) শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য(নামক কৈবর্তনায়কের) ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্ধনের (ব্যক্তি বিশেষের নাম), শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় (ব্রাহ্মণগণকে) ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

'রাম চরিত"কাব্যে (১। ৯ শ্লোকে) লিখিত আছে-তিনি পরাজিত হইয়া' গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপালকে "যৌবনশ্রী" নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কন্যা "বীরশ্রীর" সহিত 'জাতবর্মার' পরিণয়ের কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়া জাতবর্বার অভ্যুদয় কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পরলোক-গমনের সঙ্গে, সঙ্গে কৈবর্তনায়ক দিব্যের বা দিব্যোকের বিদ্রোহে, বরেন্দ্রী হইতে পালরাজগণের শাসন উম্মুলিত হয় এবং পাল-সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সেই সুযোগে পাল-সাম্রাজ্য–ভুক্ত "কামরূপ" "অধিকার করিয়া জাতবর্মা পুর্ববঙ্গে" "সার্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন"।

www.pathagar.com

তাহলে বলতে পারি, বেলাব-লিপি আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসকে জানতে সক্ষম হয়েছি। এটাও প্রমাণিত যে হরিবর্মদেবের পুত্রের সময় বর্মরাজত্বের অবসান হয়। তবে এরা দক্ষিণ পূর্ববাংলার উপর দ্বাদশশতাব্দী পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলো বলে জানা যায়। যদিও ময়মনসিংহ তাদের অধিকারে ছিলোনা তবুও প্রভাবাধীন ছিলো। এটি মনে রাখলে বর্মরাজদের প্রতি যেমন সুবিচার করা যায়, তেমনি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও সুরক্ষা হয়।

রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক ইউনিট
(৮ম হতে একাদশ শতাব্দী)

প্রশাসনিক কেন্দ্র	প্রশাসনিক অধিকর্তা	রাজস্ব বিভাগীয় অধিকর্তা	বিচারাধিকর্তা	পুলিশাধিকর্তা
ভূক্তি (প্রদেশ)	মহামাত্যাধিকরনিক	মহাভোগপতি	মহাদন্ড নায়ক	মহাসন্ধি বিগ্রহিক
মন্ডল (বিভাগ)	মন্ডলাধিকরনিক	ভোগপতি	দন্ড নায়ক	সান্ধিবিগ্রহিক
বিষয়(জেলা)	বিষয়াধিকরনিক	শৌল্কিক	দান্ডশক্তি	চৌরদ্ধরণিক
দাশগ্রাম (থানা)	দাশ গ্রামিক	দাশাধিকৃত	দাশাপরাধিক	খড়গ গ্রাহ
গ্রাম	গ্রামিক	x	x	x

www.pathagar.com

সেনরাজ (১১৬০-১১৭৮)

প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের রাজা বিজয়সেনের পূর্বে পাল বংশীয় রাজা রামপালের (১০৮২-১১২৪) রাজত্বকালে ময়মনসিংহ অঞ্চল দখল করে নেবার অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি, সামান্যকিছু এলাকা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলো। তবে সে সামান্য অংশ টুকুর পরিধি কত সেটির বর্ণনা মেলা ভার। রাজা ভোজবর্মনের বেলাব তাম্রলিপি হতে জানা যায়, রাজা যাতবর্মন উত্তর বাংলার দিব্য নামক এক বিদ্রোহী নরপতিকে (দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে উত্তর বাংলার অধীশ্বর হন) এবং কামরূপের তদানীন্তন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এতে মনে হয় সেসময় ময়মনসিংহ জেলা তাঁর অধিকারে না থাকলেও তাদের প্রভাবাধীন ছিলো। তবে একথা সত্য যে, দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় বর্মনগণ আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ্য হয়েছিলো। এই রাজাগণের রাজধানী ছিলো বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলা)। ধর্মের দিক থেকে এরা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বিজয়সেন সারা বাঙলা অধিকার করে রাজত্ব করেন। বিজয়সেন সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে "প্রজাদের ঘরে ঘরে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে যাতায়াত করতেন"। এদিকে দেবপাড়ালিপি হতে জানা যায়ঃ-"বিজয়সেন সমগ্র বরেন্দ্রভুমি স্বীয়করতলগত করিয়াছিলেন বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বিজয়সেন রাজা, বীররাঘব ও বর্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন মিথিলার রাজা নান্যদেবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন"। বিজয়সেন শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গ জয় করেননি তিনি কামরূপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে কামরূপ তিনি নিজ আয়ত্তে রাখতে সমর্থ হননি, তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। কেননা সেসময় রামপালই দুর্দশাগ্রস্থ, গৌড় রাজাগণের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিলোনা, চলছিলো কৈবর্তবিদ্রোহ। বিজয়সেন নানা বিদ্রোহ দমন করে একটু শান্তির পরশ পাবার আগেই ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮) বাংলার সিংহাসনে বসেন। এরা হিন্দু ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাই এই ধর্মকে রাজকীয়ভাবে স্বিকৃতি দেয়া হয়। বল্লাল সেন তার পিতার রাজত্ব ছাড়া আরো রাজ্য জয় করেছেন, এ ধরণের তথ্য পাওয়া না গেলেও তার সময়ে সেনসাম্রাজ্য সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলো। ময়মনসিংহের কোন কোন এলাকা তাদের করতলগত ছিলো তা নির্ণয় করা খুব কঠিন। মধুপুরের মধুসেন কি সেন বংশের কোন নরপতি ছিলেন? অথবা এটাকি ছিলো তাদের কোন অস্থায়ি প্রশাসনিক ইউনিট, তা আজও অন্ধকারে রয়েছে। তবে উত্তর পূর্ব ময়মনসিংহ কামরূপ রাজ্যের অধীনে শাসিত হচ্ছিলো এখন এটা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। আমরা দেখতে পাই গৌড় থেকে বিতাড়িত সেনরা বিক্রমপুর হতে তাদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমগ্র অঞ্চলে।

www.pathagar.com

সেন বংশের নরপতিদের মধ্যে বল্লাল সেন ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজা। তিনি প্রথমে তাঁর পিতার মতো শৈবপুজারী ছিলেন এবং পরে বৈষ্ণবদেরও অনুসরণ করতেন। তিনি তাঁর বদান্যতার জন্য খ্যাতি লাভ কলেছিলেন। বল্লাল সেন ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র লক্ষণসেন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ই ময়মনসিংহের বেশীরভাগ এলাকা সেনদের শাসনাধীনে চলে যায়।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষণসেন(১১৭৮-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়াধিপতি হন। এই লক্ষণ সেনই তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞার বলে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা করতলে আনতে সমর্থ হন। তবে তিনি ছিলেন অলসপ্রকৃতির লোক এবং আয়েশি মনোভাবাপন্ন। সাহিত্য ও ধর্মনিয়ে বেশীরভাগ সময় কাটাতেন। রাজ্যে কোথায় কি ঘটছে তা খুব একটা আমলে আনতেন না। ফলে রাজ্যব্যাপি গোলযোগ দেখা দেয়, দেখা দেয় চরম অশান্তি। এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি স্থানীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। সামন্ত নরপতিগণ সুবিধে মত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসলো এবং সঠিক সময়ে তারা সঠিক কাজটি করে সফলকামও হয়েছিলো।

ঠিক এ সময় তুর্কীবীর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানি (তখন নদীয়া ছিলো) আক্রমণ করে বসলো। রাজা কোন উপায়ান্তর না দেখে খিড়কি দরজা দিয়ে (গোপন পথ) পালিয়ে যান এবং বিক্রমপুর এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন(১২০৪ খ্রিস্টাব্দ)। রাজা লক্ষণসেন বিক্রমপুর এসেও বসে থাকেননি। তিনি সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যহতে দু'জনকে আমরা রাজা হিসেবে দেখতে পাই। তাঁর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপসেন (১২০৬-১২২০খ্রিস্টাব্দে), দ্বিতীয় পুত্র কেশবসেন (১২০৬-১২২৩ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্য পরিচালনা করেন। ১২০০-১২২৮খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ময়মনসিংহের উত্তরপূর্ব অংশ কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিলো।

এখানে স্পষ্ট করে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, মুসলিম শাসকগন তখন পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা স্পর্শ করতে পারেননি। তবে সামন্তরাজগণের কারণে পূর্ব ময়মনসিংহ সহ অন্যান্য স্থানগুলো টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নেন নব্য গজিয়ে ওঠা ভূঁইয়াগণ। এদের মধ্যে কোচ, গারো, হাজং অধ্যুষিত জঙ্গলবাড়ী, খালিয়াজুরি, মদনপুর, সুসং, বোকাইনগর, মধুপুর প্রভৃতি এলাকায় পাল ও সেনরাজগণ রাজ্য পরিচালনা করছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট হিসেবে।

সপ্তম শতাব্দি থেকে একাদশ শতাব্দির মধ্যবর্তী সময় বৌদ্ধ, খড়গ, চন্দ্র রাজগণ বাংলার বিশাল ভূ-মন্ডল শাসন করেছেন। এদের অর্থানুকুল্যে অনেকগুলো বিহার স্থাপিত হয়েছিলো। এসকল বিহারের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন ও উদ্যোগের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ ঘটে। যদিও অত্র অঞ্চলে তখনকার সৃষ্ট কোন বৌদ্ধ সাহিত্যের বা চর্যা গীতিকারদের কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য না পাওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সেসময় যেসকল

www.pathagar.com

উপকরণের মধ্যে গ্রন্থাদি লিখিত হতো সেসব উপাদান মোটেও টেকসই ছিলোনা। তদুপরি দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য এ অঞ্চলের আবহাওয়া মোটেই অনুকূলে ছিলোনা। বন্যা-ঝড়, অগ্নিকান্ড আর অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাই দায়ি। দীর্ঘ সাড়ে চারশত বছর এ অঞ্চলে রাজাদের অর্থানুকুল্যে চারটি বিহার পরিচালিত হয়ে আসছিলো। কে জানে আজকের গৌরিপুর থানার বোকাইনগর, ফুলবাড়িয়া থানার বানার নদীর পাশে পারিখা বেষ্টিত আনুই রাজার বাড়ি, ত্রিশালে দেবল-রাজার পরিখা বেষ্টিত ভগ্ন বাড়ির ইটের টুকরাগুলো কাদের কথা বলে বেড়াচ্ছে? গুপ্তবৃন্দাবন (মধুপুর) ঝরোকা (ঘাটাইল) কারাইবা এ সকল এলাকায় বসবাস করতো।

একাদশ দ্বাদশ শতাব্দিতে বাংলার ভাস্কর্য অলংকরণে চরম উৎকর্ষ লাভ করে । বাহ্যিক অলংকরণই ছিলো সেন আমলের বৈশিষ্ট্য। যদিও সেন আমলের পূর্বেই গুপ্ত ভাস্কর্যের কমনীয়তা, লাবণ্য, মাধুর্য ও ভাবালুতা লোপ পেতে শুরু করেছিলো। এরপর পূর্ববর্তী ভাস্কর্যের সমন্বয় রেখে অপূর্ব অলংকরণের আস্তরন দিতে গিয়েই অত্যাধিক সুন্দর করতে করতে মূর্তিগুলোর স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। আমরা জানি, যে শিল্পের কোন অন্তর্নিহিত শক্তি বা রূপ নেই সে শিল্প সৃষ্টিশীল হতে পারে না। সেন আমলেই বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের অবনতি ঘটতে শুরু করে। এর মূল কারণ সে আমলের জীবন ধারার মধ্যে নিহিত ছিলো। শাসক ও বিত্তবানরা অতিমাত্রায় ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে এবং নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয় ফলে সবকিছুতে জৌলুস প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এসময় সংস্কৃত সাহিত্যেরও একই অবস্থা দৃষ্ট হয়। সাহিত্যে বাক্যালংকরণের বাহুল্য এতই ভরপুর হয়ে ওঠে যে কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক সৃষ্টি উপাদান খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। রাজপ্রসাদ ও বিত্তবানদের গৃহে নর্তকী ও প্রমোদবালাদের কর্মচাঞ্চল্য অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিলো।

বাংলাদেশ ভাস্কর্যের বিনাশ ঘটে রাজনৈতিক কারণে। সেন আমলে মুসলমানদের আগমন ঘটে শাসক হিসেবে। ইসলাম পৌত্তলিকতার পরিপন্থী। তাই নতুন শাসকগণের ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি আগ্রহতো ছিলোইনা বরং তারা নিজেরা মূর্তি বিনির্মানের বিরোধী ছিলেন। হিন্দুরা ভয়ে সেসব মূর্তি পানিতে ফেলে দিতেন অথবা মাটি চাপা দিয়ে দিতেন। মোটকথা এয়োদশ শতাব্দির শুরুতেই বাংলার ভাস্কর্যের ধ্রুপদী অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ ঃ প্রথম মুসলিম বিজয়

ময়মনসিংহে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বিজয়ের ঘন্টা দেরিতে বাজে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, হিন্দু রাজা-জমিদারদের শাসন-শোষণ শেষে মুসলমানগণ সময়ের প্রয়োজনে পথপরিক্রমায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নিয়েই ময়মনসিংহে তাঁদের বিজয় সূচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু শাসকদের প্রশাসনিক দুর্বলতা, বিশৃঙ্খলা, এক পর্যায়ে বিচক্ষণতা ও শক্তিসম্ভারের ঘাটতি পুঁজি করেই ময়মনসিংহে মুসলমানদের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে।

বিক্রমপুরের সেন রাজাদের দূর্বলতার সুযোগে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে কোন একসময় চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ মাধব দেব দক্ষিণ পূর্ববাংলায় ক্ষমতা বিস্তার করেন । দনুজ মাধব ধীরে ধীরে (বরিশাল) বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও অধিকার করেন। সে সময় সেন বংশের শেষ রাজা মধুসেন বিক্রমপুর শাসন করছিলেন। দনুজ মাধব কর্তৃক পরাজিত হয়ে রাজা মধুসেন ভাওয়াল গড়ের পশ্চিমাংশে পালিয়ে যান এবং সে অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। এই মধুসেনের নামানুসারে ভাওয়াল গড়ের এ অংশের নামকরণ হয় মধুপুর গড়। ১২৭২ খ্রিস্টাব্দের পর তুগরিল খান লক্ষ্ণৌতির ক্ষমতা দখল করেন এবং পরবর্তী বছরগুলোতে রাজ্যসীমা বিস্তারের জন্য চারিদিকে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় মধুসেন সমগ্র মধুপুর অঞ্চল তাঁর শাসনে আনতে পেরেছিলেন।

ঐতিহাসিক বারানীর মতে তুগরিল খান সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী অঞ্চল দখল করলেও হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধের মুখে তিনি সোনারগাঁও ভূখন্ড দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর দখলকৃত এলাকায় একটি দুর্ভেদ্যদুর্গ তৈরি করেন। বারানী এই দূর্গকে "তুগরিলের কীল্লা" নামে অভিহিত করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এটিকে "নরকিল্লা" নামেও উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু পন্ডিত নরকিল্লাকে ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ফিরিংগীদের লড়িকেলের সংগে অভিন্ন মনে করেন। দিল্লির সুলতান বলবন তুগরিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করলে তুগরিল নরকিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সোনারগাঁয়ে তখন রাজা দনুজ মাধব অবস্থান করছিলেন। আমরা মনে করি ঢাকার ২৫মাইল দক্ষিণে লরিকেলের সাথে নরকিল্লার সম্পর্ক স্থাপন অযৌক্তিক। তাঁর কারণ তুগরিলের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধ তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত করেছিলো এবং তখন পর্যন্ত তুগরিল বিক্রমপুর পর্যন্ত দখল করতে পারেননি। অতএব, ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে তুগরিল খান কর্তৃক দূর্গ নির্মাণের কথা চিন্তাও করা যায় না। সঙ্গতকারণে আমরা তুগরিল খান কর্তৃক তৈরি নরকিল্লাকে অন্যকোথাও সনাক্ত করতে আগ্রহী। মধুপুর থানার ধোপাখালি ইউনিয়নে নরিল্লা নামক একটি প্রাচীন গ্রাম রয়েছে। এ গ্রামটি ইটপাথর আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বিশশতকের দ্বিতীয়দশকে স্থানীয় লোকজন এ স্থানটি জমিদারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় অসংখ্য ইট পাথর ও আরবী মুদ্রা উদ্ধার করেন বলে জানা যায় এবং নিবন্ধকার স্থানীয় বয়স্ক মুরব্বীজনদের সাথে আলোচনা করে একই তথ্য পান।

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা যে, তুগরিল খান মধুসেনকে পরাজিত করে অত্র অঞ্চল দখল করেন এবং হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধের মুখে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলে বিজিত অঞ্চল রক্ষার জন্য মধুপুরের নিকটবর্তী স্থানে একটি দূর্গ তৈরি করেন। যেটি জিয়াউদ্দিন বাররানী নরকিল্লা নামে অভিহিত করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু মহামেদ হাবিবুল্লা বলেছেন "কিল্লা বা কিলাহ শব্দের 'কোল' হওয়ার সম্ভাবনা বাংলা ধ্বনিতত্বে পাওয়া যায় না। বরং নরকিল্লা আ শব্দ নরিল্লা বা নরিলা হইতে পারে"। উপরের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, তুগরিল কর্তৃক নির্মিত দূর্গ নরকিল্লা ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণে লরিকেল নয়, বরং ঢাকার ১৫০ মাইল উত্তরে মধুপুর থানার নরিল্লা নামক স্থান। তাহলে মনে করতে হবে যে, দক্ষিণ-পূর্ববাঙলার এই মধুপুর ও ভাওয়াল অংশটুকু সর্বপ্রথম মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়। যেটি বৃহৎ ময়মনসিংহের একটি এলাকা। আর এ বিজয় সংঘটিত হয়েছিলো ১২৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়। তুগরিল খাঁর বিজয়ের মাধ্যমেই এ এলাকায় স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা দেখা যাচ্ছে তুগরিল খাঁ'র মৃত্যুর পর বলবনী বংশের শাসনকর্তা রুকনউদ্দিন কায়কাউসের সময়(১২৯১-১৩০০) লক্ষ্ণৌতির টাকশাল থেকে তৈরি এক ধরণের মুদ্রায় লেখা আছে,"এই মুদ্রা বঙ্গের খাজনায় নির্মিত"। মুদ্রা লেখ থেকে পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে, কায়কাউসের সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গলার কিছু কিছু অঞ্চল জয় করা হয়েছিলো। আমাদের ধারণা যে তুগরিল খাঁ কর্তৃক বিজিত মধুপুর অঞ্চল শুরু থেকে তাঁর অধিকৃত ছিলো এবং পরবর্তী সময় তিনি ভাওয়াল গড় অধিকার করেন। তিনি সংগৃহিত রাজস্ব দ্বারা মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে, কায়কাউসের সময় (১২৯৯) সমগ্র বঙ্গ তথা সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ত্রিপুরার সকল এলাকায় মুসলমানদের বিজয় সুচিত হয়নি। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সামসুদ্দিন ফিরোজশাহ সোনারগাঁ অধিকার করেন এবং ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ এবং ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জয় করেন। এ কথা সত্য যে এ সময় পূর্ববাংলার মুসলমানদের বিজয় ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। তারপরও বিভিন্ন লেখমালা ও পুরাকীর্তির উপর নির্ভর করে ধারণা করা যায় যে, পূর্ব বাঙলায় মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ই সর্ব প্রথম মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়ে থাকবে।

সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ সমগ্র পূর্ববাংলা (ত্রিপুরা ব্যতীত) অধিকার করে তিনটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো সোনারগাঁও, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো সাতগাঁও (হুগলির কাছে) আর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো লক্ষনাবতী। সুলতানী আমলে সমগ্র বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রধান প্রশাসনিক ইউনিটে বিভাজন করা হয়। রাজ্যের প্রধান বিভাগকে বলা হতোঃ ইকলিম (প্রদেশ), ইকলিম প্রধানের উপাধি ছিলো ইকলিমদার। প্রতিটি ইকলিম কয়েকটি শিকায় ভাগ করা হতো। শিকাহ প্রধানের পদবি ছিলো শিকাহদার, যা আজকাল শিকদার নামে পরিচিত। প্রতিটি শিকাহকে কয়েকটি ইকতায়

www.pathagar.com

এবং প্রতিটি ইকতাকে কয়েকটি যোয়ারে ভাগ করা হতো। ইকতার প্রধানকে বলা হতো ইকতেদার, আর যোয়ারের প্রধানকে বলা হতো যোয়ারদার। সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ) সর্ব প্রথম সোনারগাঁয়ের সাথে ইকলিম যুক্ত করে "ইকলিম সোনারগাঁও" সংযুক্ত করেন। ইলিয়াস শাহের ছেলে সিকান্দার শাহ সোনারগাঁও থেকে ইকলিমের প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রত্যাহার করে নিয়ে সোনারগাঁয়ের পাঁচ মাইল দুরবর্তী ব্রহ্মপুত্রের তীরে মোয়াজ্জেমাবাদ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং পূর্বাঞ্চল প্রদেশের নামাকরন করেন ইকলিম মোয়াজ্জেমাবাদ (বর্তমান মহজমপুর)। মনে হয় রাজধানীর নাম ও বন্দর নগরীর নাম সোনারগাঁও হওয়ায় ইকলিমকে সোনারগাঁও থেকে পৃথক করা হয়েছিলো। যতোদূর জানা যায় ইলিয়াস শাহের সময় সিলেট, ময়মনসিংহ এবং বর্তমান গাজীপুর জেলা তৎকালীন ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। নিবন্ধকার নিজেই ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও ও গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার প্রান্তসীমায় প্রবাহিত সুতিয়া নদীর উত্তরে গিয়াসপুর টাকশালে তৈরী দু'টি মুদ্রা উদ্ধার করে জাতীয় জাদুঘরে জমা দিয়েছেন যেটি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মুদ্রা বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে মুসলিম সুফিইজমের বিরাট অবদান রয়েছে। বাংলা ছিলো শস্যভান্ডারে ভরপুর, তাই আরবীয় বনিকরা এদেশে ইসলাম প্রচারের বহু পূর্ব থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে আসছিলেন। তাঁরা এর সূত্র ধরে তাঁদের গোত্রীয়দের এ ভাবে আহ্বান করেছিলেন যে "বাংলা এক বিরাট শস্যভান্ডার, সে দেশের মানুষজন ইসলাম ধর্মী নয়, তোমরা দলবেঁধে যেতে পারো; সেদেশ জয় করে নিতে পারো। এতে সুবিধে হলো যারা যুদ্ধ করে জিতে যাবে, তারা সে এলাকা শাসন করে ইসলাম প্রচার ও তার প্রসারে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে এতে সোয়াব হবে। আর যারা যুদ্ধ করে শহীদ হবে তারা বেহেস্তবাসী হবে এবং বেঁচে গেলে হবে গাজী"। একটি শিলালিপি হতে জানা যায় ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি সিকান্দার খান গাজী সর্বপ্রথম সিলেট জয় করেন এবং এই শিলালিপিটি হযরত শাহজালালের(রঃ) নামে উৎসর্গ করেন। ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, হযরত শাহজালাল ৩৬০ জন আউলিয়া নিয়ে এ দেশে এসেছিলেন। শাহজালালের দরগায় প্রাপ্ত ফার্সী ভাষায় লিখিত দু'টি পুস্তক থেকে অবগত হওয়া যায় তিনি তুরস্কের কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন এবং লক্ষ্ণৌতির সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের সৈন্যবাহিনীতে যোগদিয়ে সিলেট জয় করেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস করে ইসলাম প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করেন। তাঁর সঙ্গীগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের বিয়ে-শাদী করে সংসারী হতে বলেন। তিনি নিজে ছিলেন চিরকুমার। এ সময় মরোক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইব্‌নে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সফরে এলে তিনি সিলেট গিয়ে হযরত শাহজালালের সংগে সাক্ষাত করেন। ইব্‌নে বতুতা বলেন মোঙ্গলরা ছিলেন দুর্ধর্ষ জাতি, তারা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ও শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল মুস্তসিমকে যখন হত্যা করেন তখন তিনি বাগদাদে অবস্থান করছিলেন। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে মোঙ্গলদের অত্যাচার

www.pathagar.com

সহ্য করতে না পেরেই বহু সুফী দরবেশ রাজনৈতিক ব্যক্তি, সেনাপতি, সৈনিকসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন মধ্য এশিয়া ছেড়ে নানা দেশে ছড়িয়ে পরে, বিশেষ করে ভারতে আশ্রয় নেন সবচেয়ে বেশী সদস্য। ইব্‌নে বতুতার বর্ণনায় জানা যায়, হযরত শাহজালাল ১৫০ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইব্‌নে বতুতার বর্ণনায় আরো পাওয়া যায় সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের পুত্রগণ ছিলেন হাতিম খান (গভর্ণর বিহার), জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ, গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর ও নাছিরউদ্দিন ইব্রাহিম (কতলু খাঁ)। সম্প্রতি তার ছয় পুত্র সন্তানের নামে অংকিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্য থেকে চারজন পুত্রই পিতার জীবিতাবস্থায় স্বাধীন উপাধি নিয়ে মুদ্রা জারি করেন। এতে অনুমান করা যায় সামসুদ্দিন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণ যাতে তাঁর সাথে বিদ্রোহ করতে না পারেন সে সুযোগ দিয়ে অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে মুদ্রা জারি করে সার্বভৌম ক্ষমতা ভাগাভাগি করেন। ফলে পিতা পুত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় মুসলিম রাজ্য বর্ধিত করণে নবদিগন্তের সূচনা উন্মোচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

এয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি কাঠামো এখানে প্রদর্শিত হলো।

প্রশাসনিক কেন্দ্র	প্রশাসক	রাজস্ব অধিকর্তা	বিচার বিভাগীয় অধিকর্তা	পুলিশ অধিকর্তা
ইকলিম/প্রদেশ	ওয়ালী	সাহিব-ই-দিওয়ান	মুফতি	কোতোয়াল-ই-বাকালী
শিক/জেলা	শিকাদার	দিওয়ান	কাজী-ই- শিক	কোতোয়াল
পরগনা/মহকুমা	আমিলদার	মুতাসররিফ	কাজী-ই-সদর	সদর-ই-কোতোয়াল
যোয়ার/থানা	যোয়ারদার	তহশিলদার	কাজী-ই-তহশিল	থানাদার
গ্রাম	পাঞ্চ	পাটোয়ারী	সদর-ই-পাঞ্চ	-

সাধারণ প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন, বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ও পুলিশ প্রশাসনে ময়মনসিংহে মুসলমানগণ তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা, যোগ্যতা, বিচক্ষণতাকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৌর্যবীর্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করে সময়ের প্রয়োজনেই মুসলমানগণ এই ময়মনসিংহে তাঁদের অবস্থানকে সুসংহত করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ মাত্রই যেহেতু সীমাবদ্ধতাকে অনুসরণ করে হাঁটে, সেহেতু মুসলমানগণও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্তহয়েও স্ব স্ব অবস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রাণশক্তি ছিলো অফুরান।

www.pathagar.com

ইলিয়াস

ওজন $\frac{১}{৫৩}$

ইলিয়াস

ওজন $\frac{১}{৯৩}$

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

আই. এম. সি. ৪০
৭৬০ হিঃ

আই. এম. সি. ৪১
৭৫৭ হিঃ

আই. এম. সি. ৪২
৭৬০ হিঃ

ওজন $\frac{১}{৯৯}$
৭৫৯ হিঃ

ওজন $\frac{১}{১০০}$
৭৬০ হিঃ

সিকন্দার শাহ

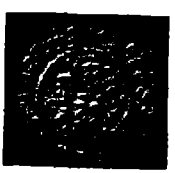

আই. এম. সি. ৬৯

আই. এম. সি. ৬৮

আই. এম. সি. ৭০
৮০০ হিঃ

আই. এম. সি. ৭৩
৮০৩ হিঃ

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ

www.pathagar.com

সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯)

সামসুদ্দিন শাহ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে তার পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজধানি পান্ডুয়াতে বসেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজ্য শাসন করেন। তাঁর বাবা ইলিয়াস শাহের সময় ফিরোজ শাহ তুগলঘ বাংলা অভিযানে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান বলে ঐতিহাসিকগণ যে মত প্রকাশ করেন তা নিবন্ধকারের মতে আদৌ সত্যনয়। কারণ, ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন ফিরোজ শাহ তুগলঘের বাংলা আক্রমণের পূর্বে পরে নয়। তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন ইখতিয়ার উদ্দিন গাজীকে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহকে নয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হবার পর ফিরোজ শাহ তুগলগ দ্বিতীয় বার বাংলায় অভিযান চালাতে এসেও ব্যর্থ হন। এ অভিযানে তার লোকবল ও অর্থের প্রচুর হানি হয়, ফলাফল দাড়ায় শুণ্যের কোঠায়। তিনি সিকান্দার শাহের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং দিল্লি ফিরে যান। এই যুদ্ধের পর সিকান্দার শাহকে আর কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়নি।

আমাদের দূর্ভাগ্য যে, এই সিকান্দার শাহের সময়ই দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্ক তথা যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ কালটাকে আমরা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসেবে গণ্য করতে পারি। কেননা শুধুমাত্র রিয়াজ-উস-সালেহীন, শিলালিপি ও কিছু মুদ্রাই আমাদের সামান্য তথ্য বলে জ্ঞান করতে হয়। এ পর্যন্ত মাত্র চারটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, আরও অনেকগুলো শিলালিপি এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত অবস্থায় রয়েছে। আবিস্কৃত মুদ্রা গুলো চারটি টাকশাল থেকে জারী হয়েছে বলে জানা যায়। মুদ্রাগুলো অনেক উন্নতমানের এবং নানারকম কারুকার্যময়। এতে তাঁর শৈল্পিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। তাছাড়া সুলতান সিকান্দার শাহ মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে খেলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ছাড়াও নিজে ঈমাম বা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত।

তাছাড়া তিনি অন্যান্য সুলতানগণকে খলিফা উপাধি প্রদান করতেন। সিকান্দার শাহ ছিলেন বাংলার সর্বময় কর্তা, তিনি আইন প্রণয়ন করতেন, রাজকীয়কর্মচারী নিয়োগদান করতেন, যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তিস্থাপন, বিচারবিভাগ পরিচালনা সবই ছিলো তাঁর হাতে ন্যাস্ত। এযাবৎ কালে প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে জানাযায় ইসলামের বিধি বহির্ভূত কোন আইন তিনি তৈরী করেননি। সুলতানী আমলে রাজধানি ছিলো যথাক্রমে লখ্নৌতি (গৌড়), পান্ডুয়া, একডালা ও তাড়ায়। পরবর্তী সময়ে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ রাজধানি স্থাপন করেন সোনারগাঁয়ে।

সুলতান সিকান্দার শাহ একজন সার্থক প্রশাসক ছিলেন। তাঁর শিলালিপি হতে জানা যায় তিনি সূফী, দরবেশদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর অবদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিনাজপুরের দেবকোটস্থ মোল্লা আতাহার দরগাহ, আদিনা মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণ তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে ।

www.pathagar.com

সুলতান সিকান্দার শাহ যে পিতাপুত্রের যুদ্ধেই নিহত হন; তাঁর সঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ খুঁজে পাওয়া ভার। তবে মিঃ হেমিল্টন বুকানন ও রিয়াজ-উস-সালেহীন গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ হতে জানা যায়-"Ghyashuddin, having also taken disghust, returned to the same place (sonargaon) and afterwards made war against his father, who after a regim of 32 years, feil in battle at a place called sapra, near Goyal para" বিহারের শায়খ মুজাফফর শমস বখলী প্রেরিত চিঠিতে বারবার সিকান্দার শাহকে "সুলতান শহীদ" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে অনুমান করা যেতে পারে পুত্র কর্তৃক সিকান্দার শাহ যুদ্ধে শহীদ হতে পারেন। একথা ঠিক যে গিয়াস উদ্দিন পিতার রাজত্বের শেষদিকে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সিকান্দার শাহ কর্তৃক শেষ মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিলো ৭৯১ হিজরীতে। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন ৭৯০ হিজরীতে। পন্ডিতগণ মনে করে থাকেন ৭৯১ থেকে ৭৯৩ হিজরীর কোন একসময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সিকান্দার শাহের দু'টি স্ত্রী ছিলো। প্রথম স্ত্রী জন্ম দিয়েছিলেন সতেরোটি পুত্র সন্তান আর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিলেন একমাত্র পুত্র গিয়াসউদ্দিন। গিয়াসউদ্দিন ছিলেন অন্যান্য ভাইদের তুলনায় গুণী। বৈমাত্রেয় ভাইদের তুলনায় সকল বিষয়ে শ্রেয় এবং শাসনকার্য পরিচালনে দক্ষ। এদিকে প্রথম রানী সুলতানকে চাপ দিতেন যেন গিয়াসউদ্দিনকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হত্যা করা হয়। কিন্তু বাবা তাঁর কর্তব্য পরায়ণ পুত্র গিয়াসউদ্দিনের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। গিয়াসউদ্দিন পূর্ব হতেই বিমাতার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি পালিয়ে গেলেন সোনারগাঁও রাজ্যে। সেখানে গঠন করলেন সৈন্যবাহিনী। গিয়াসউদ্দিন সৈন্যবাহিনী গঠন করে বসে থাকেননি তিনি পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়ে গোয়ালপাড়া প্রান্তসীমায় যুদ্ধে লিপ্ত হন পিতাপুত্র। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তাঁর সৈন্যদের আদেশ দেন যুদ্ধে তাঁর পিতা হেরে গেলে বা ধরা পড়লে কোনক্রমেই যেন মারা না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সিকান্দার শাহ যুদ্ধে নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পিতার মরদেহের নিকট যান ও পিতার মাথা কোলে তুলে নেন এবং পরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মরদেহ সমাহিত করে তিনি পান্ডুয়া অভিযান চালিয়ে সিংহাসন দখল করেই গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ উপাধি নেন। সিকান্দার শাহ ১৩৫৮-১৩৮৯ প্রায় ৩১ বছর সুনামের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে পুত্রের সাথে যুদ্ধে নিহত হন।

বাঙলায় মুসলিম শাসকগণ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বেশীকরে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ সমূহ দু'ধরণের কাজে ব্যবহার চলতো, নামাজ আদায় ও মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার। হিন্দু ও বৌদ্ধদের পরিত্যাক্ত স্থাপনাও ব্যবহৃত হতো। তাদের স্থাপিত নানা মূর্তি ফেলে দিয়ে সেখানে নতুনভাবে লতাপাতা ও ফুল, বিভিন্ন আরবী নকসা এঁকে দেয়া হতো সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। প্রকৃত পক্ষে, মুসলিম শাসকদেরকে প্রথম খিলান বা ট্রুআর্চ পদ্ধতির প্রবর্তক বলা

www.pathagar.com

যায়। সুলতান সিকান্দার শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নির্দশন। এটি ৩৯৭ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৯ ফুট প্রস্থ, চেহনের চারপাশে সরাসরি কক্ষ রয়েছে।

কক্ষের উপরে ৩৭৬ টি ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রিকভাবে বিন্যস্ত এবং প্রত্যেকটির উপর গম্বুজ নির্মাণ দৃষ্ট হয়। পান্ডুয়াতে রয়েছে সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সমাধি। এটি একলাখী ভবন হিসেবে পরিচিত। এ ভবনের কার্ণিশ খড়ের চালের মতো বাঁকা এবং দেয়াল একটু বাড়ানো। সেখানে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও নসরতশাহ নির্মাণ করেন ছোট ও বড় সোনা মসজিদ। গৌড় ও পান্ডুয়ার মুসলিম স্থাপত্যের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে এগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, মুসলিম শাসকগণ তাঁদের কীর্তি টিকিয়ে রাখার জন্য ভবনসমূহে স্মারকচিহ্ন হিসেবে শিলালিপি খোদাই করে রাখতো। বর্ণিত খোদাইকৃত লিপিগুলোতে থাকতো নির্মাতার নাম, তারিখ ও ভবনের প্রকার। এ পর্যন্ত বহুমূল্যবান হাতের লেখা ও ক্যালিওগ্রাফি পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ করার মতো তুগরা, নস্‌খ, কুফিক, নস্তালিক ইত্যাদি। আমাদের দেশে লিখনে ব্যবহৃত নস্‌খ পদ্ধতির প্রচলন ছিলো সবচেয়ে বেশী। ইদানিং বিভিন্ন ধরণের ইসলামী ও আরবী শিলালিপির ক্যালওগ্রাফিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে। সুলতানি আমলে প্রশাসনিক বিভাগের ইউনিট সমূহের বিন্যাস প্রদান করা হলোঃ

প্রশাসনিক কেন্দ্র	প্রশাসক অধিকর্তা	রাজস্ব বিভাগীয় অধিকর্তা	বিচার বিভাগীয় অধিকর্তা	পুলিশ বিভাগীয় অধিকর্তা
ইকলিম/প্রদেশ	ওয়ালী	সাবিই-ই-দীওয়ান	কাজী-ই-সদর	ফৌজদার
শিকাহ(বিভাগ)	শিকাদার	মুনসিফান	কাজী-ই-শিকাহ	ফৌজদার
আরছা(জেলা)	আমলগুজার	মুনসিফ	কাজী-ই-আরছা	কোতোয়াল
পরগণা(থানা)	আমিল	মুতাসশররিফ	কাজী-ই-পরগণা	দারোগা
মৌজা(ইউনিয়ন)	সর-ই-পাঞ্চ	পাঞ্চায়েত সংঘ	তহশিলদার	দারোগা-গ্রামচৌকিদার

www.pathagar.com

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

(১৩৮৯-১৪১০-১১)

আজম শাহ পিতার মৃত্যুর পর এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের কর্ণধার হলেন; নিজ শাসন ও ক্ষমতাবলে রাজ্যে শান্তিস্থাপন করতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর রাজ্যগুলোর মধ্যে সোনারগাঁয়ে ছিলো বেশী সুখ ও সমৃদ্ধির সুবাতাস। উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁর অধীনে ফীরুজাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, জান্নাতাবাদও সাতগাঁও টাকশাল হতে মুদ্রা উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। আসাম থেকেও মুদ্রা চালু হবার নজির পাওয়া গেছে। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই গৌহাটি জাদুঘরে শোভা পাচ্ছে সিকান্দার শাহ ও আজম শাহের উৎকীর্ণ মুদ্রা। এতে বুঝাযায় আসাম তাঁর করতলগত ছিলো। আজম শাহ আলমের আবিষ্কৃত শিলালিপি গুলোর মধ্য হতে দুটো লিপির পাঠোদ্ধার এ যাবৎ করা সম্ভব হয়নি। তবে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সংগে কামরূপ রাজ্যের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, মুদ্রা প্রাপ্তি ঘটেছিলো-এসবই সঠিক। তবে একটি মুদ্রার উপর নির্ভর করে বলা বোধহয় সঠিক হবেনা কামরূপ তাঁর শাসনাধীন ছিলো। তবে আংশিক শাসন কাল অনুমিত হয়। যোগিনীতন্ত্র গ্রন্থে বলা হয়েছে "মুসলমানরা ১৩৯৪-১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করে এবং ১২ বছর তাঁদের অধিকার রাখে"।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সুশাসক, ন্যায়বিচারক, চরিত্রবান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সুলতানের একটি তীর এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা তাঁর পুত্রের বিচার চেয়ে কাজী আদালতে নালিশ করলে, কাজী সমন জারীর মাধ্যমে সুলতানকে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। সুলতান যথাসময়ে কাজীর আদালতে বিচারে হাজির হন নিক্ষেপিত একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে। এদিকে কাজী একটি বেত আগেই সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছিলেন। কাজী সুলতানকে প্রদত্ত রায়ে জানিয়ে দিলেন বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য। সুলতান রায় মেনে কাজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তিনি (কাজী) সঠিক বিচারের রায় না দিতেন তাহলে সুলতান কাজীকে শিরচ্ছেদ করতেন। আর কাজী প্রতিউত্তরে সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যদি সুলতান রায় না মানতেন তবে বেত্রাঘাতে সুলতানের পিঠের চামড়া উঠিয়ে নিতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হলো ভারত তথা বাংলার সাথে চীনের প্রাচীন যোগসূত্র পূণর্জ্জীবিত করা। তিনি দু'দেশের মধ্যে দূত বিনিময় করেন। ফলে চীন সম্রাট সুলতান ও বেগমের জন্য নানা রকম উপঢৌকণ সহদূত পাঠান। চীন সম্রাট বাংলাদেশের বৌদ্ধ সন্যাসী পাঠানোর অনুরোধ জানালে এখান থেকে মহারত্ন ধর্মরাজা নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৪১০-১৪১১ খ্রিস্টাব্দে চীনদেশে ভ্রমণে যান। ফলে দু'দেশের বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। এদেশে মাহুয়ান নামে এক ঐতিহাসিক ভ্রমণে এসে বাংলা ও বাঙালীদের

www.pathagar.com

বেশভূষা, উৎপাদিত সামগ্রী, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদির চমৎকার বিবরণ লিখে রেখে যান। মূলত বন্দর নগরী চট্টলায় সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হয়েছিলো। হয়েছিলো চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন।

রিয়াজ থেকে জানা যায় গিয়াসউদ্দিন একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনজন নারীর সেবায় তিনি সুস্থ হন। এ সুস্থতা তাঁর মনে লেগে থাকে আর তখনি তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন (গজল), কিন্তু ছত্র মিলাতে সক্ষম হলেন না। তখনি ইরানের অমর কবি হাফিজের কাছে লাইনগুলো চিঠিতে লিখে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানান সবুজ বাংলায় ভ্রমণের জন্য। সে সময় কবি অসুস্থ ছিলেন, তাঁর পক্ষে ভ্রমণ সম্ভব নয় তা বিনয়ের সাথে জানিয়ে গজলটি পূরণ করে ও আরো একটি গজল লিখে সুলতানের নিকট পাঠিয়ে দেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সকল ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন। বিশেষ করে চার মাজহাবের প্রচারের জন্য বক্তৃতা দেয়ার মঞ্চ তৈরী করে সফলভাবে তা বাস্ত্মবায়নে তদারকীও করতেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ যে সকল বিষয়ে সফলকাম হয়েছিলেন, সেগুলো হলো দেশীয় পণ্য ও বাণিজ্য। এগুলোর মধ্যে মসলিন, সুতিবস্ত্র, কাগজ, ধান, নারকেল, মদ ইত্যাদি। আন্ত্মর্জাতিক বাজার ধরতেও তিনি তৎপর ছিলেন। তখন এখানে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা তৈরী হতো, ওজন ছিলো মণ সের। হাটবাজারে তঙ্কার সাথে কড়ির প্রচলন ছিলো। রাজকর্মচারীদের সীলমোহর থাকতো, সৈন্যগণ নিয়মিত বেতন ও রসদ পেতেন। বাঙলায় শাস্ত্রবিদ, জ্যোতিষী চিকিৎসকগণের অভাব ছিলো না। অর্থাৎ তৎকালে বাংলাদেশ একটি সুন্দর ও প্রাচুর্যের দেশ ছিলো।

এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যে, ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ ছিলেন উদার প্রকৃতির। তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। এই উদার নীতি কিংবা অন্যকোন কারণেই হোক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেননি। শোনা যায় ১৪১০-১৪১১ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় একজন হিন্দু অমাত্য হত্যা করেন তাঁকে।

www.pathagar.com

রাজা গণেশ ও সুলতান জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ

রাজা গণেশের সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে অনেক কথা আছে। মুসলিম শাসন আমলে তাঁর বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ তাঁর যোগ্যতারই স্বীকৃতি। বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ একটি বিতর্কিত নাম। তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পাওয়া যায়। রিয়াজে রাজা গণেশকে ভাতুড়িয়ার জমিদার বলা হয়েছে। ভাতুড়িয়া উত্তরবঙ্গের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল। হ্যামিল্টন বুকাননের মতে রাজা গণেশ দিনাজপুরের জমিদার ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বঙ্গে মুসলিম শাসনকালে একজন হিন্দু শাসক বাংলার অধিকর্তা হয়েছিলেন। রাজা গণেশ যেভাবেই সিংহাসনে আসুননা কেন, তিনি ছিলেন খুবই চালাক ও চতুর শ্রেণীর লোক। একে একে অনেকগুলো রাজা শাসকদেরকে হত্যা করে তিনি সিংহাসন দখল করেন। মুসলমানরা যখন অত্যাচারে জর্জরিত, ঠিক সেই সময় মুসলিম রাজাদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন জৌনপুরের শাসক ইব্রাহিম শর্কি। এদিকে গণেশ তাঁর পুত্র যদুকে মুসলমান বানিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসান ও নেপথ্যে গণেশ নিজেই শাসনকাজ চালাতে থাকেন। পূর্বের মতো করে যদু, জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কথিত আছে যে, রাজা গণেশ স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়নি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো(১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি দু'বছর রাজত্ব করেছিলেন। দূর্ভাগ্যবশত বলতে হয় সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে পৌঁছায়নি। অথচ রাজা গণেশ বাংলার ইতিহাসে তাঁর স্থান দখল করে আছেন। তবে আমাদের যে সব তথ্য রয়েছে তাতে বলা যায়, গণেশের পুত্র জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৪১৫-১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। সমগ্র বাংলাদেশ তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। জালাল উদ্দিন একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি চীনসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, তার সময় ব্যবসা বাণিজ্যেও প্রচুর প্রসার ঘটেছিলো। তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামীর উর্ধ্বে ছিলেন। যোগ্য লোকদের যথাযোগ্য আসন ও সম্মান দিতেন। সুলতান জালাল উদ্দিন মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন,এর কারণ হতে পারে যে তিনি প্রথমে হিন্দু ও পরে মুসলমান হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশেলে গড়ে ওঠা জালাল উদ্দিন বাংলাদেশের মনও মানস বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিজের কার্য উদ্ধার করেছিলেন।

সুলতান জালাল উদ্দিন মাহমুদ্ শাহের যে মুদ্রাগুলো পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় তিনি "খলিফত-উল্লাহ" বা আল্লাহর প্রতিনিধি এবং "ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী" রূপেও নিজেকে ঘোষনা করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে অনুসরণ করতেন। মক্কাশরিফে মাদ্রাসা স্থাপন করে তিনি তার ব্যয় নির্বাহ করতেন। পবিত্র মক্কাশরিফের লোকজনদের জন্য তিনি বিভিন্ন উপহার সামগ্রী পাঠাতেন। শুধু তাই নয়, তিনি পিতা কর্তৃক নির্বাসিত শায়েখ নূর কুতুবউল আলমের পৌত্র শায়খ জাহিদ আলমকে দেশে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর বাবা গণেশ যে সকল

www.pathagar.com

মুসলিম স্থাপত্য ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলো পুনর্নির্মান এবং সংস্কার করেন। ইসলামের নামে রাজা গণেশ মুদ্রা জারি করার আদেশ রহিত করে। জালাল উদ্দিন পুনরায় প্রচলিত মুদ্রায় কালেমা উৎকীর্ণ করেন ।

জালাল উদ্দিন নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান হলেও হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ছিলেন উদার। তাঁর একটি উদাহরণ হলো-রাজ্যধরকে সেনাপতি ও বৃহস্পতি মিশ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করা। মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধনকল্পে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করার পরও তদানিন্তন মুসলিম সমাজের মুসলমানগণ তাঁকে হেয় চোখে দেখতেন। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ও কুণ্ঠিত না হয়ে জালাল উদ্দিন স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। জালাল উদ্দিনের দু'টি টাকশালের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, একটি ফতেহবাদ (ফরিদপুর) অপরটি রোসপুর (দাক্ষিণাত্য) তাঁর সময়ে প্রচলিত মুদ্রার এক পৃষ্ঠে আরবিতে সুলতানের নাম, অন্য পৃষ্ঠে লম্ফনোদ্যত সিংহের ছবি অংকিত ছিলো। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জাদুঘরে রক্ষিত এ ধরণের মুদ্রা দেখতে পাই। এতে মনে করা যেতে পারে সুলতান জালাল ত্রিপুরার কিছু অংশও শাসন করে থাকবেন। সুলতান জালাল উদ্দিন সাত বছর রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে কাটান। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাজনৈতিকও সামরিক কায়দা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করেন। ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে জালাল উদ্দিন প্রভুত সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর সময় রাজনৈতিক কারণে আরাকানের রাজা মিন সুয়ামুন রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। তিনি সেই রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন করেন। সমরনীতি, কূটনীতি, শাসকোচিত বিচক্ষণতা, ধৈর্যও শৌর্যে তাঁর ছিলো অসাধারণ দখল।

সুলতান জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ, সুশাসক এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। যতোদূর জানা যায় তিনি দু'জন ক্রীতদাসের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন। তাঁকে পান্ডুয়াতে সমাহিত করা হয়। কবরের পাশে তাঁর স্ত্রী পুত্রের সমাধিও পাশাপাশি রয়েছে। জালাল উদ্দিন সুখ্যাতি ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ছোট খাটো কুখ্যাতিসহ সফলভাবে ১৭/১৮ বছর রাজ্যশাসন করেন। ভালো মন্দে মিলিয়ে মানুষ। তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। রাজা গণেশের পুত্র হয়েও তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি পিতাকর্তৃক বিতাড়িত মুসলমানদের নিজভুমে ফিরিয়ে আনেন। কথিত আছে যে, জালাল উদ্দিনের সময় পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে বেশী মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। আবার হিন্দুদের ওপরও তিনি অত্যাচার করেননি। এখানেই তাঁর মনুষ্যত্ব ও ঔদার্যের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। গৌড় পান্ডুয়ার বড় বড় অট্টালিকা সমূহ নির্মিত হয়েছিলো। জালাল উদ্দিন যখন রাজত্ব করছিলেন, তখন চীনের পর্যটক মাহুয়ান বাঙলায় এসে চীনের মনোভাব জানিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। এতে সুলতান ভয় পেয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে, তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা গেছে, তাতে করে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ সহজে ভয় পাওয়ার কিংবা পিছু হটার মতো মানুষ ছিলেন না।

www.pathagar.com

শামসুদ্দিন আবুল মুজাহিদ আহম্মদশাহ এবং অন্যান্য

(১৪৩২-১৪৩৫)

সুলতান জালাল উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহম্মদ শামসুদ্দিন আবুল মুজাহিদ আহম্মদ শাহ নাম ধারণ পূর্বক আমাত্য ও সৈন্যগণদের সম্মতিক্রমে সিংহাসনে বসেন। ঐতিহাসিক আবুল কাশেম ফিরিস্তা তাকে একজন দানশীল, ন্যায়পরায়ণ, সদাশয় নরপতি হিসেবে উল্লেখ করেন কিন্তু 'রিয়াজ-উস-সালেহীন' বলেছেন অন্যকথা 'তিনি একজন অত্যাচারী রাজা ছিলেন'। মজার ব্যাপার হলো সুলতান যখন মসনদে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৪ বছর। এ বয়সে একজন রাজাকে ন্যায়পরায়ণ বা অত্যাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করা বোধ হয় সঠিক হবে না।

আহম্মদ শাহ ৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময় গৌড়বঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় ধ্বস নামতে শুরু করে। বিহার, কামরূপ ও বাংলার অনেক জায়গা তাঁকে বিভিন্ন শাসকদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। তবে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে পূর্বের ন্যায় কামরূপের শাসক ভূঁইয়াগণ তাঁদের শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ইলিয়াস বা মাহমুদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠালাভ করে। ফলে ময়মনসিংহ জেলায় মাহমুদ শাহী বংশের নরপতিদের পূনঃশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অবশ্য সমুদয় ময়মনসিংহ এলাকা তাঁরা শাসন করতে পেরেছিলেন কিনা সেধরণের তথ্য পাওয়া মুশকিল। ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট চারজন নরপতি এ জেলা শাসন করেছিলেন। তাঁরা হলেনঃ- নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৭-১৪৫৯), রোকনউদ্দিন বারবকশাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), শামসুদ্দিন ইউসুফশাহ (১৪৭৪-১৪৮১) এবং জালাল উদ্দিন ফতেহশাহ (১৪৮১-১৪৮৬), খ্রিস্টাব্দ। এঁদের মধ্যে ইতিহাসে রোকনউদ্দিন বারবকশাহর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলমানগণ সামরিক অভিযানে সফলতা লাভ করেছিলেন। সুলতান সামসুদ্দিনের পর তিনিই দ্বিতীয় সুলতান যিনি সফলভাবে কামরূপ জয়করতে পেরেছিলেন।

রাজা গণেশ কর্তৃক উৎখাতকৃত ইলিয়াসশাহী বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ। মাহমুদ শাহের রাজত্বকালের এ পর্যন্ত আঠারোটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ লিপিগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত। বিহার এবং ভাগলপুর লিপি থেকে জানা যায় সিলেট, চট্টগ্রাম, বীরভূম এবং উত্তর দিনাজপুর, রংপুর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা ছিলো। মিথিলা এবং উড়িষ্যা রাজ্যের সাথে মাহমুদশাহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেসময় খুলনা বাগেরহাট তার করতলগত হয়ে ছিলো। বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, খান জাহান আলী মাহমুদ শাহের সময় ময়মনসিংহ অঞ্চল জয় করা হয়। তিনি মসজিদ নির্মাণ ও একটি বিরাট দীঘি খনন করেন। খান জাহান আলী কর্তৃক বিনির্মিত ষাটগম্বুজ (প্রকৃতপক্ষে সাতাত্তরটি) মসজিদটি স্থাপত্যশিল্পের অনন্য অবদান হিসেবে আজও সুবিবেচিত । হযরত খান জাহান আলী মাহমুদ শাহের সমাধি এখনও বর্তমান।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলা হয়েছে হাবশীদের মধ্যে ৪ জন সুলতান রাজত্ব করেন। এ চার জনের মাধ্যে কোন সুলতানই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেননি। হাবশী আমলকে মোটামুটিভাবে অরাজকতায় পরিপূর্ণ শাসন বলা যেতে পারে। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হোসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন হাবশী শাসকদের বিতাড়নের মাধ্যমে।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩ -১৫১৯)

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাঁর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা, শ্রম, দূরদৃষ্টি নিয়ে নতুন ইতিহাস বিনির্মাণ করেছেন। প্রজ্ঞা ও স্বাতন্ত্র্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন সমাদৃত। প্রাপ্ত মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায় হোসেন শাহ বাংলায় আসেন তাঁর পিতার সংগে মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁদপাড়া গ্রামে। বুকানন হ্যামিল্টনের মতে তিনি জন্মগ্রহন করেন রংপুর জেলার দেবনগর গ্রামে। সে যাহোক তাঁর পুত্র নসরত শাহ তাঁর আত্মজীবনী "নসরৎ শাহ বাঙ্গালী" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হোসেন শাহ তাঁর নিজ গুনে সুলতান মুজাফফর শাহের দরবারে "উজির" ছিলেন। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ হোসেন মুজাফফর শাহকে হত্যা করেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এর ফলে বাংলা থেকে এক অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে। বাংলায় এ রাজবংশের নাম "হোসেন শাহ" বংশ। এ বংশের শাসন কাল অব্যাহত ছিলো প্রায় পঞ্চাশ বছর। বংগের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহকেই সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে থাকেন পন্ডিতজনেরা। তবে যতোদূর জানা যায় জনাব আলাউদ্দিন হোসেন শাহর প্রথম জীবন খুবই রহস্যাবৃত। তবে শাসক হিসেবে দৃঢ়তা, শাসনকার্য পরিচালনায় বিচক্ষণতা, কূটনীতিক সুলভ বুদ্ধির জন্যে সব কিছুতেই নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন তিনি।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে বসেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হাবশিদের বিতাড়ন করে মোঘল ও আফগানদের উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। এখানেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কাজ করেছে। শাসন কার্যপরিচালনায় সুবিধার জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজ আনুগত্যের ও বিশ্বাস ভাজন লোকদের তিনি বিশেষ বিশেষ আমলা পদে অধিষ্ঠিত করেন। আবুল কাসেম ফিরিসতার মতেঃ বাংলাদেশে তখন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উৎসবে সোনার থালা ব্যবহার করতেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যখন বাংলার সিংহাসনে তখন সমগ্র উত্তর ভারতে চরম নৈরাজ্য চলছিলো। তিনি সকল নৈরাজ্য কঠোরহস্তে দমনে ব্যর্থ হন ফলে উত্তর ভারতের বেশিরভাগ শাসকই স্বাধীন হয়ে যায়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলাকে তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং রাজনৈতিক ঐক্য সম্পন্ন করে সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার সীমা বহুদূর পর্যন্ত বর্ধিত করেন। প্রকৃত পক্ষে হোসেন শাহ বাংলার

www.pathagar.com

প্রায় সমগ্র এলাকাসহ বিহারের বিরাট অংশ এবং কামরূপ, কামতা, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে শাসনকার্য পরিচালনা তাঁর জন্যে অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাঁর রাজ্যের পরিসরও বৃদ্ধি পায়।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে বাংলার "আকবর" বলা হয়ে থাকে। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শাসক। যদিও তিনি বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন সমর অভিযানে। প্রজাবাৎসল্যের জন্য প্রজাস্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন তিনি। অনেক সময় হোসেন শাহ নিজেই যুদ্ধ উপলক্ষে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করতেন। ইলিয়াসশাহী বংশ যে উদারতার সূচনা করেছিলো, হোসেন শাহ সে ধারাটি শুধু অব্যাহতই রাখেননি, তিনি আরো বেশী যত্নবান হয়েছিলেন যাতে বাঙ্গালী জাতীয়তার ভাগীদার হতে পারেন এবং বাস্তবে হয়েছিলেনও তাই। তাঁর রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন নতুন ধর্মীয় মতবাদ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার জন্য। তিনি হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্য দেবকে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াননি। (তবে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদর এ বিষয়টি স্বীকার করেন না)। ডঃ রমেশ চন্দ্র যাই বলুন না কেন একথা সত্য যে হোসেন শাহ এর সময় এবং তাঁর অনুপ্রেরনায় শ্রী রূপগোস্বামী "বিদগ্ধমাধব" ও 'ললিতমাধব' নামক দু'টি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু "শ্রীমদ্ভগবত" বাংলায় অনুবাদ করেন। এজন্য তিনি তাঁকে 'গুনরাজ খাঁ' উপাধি দেন। বিভিন্ন ধর্মমত প্রচারের সুযোগ করে দিয়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেজন্যে তাঁর প্রশংসা করতেই হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন যাতে নিজস্ব পথ খুঁজে পায়, আলা উদ্দিন হোসেন শাহ সে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে অনন্য ভুমিকা রেখেছিলেন। হোসেন শাহের সময়টি ছিলো আরবি-ফার্সির যুগ। সে যুগে তিনি বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে 'চৈতন্যভাগবত', চৈতন্যচরিতামৃত', 'মনসামঙ্গল' তাঁর সময়েই রচিত হয়। হোসেন শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন কবি যশোরাজ খাঁ, দামোদর, কবি রঞ্জন। তিনি কবি পন্ডিতদেরকেও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মসজিদ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি তৈরি করেছিলেন। আগেই আলোচিত হয়েছে হোসেন শাহ বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি স্থাপত্য শিল্পের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর কীর্তি গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদ, দরমারির মসজিদ, ছোট সোনামসজিদগুলো আজো তাঁর স্মৃতি লালন করছে। হিন্দু পন্ডিতগণ তাঁকে "নৃপতিতিলক" "জগৎভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। প্রখ্যাত আবুল ফজলের মতো ঐতিহাসবেত্তা সেসময় থাকলে হয়তোবা আমরা অনেক তথ্য জানতে পারতাম। সমরনীতি ও কূটনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো একটি নান্দনিক উৎকর্ষতা হোসেন শাহ লালন করতেন। যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিদের সম্মান দিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাহলে আমরা বলতে

www.pathagar.com

পারি যে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী উত্তর বঙ্গ জয় করে নেয়ার পর, সেনরা পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর বিক্রমপুরে চলে আসেন ও ১২৪২ পর্যন্ত সোনারগাঁয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি রাজ বংশের কারণে সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়েও কষ্ট ভোগ করেন। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পরবর্তী বংশধারেরা সোনারগাঁ জয় করে বঙ্গের রাজধানী লক্ষণাবতী করলেও দ্বিতীয় রাজধানী করেন সোনারগাঁও । ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হয় বাংলার স্বর্ণযুগ । এ সময়ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁ থেকে কবি হাফিজকে বাঙ্গলা সফরের আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন। মুসলিম শাসকগণ সোনারগাঁও এ দু'শ বছর শাসন কাল এবং স্বাধীনতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মোঘলদের কাছে বাংলার নৃপতিদের নতিস্বীকার করতেই হলো। সোনারগাঁ হলো পরিত্যক্ত। ঢাকা হলো মোঘল সুবার নতুন রাজধানি।

বাংলা সাহিত্য ঃ প্রকৃতপক্ষে হোসেনশাহী আমলকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কারণ বাংলার মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এ সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ, বৌদ্ধসিদ্ধা। এটির রচনাকাল দ্বাদশ শতক বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। এরপর দু'শ বছর পেরিয়ে গেলে চন্ডীদাশ "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" রচনা করেন। এ কাব্যটি মুসলিম আমলের রচনা। হিন্দুদের পর বৌদ্ধ আমলে সাহিত্য ছিলো ধর্মকেন্দ্রিক। সেসময় দরবারের ভাষাও ছিলো সংস্কৃত। পরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আরবী-ফার্সি সাহিত্যের প্রভাব পড়ে। এর পরও মুসলিম শাসনের আমলে বাংলা সাহিত্য বিকাশের পথ সুগম হয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রের শাসক সুলতানগণই হিন্দু কবিদের কাব্যরচনায় উৎসাহিত করতেন তাই নয়, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও হিন্দুদের সহযোগিতা করতেন। সুলতানী আমলে যে সকল কবির কাব্য পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস, পিপলাই, দ্বিজগুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় এবং দ্বিজশ্রীধর। একজন মুসলমান কবির কাব্যও পাওয়া গেছে, তিনি হলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর। বাংলার মুসলিম সুলতানগণ যুগে যুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। অবশ্য হিন্দু কবিগণও সুলতানদের প্রশস্তি গেয়েছেন। যাহোক সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অধীনস্থ অনেক হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কবি ছিলেন। এঁরা হলেন সনাতন, কেশবছত্রী, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন। যশোরাজ খান হোসেন শাহকে "জগৎ ভূষণ" বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে "নৃপতি তিলক" বলে প্রশস্তি করেন। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এয়োদশ শতকে বাংলার সুলতানেরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সার্বিকভাবে সহায়তা দান করেন।

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদশাহ

(১৫০২-১৫৩৮, ১৫১৫-১৫৪০)

নসরত শাহ এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর পিতা জীবীত থাকাবস্থায়ই স্বনামে মুদ্রাজারী করেছিলেন। সেগুলো ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫ ও ৯৩৮ হিজরীতে উৎকীর্ণ। এদিকে ফিরোজ শাহের চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের নামেও মুদ্রাজারীর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ তাঁদের শাসন-ক্ষমতার বাইরে ছিলো। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকা মুসলিম শাসনে এসেছিলো প্রথম। যাইহোক আমরা বলতে পারি ফিরোজ শাহ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ্ শাহ এ জেলা শাসন করেছিলেন, কেননা ইতিহাসে দেখা যায় গৌড় সুলতান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বকর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লিসম্রাট শেরশাহ এ জেলার সমুদয় অংশ দখল করে নেন।

সুলতান মাহমুদ শাহ ইতিহাসে একটি নাম, একটি কিংবদন্তীত বটেই। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে ঘটেছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাহমুদ শাহ্ শের খানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যই বোধহয় পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থী হয়ে থাকবেন। সেই সুবাদে এ সময় পর্তুগীজরা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। জে.জে.এ. কেম্পেসের "হিস্টরি-অব-দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল" বিবরণ থেকে জানা যায় ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ গবর্ণর নুনো-দা-কুনহা খাজা শিহবউদ্দিনকে সাহায্য করার জন্য এবং বাংলায় বাণিজ্য শুরুর উদ্দেশে, ৫টি জাহাজে ২০০ লোকসহ মারতিম আফন্সো-দে-মলোকে বাংলাদেশে পাঠান। চট্টগ্রাম থেকে দে-মলো তাঁর দূত দুয়াতে-দে-আজভেদোকে ১২ জন লোক সঙ্গে দিয়ে ঘোড়া, অলঙ্কারসহ ১২০০ পাউন্ড মূল্যের উপহার সামগ্রী গৌড় রাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। মাহমুদ শাহ সেসময়ই ভ্রাতুস্পুত্রকে হত্যা করে সুলতান হয়েছেন মাত্র। এমনিতেই তার মন খারাপ ছিলো, তাছারা তিনি পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে পর্তুগীজরা একটি মুসলিম জাহাজ লুট করেছে। এদিকে সেই উপহার সামগ্রীর মধ্যে লুট করা কয়েক বাক্স গোলাপজলও ছিলো। মাহমুদ লুটের মালগুলো দেখে চিনতে পারলেন এবং রেগে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, বাংলায় আগত সকল পর্তুগীজদের হত্যা করবেন। একজন মুসলমান বর্ষিয়ান সাধক আলফা খান সুলতানকে একাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানালে তিনি আর সে পথে যাননি। এরপরও শেষ রক্ষা হয়নি, পর্তুগীজদের সাথে যুদ্ধ তাঁকে করতেই হয় শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধে পর্তুগীজরা পরাজিত হয় ও বন্দী হয় ৩০ জনের মতো। এই ৩০ জনকে অমানুষিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। এ খবর পর্তুগীজদের কানে পৌঁছালো যথাসময়েই। নুনো-দা-কুনহা ৩৫০ জন লোকসহ ৯ টি জাহাজ দিয়ে আন্তোনিও-দে-সিলভা-মেনেজেসকে, শাহকে শায়েস্তা করার জন্য চট্টলা বন্দরে পাঠালেন এবং বলে দিলেন অবশ্যই ৩০ জন বন্দীকে মুক্ত

www.pathagar.com

করতে হবে। ওরা চট্টগ্রাম এসে দূত হিসেবে জর্জ-অলকোকোরাদোরকে মাহমুদ শাহের কাছে পাঠালেন। মাহমুদ শাহ দূতকে কৌশলে বন্দী করতে নির্দেশ দিলে দূত পালিয়ে চট্টগ্রামে চলে যান, এবং চট্টগ্রাম এলাকার বৃহৎ অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে বহু মানুষ হত্যা করেন। এ হত্যা যজ্ঞ চলাকালীন সময় শেরখান বাংলা আক্রমণ করে বসলেন। ফলে মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের খাতির যত্নে গেলেন। পর্তুগীজরা ভাগীরথী নদী দিয়ে গৌড় পৌঁছে গেলে জনাব শাহ তাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানালেন বিনিময়ে তিনি তাদের কুঠি তৈরির জমি ও দূর্গ তৈরির অনুমতি দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। সবকিছু হবার পর যেটি হলোনা, সেটি হলো, শেরখানের সাথে তাঁরা যৌথভাবে যুদ্ধ করেও জয়ী হতে পারলেন না। শেরখান ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ১,৫০০ হাতী, ২,০০০,০০ সৈন্য ও ৩০০ নৌকো নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করলেন। মাহমুদশাহ ১৩,০০০,০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শেরখানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

সুলতান মাহমুদ শাহের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বাংলায় পর্তুগীজরা জমি বাড়ি জমিদারি পেলো। তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়সহ নানা রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে লাগলো। এদিকে জনগণ শুধু তাকিয়ে দেখলেন তাদের সুলতান কতো নির্বোধ। সুলতান মাহমুদ শাহের নির্বুদ্ধিতার কারণে বাংলার পরিণাম শুভ হয়নি।

এ কথা সত্য যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন এক বিস্তীর্ণ রাজ্যনিয়ে। বিহার, মুঙ্গের, হাজীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ এক বিশাল এলাকা। কিন্তু তিনি এর বিশালত্বকে রক্ষা করতে পারেননি। তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য শাসক, নির্বোধ দূর্বল চিত্তের অধিকারি। যেসমস্ত এলাকা হতে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে সেগুলো হলো, গৌড়ের সাদুল্লাপুর, ময়মনসিংহের জোয়ার (জাওয়ার কিশোরগঞ্জ), মালাদহের শাহপুর, পূর্ণিয়া ও চট্টগ্রামের কুমিরা। মাহমুদ শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবত কবি শাহ মোহাম্মদ সগির তাঁর অধীনে চাকুরি করতেন, সম্ভবত সে সময়েই তিনি ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করে থাকবেন। পর্তুগীজ বিবরণে জানাযায় তাঁর নাকি দশ হাজার উপপত্নী ছিলো। এটা আমাদের বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তিনি যে সাহিত্যের একনিষ্ঠ বোদ্ধা ছিলেন তা হলো ভনিতায় বিদ্যাপতির বর্ণনা।

"বেকতেও চোরী গুপত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরে জীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান"।

www.pathagar.com

আবুল মুজফফর নসরত শাহ

(১৫১৯-১৫৩১-৩২)

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরত শাহ সুলতান নাসির-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন। কোন কোন পন্ডিত মনে করেন নসরত শাহের সংগে পুত্রগনের সর্ম্পক ভালো ছিলো না। সে কারণে নসরত শাহ দক্ষিণ বাংলা শাসন ও সেখানে অবস্থান করেন। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে নসরত শাহ ছিলেন সবার বড়। সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন নসরত শাহ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধীকারসূত্রে পিতার সিংহাসনে বসেন। আরো জানা যায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জীবিতকালেই তাঁর পুত্রের নামে মুদ্রা জারীর হুকুম দিয়েছিলেন। এতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে পিতা পুত্রের মধ্যে কোন বিরোধ ছিলো না।

নসরত শাহ যে সময় মসনদে, ঠিক সেসময় ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। থেমে যায় নসরত শাহের অভিযান পশ্চিম সীমান্ত এলাকায়। নসরত শাহের সংগে মোগল সম্রাট বাবরের সংঘর্ষ ঘটে। সেসময় লোদী বংশের মধ্যে গোত্রিয় বিরোধ দেখাদিলে নসরত শাহ এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি লোদীদের সাম্রাজ্য উত্তর পশ্চিমের আজমগঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। আজমগঢ় থেকে উৎকীর্ণ নসরত শাহের একটি শিলালিপিতে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখিত রয়েছে। লোহানী ও ফর্মুলীদের সংগে বাবরের যুদ্ধবিগ্রহের কারণে অনেক লোহনী ও ফর্মুলীগণ বাংলার শাসক নসরত শাহের আশ্রয়ে চলে আসেন। অনেকে মনে করেন নসরত শাহ এঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই বাবরের সাথে যুদ্ধ বাঁধে। পরিনামে নসরত শাহ মোগলদের সাথে শান্তি ও সমঝোতায় পৌঁছান এবং নীতিগ্রহনে দীর্ঘসূত্রিতার পথ ধরেণ। শেষ পর্যন্ত সম্রাট বাবরের সঙ্গে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ করতেই হলো। যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো গঙ্গা ও সরু নদীর সংগমস্থলে, আরো একটি নদী অর্থ্যৎ গঙ্গা ও ঘোগরা নদীর সঙ্গমস্থলে। মোগল ও বাংলা বাহিনীর যুদ্ধের ফলাফল হলো, নসরত শাহ পরাজয় বরন করলেন। এ যুদ্ধের পর নসরত শাহকে আর কোনদিন বাবরের সাথে যুদ্ধ করতে হয়নি।

নসরত শাহ পিতার ন্যায় একজন যোগ্যশাসক ছিলেন। তিনি উত্তরাধীকারসূত্রে যে রাজ্যগুলো পেয়েছিলেন শুধুমাত্র সেগুলো নিয়েই বসে থাকেননি। রাজ্যসীমা বর্ধিত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নসরাবাদ, ফতেহাবাদ, (ফরিদপুর) হোসেনাবাদ, খলীফাতাবাদ, মোহাম্মদাবাদ, মাহমুদাবাদ, ও বারবাকবাদ টাকশাল থেকে মুদ্রাজারী করেন। গৌড়, সোনারগাঁও, মঙ্গল কোর্ট বর্দ্ধমান, মৌলনাতলী (মালদহ), বাঘা (রাজসাহী), আশরাফপুর (ঢাকা) সিকান্দরপুর (উত্তর প্রদেশ),

www.pathagar.com

দেওতলা (মালদহ), মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম (পাবনা) সাতগাঁও (হুগলী), বেগুসরাই (ত্রিহুত) ইত্যাদি জায়গা থেকে নসরত শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এসমস্ত তথ্য দ্বারা বুঝা যায় বা সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে নসরত শাহের রাজ্যের আয়তন।

নসরত শাহ একজন সফল ও যোগ্য শাসক ছিলেন। নসরত শাহের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য অধ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন, এর সব কটিই পরস্পর বিরোধী। তবে সকলেই একমত পোষণ করেন যে তিনি আততায়ীকর্তৃক নিহত হন। নসরত শাহ ১৩ বছর রাজত্ব করে ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে মারাযান।

বাঙলায় শের শাহ্ এবং অন্যান্য

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান শের শাহের কাছে পরাজিত হলে ময়মনসিংহ জেলার কর্তৃত্ব গিয়ে বর্তায় শের শাহের হাতে। স্বাভাবিক ভাবেই জেলার প্রায় সমুদয় অংশ দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শেরশাহ ছিলেন দিল্লির পাঠান সম্রাট। তিনি মাত্র পাঁচ বছর রাজ্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। এ সময়ের মধ্যেই রাজ্য পরিচালনায় তিনি বেশ দক্ষতা, মেধা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে শাসক হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল ও প্রশাসনিক বিন্যাসের প্রয়োজনে তিনি তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকার গঠন করেন। শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনেই তিনি পরগণা প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁরা তাঁর প্রতি সীমাহীন আনুগত্য প্রদর্শণ করতেন, তোষামোদ করতেন, করুণ অনুগ্রহ ও বদান্যতা প্রত্যাশা করতেন। তাঁরাই সরকারে নিজের জায়গা করে নিতে পারতেন। পরগণায় যাঁরা জায়গীরদার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তাঁরাও শেরশাহের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং আস্থাভাজন হয়েই তাঁদের দায়িত্বপালন করতে বাধ্যহতেন। তবে একথা সত্য যে, শেরশাহের শাসন আমলে ময়মনসিংহের জনগণ শান্তি, স্বস্তিও সমৃদ্ধির পথ ধরে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। জেলাবাসী শেরশাহের শাসনকে প্রজাসাধারণ তথা জেলাবাসীর অনুকূলে বলেই বিবেচনা করতেন। শেরশাহকে মনে করতেন জনস্বার্থের অনুকূলে একজন শাসক। কিন্তু, শেরশাহের মৃত্যুর পর শাসন ব্যবস্থায় ধ্বস নামে। এক পর্যায়ে ভেঙ্গে পড়ে এই শাসন ব্যবস্থা। উল্লেখিত জায়গীরদারগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। স্বাধীনতা ঘোষণা করে জায়গীরদারগণ নিজ নিজ এলাকার শাসন কাজ চালিয়ে যান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সব

www.pathagar.com

জায়গীরদারগণই মোগল সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার বিখ্যাত বারভূঁঞা হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন।

ইসলাম শাহ ছিলেন সম্রাট শেরশাহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্বাংশ সোলায়মান খান দখলকরে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠা করেন। সোলায়মান খান ছিলেন একজন পাঠান জায়গীরদার। তিনি ছিলেন একজন রাজপুত্র। কালিদাস গজদানিই হচ্ছেন সোলায়মান খান। অর্থাৎ সোলায়মান খানের পূর্বের নাম ছিল কালীদাস গজদানি। কালিদাস গজদানি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান খান নাম ধারণ করেন। উল্লেখ্য, সোলায়মান খান এক পর্যায়ে হুসেনশাহী বংশের সুলতানগণের আমলে রাজস্ববিভাগে সামান্য বেতনে নিম্ন পদে চাকরি নেন। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের সমূহ উন্নতি সাধন করেন। এজন্যে তাঁর শ্রম, মেধা,ও প্রচেষ্টার ঘাটতি ছিলো না।উচ্চাকাঙ্খার স্বপ্ন আর বুকভরা আশা নিয়ে জীবন চলার পথে তিনি অগ্রসর হন এবং এক একটি সাফল্যের সিঁড়ি টপকে উপরে উঠতে থাকেন। এভাবেই তাঁর আকাঙ্খার রূপায়ন হয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি সক্ষম হন। ধৈর্য, অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, শ্রম, মেধা যে মানুষের জন্যে কিভাবে সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে, সোলায়মান খান ছিলেন তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ। হুসেনশাহী বংশীয় সুলতানগণের আমলেই তিনি স্বীয় দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার বলে অর্থমন্ত্রীর পদে আসীন হন। তিনি হুসেনশাহী বংশের শেষ নরপতি গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে জানা যায়। হুসেনশাহী বংশের পতনের পর সোলায়মান খান ময়মনসিংহ জেলায় এসে এই জেলার কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন এবং স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট ইসলামশাহ বিদ্রোহী জায়গীরদারকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্যে তিনি একটি দক্ষ ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব হস্তান্তর করেন তাজখান এবং দরিয়া খানের হাতে। তাঁরা যুদ্ধে সোলায়মান খানকে পরাজিত করেন এবং সোলায়মানও বশ্যতাস্বীকারে বাধ্যহন। কিন্তু, দমে যাওয়ার পাত্র নন সোলায়মান খান। উচ্চাবিলাসী সোলায়মান খান কিছু দিন নীরব থাকার পর আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু, নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি সোলায়মান খান। তাজখান এবং দরিয়াখান সোলায়মান খানকে রুখে দাঁড়ান এবং তাঁর বিরুদ্ধে কৌশলে অগ্রসর হয়ে তাঁকে আটক করে হত্যা করেন। এখানেই শেষ নয়। তাজখান এবং দরিয়া খান সোলায়মান খানের দু'পুত্র ঈশা এবং ইসমাইলখাকে তুরানী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে দেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ঈশা খাঁ হচ্ছেন পরবর্তী কালের বাংলার বারভূঁঞাদের শ্রেষ্ঠ ঈশা খাঁ মসনদে আলা। ঈশা খাঁর বীরত্ব পূর্ণ কাহিনী অবিভক্ত ময়মনসিংহের জন্যে স্মরণীয় এক অধ্যায়। কেবলমাত্র ঈশা খাঁ নন, তাঁর পুত্র মুসা খাঁর নামও ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

বলা প্রয়োজন যে, দিল্লির সূর সম্রাট ইসলাম শাহেসূরের মৃত্যুর পর গৌড়ের সূর বংশীয় নরপতি মোহাম্মদ খান সূর ময়মনসিংহ জেলার উপর তাঁর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে এ জেলার উত্তরাংশের শাসন ক্ষমতা ছিলো অন্য শাসকের হাতে। উল্লেখিত উত্তরাংশ কামরূপ বা কামতার রাজা বিশ্বসিংহের যোগ্য উত্তরাধিকারী রাজা মল্লদেব ওরফে রাজা নবনারায়ণের (আনুমানিক ১৫৪০-১৫৮৬ খ্রিঃ) শাসনাধীন ছিলো বলে আমরা ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলতে পারি। জানা যায় যে, ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ জেলার শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ছিলো। তবে, কররানী বংশীয় সুলতান সোলায়মান কররানীর রাজত্বকালে কামতার রাজা নবনারায়ণ কামরূপ রাজ্যের সীমা বাড়ানোর কাজে উদ্যোগী হন এবং সামরিক আভিযান পরিচালনা করেন। এর ফলে গৌড় অধিপতির ক্ষমতা ও প্রভাব কামরূপসহ ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিলো বলে মনে করা যায়।

মুসলমান সেনাবাহিনী নব নারায়ণের গুক্লদ্বজ ওরফে চিলারায়কে যুদ্ধে পরাজিত করে। স্বাভাবিকভাবেই চিলারায় বন্দী হন। চিলারায়ের অজেয় বলে সুনাম ছিলো। মুসলমান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সেনাপতি কালাপাহাড়। কালাপাহাড় ইতিহাসের এক বিখ্যাত নাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমানগণ কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে কামরূপ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো। তবে, একথাটি স্বীকার নাকরে উপায় নেই যে, সোলায়মান কররানী অত্র অঞ্চলে স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে জোরালো কোনো যুক্তি কিংবা তথ্য- প্রমাণ নেই। অবশ্য সোলায়মান কররানীর উত্তরাধিকারী দাউদ কররানী সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন কথা বলতে হয়। দাউদ কররানী ১৫৭২ সাল থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে গৌড়াধিপতির ক্ষমতা প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে ছিলো। এটি অবশ্য সত্য যে, ময়মনসিংহ অঞ্চলে সোলায়মান কররানী স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর বা তাঁর উত্তরাধিকারী দাউদ কররানীর রাজত্বকালে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্বাংশে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ বারভূঞা ঈশা খাঁ।

দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ ঈসা খাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এর ফলেই তিনি ভাটি অঞ্চলের (ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে) জমিদারি প্রাপ্তহন। এক্ষেত্রে কররানী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরপতি তাজখান কররানীর বিশেষ অনুগ্রহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলো। ঈশা খাঁ নিজের জীবনকে নিজে গড়ার শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর তাই তাঁর জমিদারি জীবন কররানী সুলতানগণের অধীনস্থ হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে, স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও দক্ষতার মাধ্যমে ঈশা খাঁ সোনারগাঁও অঞ্চলের একজন ডাকসাইটে জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। এখানেই থেমে থাকেননি ঈশা খাঁ। কিছু দিন যেতে না যেতেই তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত জঙ্গলবাড়ী দুর্গটিও তিনি দখল করে নেন। এ দুর্গটি তিনি দখল করেছিলেন জনৈক সামন্ত নরপতির নিকট থেকে। তারপর থেকে শুরু হয় তাঁর এগিয়ে চলা।

www.pathagar.com

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি পশ্চিম সিলেট, গোটা ত্রিপুরা, পূর্ব ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার অধিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। নিজের শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিলো। একথাটি উল্লেখ করতেই হয় যে, কররানী বংশীয় সুলতানগণের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিলো প্রশ্নাতীত। এ বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর ছিলো অভাবনীয় ভূমিকা, ফলশ্রুতি হিসাবে উল্লেখিত বংশের সুলতানগণের কাছ থেকে তিনি যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। দাউদ কররানী তাঁকে মসনদে আলা উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের হাতে দাউদ কররানী পরাজয় বরণ করেন। কেবলমাত্র পরাজিতই হননি তিনি, মৃত্যুও বরণ করেন। এর ফলেই বাংলায় দিল্লির সম্রাট আকবরের শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে। কিন্তু, ময়মনসিংহ জেলায় মোগলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। এ জেলায় মোগলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। বলাবাহুল্য, এ কৃতিত্বের দাবীদার সেই সময়ের মোগল সুবাদার ইসলাম খান। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, উল্লেখিত সময়ে ময়মনসিংহ জেলার অধিপতি ছিলেন ঈশা খাঁ মসনদে আলা। পরবর্তীতে, সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খানে'র আবির্ভাব ঘটে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে ঈশা খাঁ মসনদে আলা শাসিত এ অঞ্চল এবং এ জেলার উপর প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে রালফ্‌ফিচ নামে এক বিখ্যাত পরিব্রাজক তাৎপর্যপূর্ণ এক উক্তি করেন। তাঁর এ উক্তিটি যে কোনো বিবেচনায়ই প্রণিধানযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত। তিনি ঈশা খাঁ মসনদে আলাকে বাংলার প্রধান নরপতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং, সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যেসব নরপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সেসব নরপতিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ঈশা খাঁকে বাগে আনার জন্যে সম্রাট আকবর চেষ্টা-তদ্বির কম করেননি। মোগল সম্রাট হয়েও এজন্যে তাঁকে আজীবন সংগ্রাম পর্যন্ত করতে হয়েছিলো ঈশা খাঁর সংগে। সম্রাট আকবরের পক্ষে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে-বাংলার সুবাদার খান জাহান হুসেন কুলীবেগ, শাহবাজখান, ওয়াজির খান এবং রাজা মানসিংহ। উল্লেখিত সুবাদারগণ তাঁদের শাসন আমলে বারবার ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ঈশা খাঁ সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করলেও তাঁকে সম্পূর্নভাবে মোগলদের অধীনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ঈশা খাঁ আমৃত্যু মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

সে সময়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখিত সুবাদারগণের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁকে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিলো এবং শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিলো কিশোরগঞ্জ মহকুমার এগার সিন্ধুর

www.pathagar.com

দুর্গে। অনুমান করা হয় যে, এ যুদ্ধের পর রাজা মানসিংহ তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, ঈশা খাঁ অত্র অঞ্চল বা ময়মনসিংহ জেলার উপর কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন, এটি মনে করার কোন সুযোগ নেই। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ মারা যান। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসাখান মসনদে আলা ঈশা খাঁর উত্তরাধিকারী হন এবং শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাংলার বার ভূঞাদের অনেকে মোগলগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি বরং নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুসা খান ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী। মুসা খান ছিলেন দুর্দমনীয়। কোনো কিছুতে ভরকে যাওয়া কিংবা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা তাঁর স্বভাবে ছিলো না। আমরা জানি যে, মুসা খানের সময় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর শাসন কর্তৃত্ব বজায় ছিলো। তবে এ জেলার উত্তরাংশ সুসং এলাকা সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন কথা বলতে হয়। সুসং এলাকায় কামতার রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের খুড়াত ভাই চিলারায়ের পুত্র রাজা রঘুদে তাঁর শাসন কর্তৃত্ব সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক তথ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়। পাশাপাশি, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ে ঈশা খাঁর পরম স্নেহভাজন খাজা ওসমান বোকাইনগরকে কেন্দ্র করে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলেও জানা যায়।

খাজা ওসমান উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে এক পর্যায়ে বিতারিত হন। তারপর ঘাঁটি স্থাপন করেন বোকাইনগরে। এক্ষেত্রে ঈশা খাঁর আনুকূল্য তাঁর পাথেয় হয়েছে। বোকাইনগর বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় অবস্থিত। খাজা ওসমানের বীরত্বগাঁথা ছিলো বলতে গেলে কিংবদন্তীর মতো। তিনি যেমন ছিলেন স্বাধীনচেতা, তেমনি ছিলেন দুঃসাহসী।

ইতিহাসের তথ্য-উপাত্তের আলোকে আমরা জানি যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ময়মনসিংহ জেলাকে মোগলদের সম্পূর্ণ অধীনে আনার জন্যে প্রচেষ্টা কম ছিলো না। সুবাদার ইসলাম খান ময়মনসিংহ জেলাকে মোগলদের অধীনে পুরোপুরি ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সামরিক অভিযান প্রেরণের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে, মুসা খান এবং খাজা ওসমানের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। সামরিক অভিযান শুরু হয় ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সোনারগাঁও মোগলদের দখলে যায়। সোনারগাঁও ছিলো মুসা খানের প্রধান কর্মস্থল। এটি মোগলদের দখলে চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মুসা খানের ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যায়। ক্ষমতার এই উত্থান-পতনের ব্যাপারটিকে মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, মোগল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন মুসাখান। পরবর্তীতে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম খানের কাছে মুসাখান বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কারণ, ইসলাম খানকে প্রতিরোধ করার শক্তি মুসা খানের ছিলো না। এই বশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা মোগলদের দখলে ও অধিকারে চলে যায়। পরবর্তীতে, ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুবাদার ইসলাম খান শেখ কামাল ও শেখ আবদুল অহীদ নামে তাঁর দু'জন পদস্থ সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং তা প্রেরণ করেন। এ সেনাবাহিনী ঢাকা থেকে স্থলপথে পদব্রজে ময়মনসিংহ জেলার হাসানপুর অথবা হুসেনপুরে এসে পৌছে যায় এবং সেখানে অবস্থান করে। এজন্যে তাঁদের ৩ দিন সময় লেগেছিলো। হুসেনপুর হোসাইনগর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিলো। হুসেনপুর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপাড়ে অবস্থিত। অন্যদিকে, কদমরসুল এবং এগারসিন্ধু হয়ে কিছুদিন পর সেনাবাহিনী নিয়ে ইতমিমাম খান এবং মীর্জা নাথান তথায় এসে উপনীত হন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এগারসিন্ধুর ঈশা খাঁর আমল থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর অবস্থান হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপাড়ে এবং অপরপারে টোকের (ঢাকা জেলার) অবস্থান। হুসেনপুর থেকে এর দূরত্ব দশ মাইলের বেশি নয়। মোগলরা হুসেনপুর থেকে বোকাইনগরের দিকে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কিন্তু, তাঁদের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। সুবাদার ইসলাম খান খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে স্থলপথে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর পিছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছিলো-চলাচলের কিংবা যানবাহন উপযোগী ভালো রাস্তা না থাকা। তাছাড়া খাজা ওসমানও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ কারণে মোগল সেনাবাহিনীকে বোকাই নগরের দিকে অগ্রসর হতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিলো। তাঁরা নিজস্ব গতি নিয়ে অগ্রসর হতে পারেননি, তাদের গতি হয়ে পড়েছিলো মন্থর। বাস্তব অবস্থার কারণে শেখ কামাল এবং আবদুল অহীদকে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতকর্তা অবলম্বন করতে হয়েছিলো। পথের মধ্যে এখানে সেখানে কিছুদূর পরপর সৈনিকদের জন্যে ঘাঁটি বা আস্তানা তৈরি করতে হয়েছিলো। হুসেনপুরের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো। কারণ, তা না হলে সৈন্যগণ সামনে অগ্রসর হতে পারবে না।

এদিকে, আলাপসিংহ এবং হুসেনপুরের মাঝপথে শাহবন্দরে গিয়াসখানের নেতৃত্বে নৌসেনাদলকে যে কোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়েছিলো। এমনিতর পরিস্থিতিতে সুবাদার ইসলাম খান পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত টোকে এসে হাজির হন। বদলে যায় দৃশ্যপট। সেখান থেকেই দিকনির্দেশনার কাজটি করতে থাকেন তিনি। সেনাবাহিনীকে সেখান থেকেই তিনি কমান্ড করছিলেন। অবশ্য খাজা ওসমান সব সময়ই রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রতিরোধ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। সেনাবাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল প্রচন্ড মনোবল আর রণকৌশল নিয়ে। কারণ, সেনাবাহিনীতে ছিলো বিপুল সংখ্যক সৈন্য, প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধসরঞ্জাম আর বিপুল ও অদম্য উচ্চাশাতো ছিলোই। এ রণপ্রস্তুতিকে ঠেকিয়ে রাখা সহজ নয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, আফগান প্রতিরোধ অনিবার্যভাবে ভেঙে পরার উপক্রম হয় বাস্তবেও তা-ই হয়।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, তাঁর সেনা দলের মধ্যেও কোন্দল, বিভেদ ও বিভাজন দেখা দেয়। সব মিলিয়ে টাল সামলানোই দায় হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই শেষ নয়, নাছির খান এবং দরিয়াখান নামের দু'জন পদস্থ সামরিক কর্মচারী খাজা ওসমানকে ছেড়ে চলে যান এবং মোগলদের অধীনস্থ হন। এই দু'জন পদস্থ সেনা কর্মকর্তা তাজপুরের দায়িত্বে ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিল্লা তাজপুর বেবাইনগর থেকে ৫/৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিলো। সেখানে এর ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যাবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাজা ওসমান বোকাইনগর ছেড়ে আশ্রয় নেন সিলেট বায়জীদ কররানীর কাছে। পরবর্তীতে, শেখ কামাল এবং আবদুল অহীদ বোকাইনগরে আসেন। খাজা ওসমান সিলেটে আশ্রয় গ্রহণ না করলে আরও ক্ষতি এবং বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিতো। এভাবেই উত্তোলিত হয় মোগলদের বিজয় পতাকা। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গোটা ময়মনসিংহ জেলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবাদার ইসলাম খান নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

সুবাদার ইসলাম খান গোটা বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। রাজধানী ঢাকাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর দিল্লিশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এর নামকরণ হয় জাহাঙ্গীর নগর। এদিকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মৃত্যুবরণ করেন ইসলাম খান। ইসলাম খানের ব্যক্তিত্ব ছিলো খুবই শক্তিশালী, আত্মমর্যাদাবোধও ছিলো প্রখর। গোটাবাংলার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণভার পাঁচ বছর তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিলো। বলতে গেলে তিনিই বাংলাকে মোগলদের পদানত করেন। উল্লেখিত পাঁচ বছরের ভেতর তিনি কেবলমাত্র ময়মনসিংহ জেলাসহ সুবে বাংলায় এক সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় এ শাসনব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিলো। সব দিক বিবেচনা করে একথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুবাদার ইসলাম খানই মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সুবেদারদের মধ্যেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুবাদার।

সুবাদার ইসলাম খানের পর ময়মনসিংহ জেলাসহ যাঁরা বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমানগণ হলেনঃ শাহজাদা মোহাম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং (১৬৮০-১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ), মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) ও আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবর ও বার ভূইয়া

সম্রাট আকবর কেবলমাত্র সম্রাটই নন, তিনি 'আকবর দ্য গ্রেট' উপমহাদেশে এই 'গ্রেট' উপাধি আকবর ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটেনি। এ উপাধি তাঁর কীর্তিরই স্বীকৃতি। সম্রাট হিসেবে তাঁর দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, মননশীলতা এবং প্রশাসনিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার, তাঁকে 'আকবর দ্য গ্রেট'-এ পরিণত করেছে। তিনি হয়েছেন সম্রাটের সম্রাট, ইতিহাসের রাখাল রাজা এবং মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে কীর্তিমান ও বাঘা সম্রাট। বার ভূঁইয়াদের মোকাবিলায় সম্রাট আকবরের উত্তরসুরীগণ আকবরের কুটকৌশল, ধৈর্য্য, স্থৈর্য, সাহস অনুসরণ করেছেন। সম্রাট আকবর তাঁদের কাছে ছিলেন পথিকৃৎ ও বাতিঘর।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, সম্রাট আকবর জীবিত থাকাকালীন দেখে যেতে পারেননি যে সমগ্র বাংলা তাঁর করতলগত-এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক বলে একমত প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাংগীর যখোন বাংলা জয়ে অগ্রসর হলেন তখোন বাধাপ্রাপ্ত হলেনঃ আফগান, হিন্দু প্রধান সামন্ত ও ভূঁইয়া জমিদারগণের মাধ্যমে যেটি সম্রাট আকবরও হয়েছিলেন।তাঁরা মোঘলদের শাসন সহজভাবে মেনে নিতে রাজী ছিলেননা বহুবিধ কারণে।

মোঘলদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার বড় বাধা ছিলো ভাটি এলাকা। সাধারণভাবে ভাটি হিসেবে পরিচিত। এই ভাটি আমরা নির্ধারণ করতে পারি এভাবেঃ পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে গঙ্গা(পদ্মা), পূর্বে ত্রিপুরা, উত্তরে বৃহৎ ময়মনসিংহ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি বড় নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা বিধৌত এবং বেষ্টিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চল নিয়েই ভাটি অঞ্চল। তাই ভাটিতে প্রবেশ করতে মোঘলদের বেশ বেগ পেতে হতো। ভাটি এলাকার ভুঁইয়াদের মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার বায়ের জমিদারি ছিলো বিক্রমপুর পরগনায়। এরা দু'ভাই জাতিতে ছিলেন কায়স্থ এবং সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। আকবরের সেনাপতির সংঙ্গে যুদ্ধের আগেই চাঁদ রায় মারা যান। কেদার রায় সেনাপতি মানসিংহের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রথমে আহত হন ও পরে মারা যান। প্রবাদ রয়েছে যে, চাঁদ রায়ের একমাত্র মেয়ে সোনাময়ীকে ঈসা খা জোরকরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। ওদের দু'ভাই মারা যাবার পর বিক্রমপুরের জমিদার বা জমিদারি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য দেয়া সম্ভব হলো না। সম্ভবত ঈসা খানের ছেলে মুসা খান বিক্রমপুর অধিকার করে থাকবেন। আইনে আকবরীতে দেখা যায় আকবরের সময় সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনায় ইবরাহিম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই নামে দু'জন জমিদার ছিলেন বটে। তবে জাহাংগীরের আমলে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না। আকবরের সময় জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী পরগনায় মজলিশ দিলওয়ার ও মজলিশ প্রতাপ নামে দু'জন জমিদার ছিলেন। এরা দু'জন মিলে সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহানকে পরাজিত করেন। ভাওয়ালে ছিলেন যথাক্রমে কাইউম খাঁ গাজী, তিলাগাজী, ফজল গাজী (ফজল গাজী, ঈশাখার সমসাময়িক) কাশিম গাজী, মাহতাব গাজী, চাদগাজী, শের-ই-গাজী, দেলোয়ার গাজী বরকত গাজী, দৌলত গাজী।

বিক্রমপুরের শ্রীপুরে যে রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিলো, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই পূর্তগীজ বণিকেরা সন্দিপ হতে সরাসরি শ্রীপুর নৌবন্দরে আসতেন তাদের জাহাজ মেরামতের জন্য। কেদার রায়ের সময় পুর্তগীজ নেতা কার্ভালো সন্দিপ থেকে পালিয়ে এসে শ্রীপুরে কেদার রায়ের আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলেন। মানসিংহ সেনাপতি মন্দা রায়কে শ্রীপুরের যুদ্ধে পাঠান, সেই যুদ্ধে মন্দা রায় মারা যায় কেদার রায় ও পূর্তগীজ নেতা কার্ভালোর হাতে। মানসিংহ বুঝতে পারেন কেদার রায়কে পরাস্ত করা সহজ নয়। তাই তিনি একটি খোলা তরবারি, দূতের মাধ্যমে পাঠান কেদার রায়ের কাছে, তরবারির সংগে ছিলো মিশ্র ভাষায় একটি কবিতা।

www.pathagar.com

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পলায়ী
হয়-গজ নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমর সিংহো মানসিংহ প্রযাতি।"

বীর কেদার রায় কবিতাসহ খোলা তরবারি গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজেই সংস্কৃত শ্লোক লিখে মানসিংহের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে যুদ্ধের চেলেঞ্জ ছুড়ে দিলেন ।

"ভিনত্তি নিত্যাং কবিরাজকুম্ভং
বিভক্তি বেগং পবনাদতীব
করোতি বাসাং গিরি গহবরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

মানসিংহ কেদার রায়ের জবাব পেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন, ফলে উভয় পক্ষই বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে বাঙালী বীর দশ দিন পর্যন্ত্ম যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে কালিদাস সিংহ নামক এক রাজপুত ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় বাংলার রাজধানী গৌড়ে আসেন এবং গৌড় শাসকের বদান্যতা ও নিজের উপযুক্ততায় তিনি "দিওয়ান" (রাজস্ব সচিব) পদে নিযুক্ত হন। নবনিযুক্ত দিওয়ান একজন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিন্দু। তিনি দৈনিক সকালে একটি সোনার তৈরী হাতির মূর্তি ব্রাহ্মণকে দান না করে নাস্তা করতেন না। একারণে তাঁর পরিচিতির পরিধি বেড়ে গেলে তিনি "গজদানী" আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে বংগের হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হোসেন শাহর দরবারে সেনাপতি কালাপাহাড়ের (রাজচন্দ্র) সংগে কালিদাস গজদানির ধর্ম সম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধ বাঁধলে কালিদাস গজদানি পরাজিত হন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর নতুন নাম হয়, সুলাইমান খাঁ (কালাপাহাড় পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন) হোসেন শাহ তখন দু'পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক। তিনি যথাক্রমে সিলেট বিজয়ী বীর সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালায়ের পুত্র সৈয়দ মালেকুল ওলামা, সেনাপতি কালাপাহাড় ও দিওয়ান সুলেমান খাঁর নিকট কন্যাদের বিয়ে দেন।

১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহর মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে নসরত শাহ রাজপদে অসিন হন। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে নসরত শাহর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ তখতে বসেন। কিন্তু কয়েক মাস পর পিতৃব্য মাহমুদ শাহর হাতে তিনি প্রাণ হারান। এদিকে বিহারের জায়গীরদারের তনয় শেরখা বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে মাহমুদ শাহকে পরাস্ত করলে মাহমুদ শাহ দিল্লির বাদশাহ হুমায়ুনের শরনাপন্ন হন। হুমায়ুন ১৫৩৯

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে গংগা তীরবর্তী স্থানে তেলিয়াগিরিতে এক যুদ্ধে শের খাঁকে পরাজিত করেন এবং মাহমুদ শাহ তাঁর রাজ্য ফিরে পান। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র সেলিম শাহ রাজ্যের দায়ভার গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের বহ্নি শিখা জ্বলে ওঠে। এদিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দূর্বলতার কারণে রাজস্ব সচিব দিওয়ান সুলেমান খাঁ সুযোগ মতে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে মেতে ওঠেন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা তাজ খাঁ ও বাংলার শাহী সেনাসমর নায়ক দরিয়া খাঁকে (কাপাসিয়ার টোকস্থ বাদশাহী আমলে নির্মিত মসজিদের পাশে যার কবর) দমন করতে বাংলায় এসে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন এবং তাঁর দু'পুত্র ঈসা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ বন্দী অবস্থায় দাস হিসেবে বিক্রিত হন।

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান পন্নি বাংলা ও বিহারের রাজকর্তা ছিলেন। ভাগ্যচক্রে মৃত সুলেমান খাঁর ভাই কুতুব খাঁ তাজখাঁর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। তিনি উচুঁরাজ পদ লাভ করেন। তিনি ভাতিজাদ্বয়ের অভাব অন্তরে পুষতে লাগলেন, এবং অনেক অনুসন্ধানে জানতে পারলেন ওরা মংগোলিয়া দেশে কোন এক ধনার্ঢ্য ব্যক্তির গৃহে অবস্থান করছে। তাজ খান দু'জনকেই অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে আনেন। চাচার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঈশা খাঁ বাংলার বিস্তৃত জনপদ নারায়নগঞ্জস্থ খিজিরপুরে প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করেন।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা তোডরমল্ল, মোনায়েম খাঁ ও দাউদ খাঁর সংগে পাটনায় যুদ্ধ শুরু করলে দাউদ পালিয়ে মেদিনীপুর ও পরে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন। রাজা তোডরমল্ল সুবর্ণরেখা জয় করেণ, এবং বিজয়লব্ধ ৫৪টি হাতিসহ বিজয় বার্তা সম্রাট আকবরের নিকট পৌঁছে দেন।

এদিকে সুবাদার মোনায়েম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দাউদ খান বাংলা আক্রমণ করে বসেন। সম্রাট আকবর বিদ্রোহ দমনে সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁকে বাংলায় প্রেরণ করেন। বর্তমান রাজ মহলের নিকট দাউদ মোঘল সৈন্যের গতিরোধ করলে যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হন (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে)। এভাবেই সমগ্র বাংলা মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিলো। এবছরই নবাব মুজাফফর খাঁ বাংলার সুবেদারী পদ লাভ করলেন এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি কৎলু খাঁ লোহানী, মাসুম খাঁ কাবুলী, আদহাম খাঁ মুলতানী, দরিয়া খাঁ প্রমুখ পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। ফলে সম্রাট আকবর ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল্লকে সুবাদার পদে নিয়োগ দিয়ে বাংলায় পাঠান। তোডরমল্ল বাংলায় এসে শান্তি ফিরিয়ে আনেন এবং ভুমি জরিপ ও রাজস্ব বন্দোবস্ত উন্নত করার মানসে দেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২ টি মহালে বিভক্ত করেন। এই কাজে ঈসা খাঁ রাজাকে সহায়তা করেন, ফলে রাজা তোডরমল্ল ঈশা খাঁকে সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁয়ের শাসক এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করেন।

www.pathagar.com

জনপদের মালিক ঈসা খাঁ ব্রহ্মপুত্রের তীর শেরপুর-দশকাহনিয়া, এগারসিন্ধুর, একডালা, ত্রিবেনী, খিজিরপুর, হাজীগঞ্জ, কালাগাছিয়া, অঞ্চলে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। কতরাভু, বক্তারপুর, চরসিন্দুর মহেশ্বরদী, কাটরাবো প্রভৃতি স্থানসমূহে সেনা ছাউনি ও অস্ত্রাগার স্থাপন করেন, এবং বাদশাহী ফরমান মতে নিয়মিত রাজস্ব কেন্দ্রে প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। ফলে রাজা তোডরমল্ল ও সুবাদার মির্জা আজম কোনরকম সন্দেহ পোষণ করতে পারলেন না।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মির্জা আজিম বিদ্রোহী কৎলু খাঁ ও মাসুম খাঁ কাবুলীকে দমনে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কৎলু খাঁ ও তদীয় সাহায্যকারী ফতেহবাদের (বর্তমান ফরিদপুর) শাসনকর্তা কাজী দাদা গড়িয়া মোঘল বাহিনীর গতি রোধ করেন। যুদ্ধে কৎলু খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। মাসুম খাঁ কাবুলী যুদ্ধে টিকতে না পেরে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া ঈশা খাঁর আশ্রয়ে রাজধানী খিজিরপুর চলে আসেন। বংগ সুবাদার শাহবাজ খাঁ ঈসা খাঁকে হুকুম দিলেন মাসুম খাঁকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ঈসা খাঁ এ আদেশ অমান্য করলে শাহবাজ খাঁ খিজিরপুর আক্রমণ করেন (১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে)। ঈসা খাঁ পালিয়ে এগারসিন্ধুরের দূর্গে চলে আসেন এবং মোঘলদের প্রতিরোধ করার সংকল্প নেন।

মাসুম খাঁ কাবুলী ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে এক নির্জন দ্বীপে আত্মগোপন করেন (কাপাশিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে) এবং সেনা সংগ্রহ করে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী বানারের বাম তীরে টোক (টোটক) নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে মোঘলদের গতি বিধি নিরীক্ষণ করে তারসুন খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মোঘল সেনাপতি তারসুন খাঁকে পরাজিত এবং নিহত করেন। এদিকে ঈসা খাঁ ব্রহ্মপুত্র নদে এক বিশাল বাঁধ নির্মাণ করে জল ধরে রাখলেন এবং সুযোগ মতো অন্ধকার রাত্রে সতেরটি বাঁধে খাল কেটে জল ছেড়ে দিলেন। এতে মোঘলদের ছাউনি গোলাবারুদ, অস্ত্র, রসদভান্ডার ভেসে গেল। মোঘল সৈন্য ও শাহবাজ খাঁ হতভম্ভ হয়ে পড়লেন এবং পরে ভাওয়ালের গড়ে আশ্রয় নিলেন। ঈসা খাঁ থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করলেন। কিছুদিন পর শাহবাজ খান নতুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন, বন্দী থানাদার সৈয়দ হোসেনের সহায়তায় ঈসা খাঁ মোঘলদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই ঈসা খাঁ সন্ধির শর্তসমূহ ভংগ করলেন ও মোঘলদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দু'পক্ষই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ঈসা খাঁর কামানের আওয়াজ স্তব্দ হয়ে যায়। মোঘলরা বিজয় উল্লাস করে খিজিরপুর দুর্গে প্রবেশ করে দেখতে পায় সবই শূন্য। সুবাদার শাহবাজ খাঁ ঈসা খাকে অনুসরণ করে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত যান। তিনি ভাবলেন ঈসা খাঁ সদলবলে মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছেন। ঈসা খাঁ সৈন্য সামন্ত নিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন। সুবাদার বিজয়বার্তা দিল্লিশ্বরের কাছে আগ্রায় পাঠিয়ে দেন।

মোঘল সুবাদার শাহবাজ খাঁ নিশ্চিত মনে আমোদ প্রমোদে মত্ত। এক অন্ধকার রাত্রে ঈসা খাঁ তার দলবল নিয়ে অতর্কিতভাবে মোঘল শিবির আক্রমণ করে বসলে

www.pathagar.com

মোঘল সৈন্যগণ কিংকর্তব্যবিমূর হয়ে পড়লো। শাহবাজ খাঁ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও রাজধানী ধ্বংসস্তুপে পরিনত হলো। ঈসা খাঁ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে নতুন রাজধানী সোনারগাঁয়ে স্থাপন করেই চতুর্দিকে রাজ্য জয়ে নেমে পড়লেন। ভাওয়ালের ফজল গাজী, বিক্রমপুরের চাঁদরায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মানিক্য, চন্দ্র দ্বীপের কন্দর্পনারায়নের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ঈশা খাঁ কামরূপের অধিন বর্তমান রাঙামাটি, (ধুবড়ী) জংগলবাড়ির রাজা লক্ষণ হাজরার রাজ্যসমূহ অধিকার করেন এবং কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িকে অধিকতর নিরাপদ মনে করে সেখানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবে ঈসা খাঁ ক্রিপুরা, (ত্রিপুরা) ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, কামরূপ অধিকার করে নিজের অধীনে আনেন এবং আগরতলার রাজা অমর মানিক্য ও যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাঁর শক্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ঈশা খাঁ এ সময় স্বাধীন নরপতির মতো তার নামে প্রতি শুক্রবার জুমা নামাজে "খুতবা" পাঠের ব্যবস্থা ও মুদ্রা প্রচলনের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সে আদেশ প্রতিপালিতও হয়েছিলো।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব হতেই মগ ও পুর্তগীজ জলদস্যুরা সম্মিলিতভাবে নিম্নবংগের বিভিন্ন জনপদ বিশেষ করে নদীতীরস্থ নগর গ্রাম সমূহে হত্যা, লুন্ঠনসহ স্থানীয় অধিবাসীদের বন্দী করে নিয়ে যেতো। তখনো মুঘলদের রাজশক্তি সার্বিকভাবে সুদৃঢ় হয়নি, ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা চলছিলো। একদিকে বাঙলার বার ভুঁইয়া অন্যদিকে মোঘল পাঠান ও মগ ফিরিংগীরা। তবে ফিরিংগীদের অত্যাচারে নিম্নবংগ উৎসন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়েছিলো। ফিরিংগীদের দমনের জন্য সহযোগিতা চাইতে ঈশা খাঁ গেলেন বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুরে। ভুঁইয়া চাঁদরায় ঈসা খাঁকে বরণ করে নিলেন মহাসমারোহে। সেখানে "চাঁদ মঞ্জিলে" রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী (সোনামনি) দিওয়ান ঈসা খাঁ'কে দেখে তাঁর রূপজ মোহে অভিভূতা হয়ে পড়েন ও ঈসা খাঁর সাথে গোপনে দেখা করে ইসলাম ধর্মগ্রহণ ও তাঁর পত্নী হবার আগ্রহ প্রকাশ করে বিদায় নেন। পরদিন ঈসা খাঁ দস্যুদমন সংক্রান্ত আলোচনার ফাঁকে চাঁদ রায়ের নিকট তাঁর কন্যার পাণি গ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করলে চাঁদরায় বৈধব্যের অজুহাত দেখিয়ে ঈসা খাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। ঈশা খাঁ তার আরজি প্রত্যাহার না করে চলে আসেন। দু'জনের মধ্যে শুরু হয় মিত্রতার পরিবর্তে শত্রুতা। দু'জনেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যুদ্ধ চলছে খিজিরপুরে, এদিকে সোনামনি অতি সংগোপনে বিশ্বস্ত রাজ অমাত্য শ্রীমন্তকে নিয়ে "কৌটিশ্বরের" মান্দিরে পূজা দেয়ার ছল করে ঈসা খাঁর উদ্দেশ্যে নৌকা করে সোজা সোনারগাঁও পরে এগারসিন্ধুর চলে আসেন। যুদ্ধে চাঁদরায় পরাজিত হলেন। এগারসিন্ধুর দুর্গে মহা ধুমধামে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ঈসা খাঁ ও সোনামনি। সোনামনির নাম দেয়া হলো "অলী নিয়ামৎ খানম"।

মুসলিম শাসনের পূর্ব হতেই তাউক, তৌটক বা টৌক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বহিঃ বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে আসছিলো। এ নগরীকে ঘিরে এগারসিন্ধুর দূর্গ গড়ে ওঠে। ফলে

www.pathagar.com

আগত বিভিন্ন বণিকেরা বিশেষ করে মুসলিম আমির ওমরাহগণের প্রাসাদোপম সুন্দর আবাসবাড়ি সমূহ দেখে চোখ জুড়াতো। ঈসা খাঁ যে সুচতুর এবং বুদ্ধিমান ছিলেন এটার প্রমাণ মেলে এখানে দুর্গ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। টোক, এগারসিন্ধুর মূলত একটি সুরক্ষিত দূর্গম এলাকা । এর ভীত এতটাই মজবুত ছিলো যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার সব ধরণের সুবিধে সেখানে ছিলো, যা ভৌগলিকভাবে এখনো বিদ্যমান। এসময় টোক এলাকায় থানাও স্থাপন হয়েছিলো (১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে)। একারণেই ঈসা খাঁ এ স্থানটির গুরুত্ব দিতেন অধিক। মোঘল সুবাদার শাহবাজ খাঁর পরাজয়ের পর দীর্ঘ নয় বছর দিল্লীর সম্রাট পূর্ববংগের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারেননি। দিল্লী রাজ ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি মানসিংহকে বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিয়োগ করেন। মানসিংহ তাঁর রাজধানী গংগা তীর রাজমহলে স্থাপন করেন। মানসিংহ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে (১০,০০০ মোঘল ও রাজপুত এবং ৫০টি কামান) ঈসা খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রথমে তাজপুর দুর্গ অধিকার করেন ও পরে মধুপুরে ঈসা খাঁ অবস্থান করছেন সংবাদ পেয়ে সেখানে যুদ্ধ অভিযান চালান। এই যুদ্ধে ঈসা খাঁ'র সাহায্যে ভাওয়ালের ফজল গাজী এগিয়ে আসেন। ফজল গাজীর নেতৃত্বে ঈসা খাঁ'র সৈন্য মোঘল বাহিনীকে প্রতিহত করতে গিয়ে পাঁচ হাজার মোঘল সৈন্যকে হতাহত করেন। মানসিংহ কেন্দ্রের কাছে সৈন্য ও সাহায্য চেয়ে পাঠান এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। নতুন সেনা ও সাহায্য এলে, মানসিংহ ঈসা খাঁ'র রাজধানী সোনার গাঁ আক্রমণ করেন। ঈসা খাঁ তখোন একডালা দূর্গে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সোনারগাঁ পতনের সংবাদ পেলেন।

ঈসা খাঁ রাজধানীর পতন সংবাদ পেয়েই একডালা হতে সোজা এগারন্ধির দূর্গে চলে আসেন। রাজা মানসিংহ গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যান ও লাক্ষ্যা নদীর উজান বেয়ে টোকে শিবির স্থাপন করেন। মানসিংহ হৃদয় মন থেকে তাদের পূর্ব পরাজয় মেনে নিতে পারছিলেন না, ফলে টোক প্রান্তসীমাতেই নির্ধারিত হলো যুদ্ধের ক্ষেত্রও সকল প্রস্তুতি।

এরই মধ্যে ঈসা খাঁ'র দূত মোঘল শিবিরে উপস্থিত হয়ে রাজামানসিংহকে পত্রপ্রদান করলেন। তাতে লেখা ছিলো "মহারাজ, আপনি বংগদেশ জয় করিতে আসিয়াছেন, আর আমি মাতৃভুমির স্বাধীনতারক্ষায় কৃতসংকল্প। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। তাহাদের কৃতকার্যতার উপর আপনার বা আমার বাহাদুরী নির্ভর করিতেছে। যদি তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে আপনার আমার বীরত্বের কোনই মূল্য থাকিবে না। আমরা দুইজনের মধ্যে যে-ই মারা যাই তৎপক্ষীয় সৈন্যগণ নিশ্চয়ই ছত্রভংগ হইয়া পলায়ন করিবে। অপরের ছেলের মস্তকের বিনিময়ে গৌরব অর্জন করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। অতএব, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনার সংগে প্রাচীনকালীন রণনীতি অনুযায়ী মল্লযুদ্ধ দ্বারা আমাদের শক্তির পরীক্ষা হউক। আপনি জয়ী হইলে, আমাকে বন্দী বা হত্যা করিয়া পূর্ববংগ অধিকার করিবেন আর যদি আপনি পরাভূত হন তবে আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকিবে। এই প্রস্তাবে আপনি

www.pathagar.com

সম্মত হইলে আগামীকল্য ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরবর্তী চাঁদপুর প্রান্তরে আমাদের শক্তি পরীক্ষিত হইবে। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিয়া আমাদের মল্লযুদ্ধ দর্শন করিবে মাত্র। এখন আপনার মতামত জ্ঞাপন করিবেন।" উল্লেখিত প্রস্তাবে মানসিংহ রাজী আছেন মর্মে দূতের মাধ্যমে ঈসা খাঁ'কে জানিয়ে দেয়া হলো। যুদ্ধস্থানটি ছিলো এগারসিন্ধুরের পশ্চিমে ত্রিমোহনা অর্থাৎ ত্রিধারা স্রোতে বিভক্তঃ এভাবে পূর্ব উত্তরে এগারসিন্ধুর দক্ষিণে টোক পশ্চিমে গফরগাঁও থানা এলাকা। মল্লযুদ্ধের স্থানটিকে আমরা দূর্গম বালুচর বলতে পারি। নিবন্ধকার বহুবার এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন। যা হোক পরদিন উভয়পক্ষই নিরস্ত্রভাবে দু'প্রান্তে উপস্থিত। সাধারণ সৈন্যরা দর্শক মাত্র। মল্লযুদ্ধে মানসিংহ নিজে না এসে প্রথমে তার জামাতা দুর্জয় সিংহকে পাঠালেন। যুদ্ধে দুর্জয় সিংহ ঈসা খাঁর তরবারির আঘাতে দু'টুকরো হয়ে মারা গেলেন। মানসিংহ জামাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেরি নাকরে ঈশা খাঁর মুখুমুখি হলেন। দু'বীর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন অপূর্ব রণকৌশলে। জয়-পরাজয় নির্ধারিত হলো না। সন্ধ্যার পর দু'জনই স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিতীয় দিনে পূর্বের ন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু ফলাফল পূর্ববৎ। তৃতীয় দিনে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তরবারি দুটোকরো হয়ে পড়লে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দন্ডায়মান। ঈসা খাঁ নিজের তরবারি বাড়িয়ে দিলেন সিংহের হাতে। তিনি বললেন "মহারাজ আমি নিরস্ত্র শত্রুর সংগে যুদ্ধ করি না। নিন, এই তরবারির দ্বারা আমার সংগে যুদ্ধ করুন"। মানসিংহ ঈসা খাঁর মহত্ত্ব, সৌজন্য ও বীরত্বগুনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে আলিংগন করলেন। দু'পক্ষই আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলো।

মানসিংহ ঈসা খাঁকে দিল্লি নিয়ে গেলেন, সম্রাট আকবরের সাথে তার মহত্ত্ব ও বীরত্বের কাহিনী শোনাবার জন্য। সম্রাট আকবর সব শুনলেন। তিনি ঈসা খাঁকে 'মসনদ-ই-আলা' ও 'মার্জুবানে বাঙলা' উপাধি দিয়ে বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা আয়ের ২২ টি পরগণার নিস্কর শাসনভার তাঁর হাতে অর্পন করে ফরমানেসাবাতি জারী করলেন। পরগণাগুলোহলোঃ(১)আলেফশাহী,(২)মোমেনশাহী,(৩)হুসেনশাহী, (৪)বড়বাজু, (৫)মেরাউনা, (৬)খরনা ,(৭)হেরানা, (৮) শেরআলী বাজু, (৯)ভাওয়া, (১০)দশকাহনিয়া, (১১)সায়র জলকর, (১২)সিংধা,(১৩)নছরৎউজিয়াল, (১৪)দরজিবাজু,(১৫)হাজরাদী,(১৬)জাফরশাহী, (১৭)বরদাখাৎ, (১৮)সোনারগাঁও, (১৯)মহেশ্বরদী, (২০)কাটবার, (২১)পাইটকড়া, (২২)প্রথম ১৫ টি সরকার বাজুহার, জফরশাহী সরকার ঘোড়ারঘাট ও বাকীগুলো সরকার সোনারগাঁয়ের অধীন ছিলো।

'যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে' মোঘল সাম্রাজ্যের অধিশ্বরগণ ও বার ভূঁইয়াগণ যাঁর যাঁর পথে অগ্রসর হয়েছেন। লড়েছেন, জিতেছেন, হেরেছেন, মারাগেছেন এবং এক পর্যায়ে থেমে গেছেন। প্রকৃতির নিয়মে তাঁদের দিন-রাত্রি মহাকালের অতল-গর্ভে হারিয়ে গেলেও দিন-রাত্রির হিসেব, কর্মযজ্ঞ, কীর্তি মানুষের ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরা।

www.pathagar.com

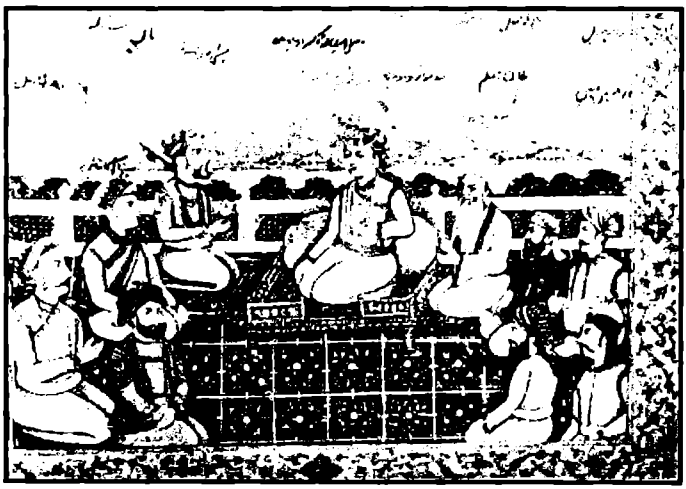

সম্রাট আকবরের দরবারে দেওয়ান ঈশাখাঁ
(সম্রাট আকবরের দক্ষিণপার্শ্বে দেওয়ান ঈশাখাঁ)

মসনদে আলা ঈশা খাঁ'র মৃত্যু

ঈশা খাঁ'র জীবনের শেষ পর্যায়ের ইতিবৃত্ত টানতে ইতিহাসবেত্তাগণ কেন জানি অনেকটা নিস্পৃহ। নানা দিক থেকে সফল ঈশা খাঁ'র জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে ইতিহাসনিষ্ঠ মানুষের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হচ্ছে- দিল্লি থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর মসনদে আলা ঈশা খাঁ'র অবশিষ্ট জীবন কাহিনী সম্বন্ধে ইতিহাস এতটা নীরব কেন? এর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমান আমাদের কাছে নেই। বারভূঞা ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠা, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহিত "পল্লীগীতি সমূহ" মাসিক 'নওবাহার' "কোহিনূর" ২য় বর্ষ ১৩১৯ ৩য় সংখ্যা-৫১ পৃষ্ঠা ছাড়া আধুনিক পন্ডিতগণের কাছে নতুন কোন তথ্য উপাত্ত থাকলে আমরা তাদের কাছে নতুন কিছু পাবার আশায় থাকলাম। যতোটুকু জানা যায় দিওয়ান ঈশা খাঁ জীবনের শেষ সময় স্ত্রী আলী নিয়ামত খানমকে এবং মুসা খাঁ, মোহাম্মদ খাঁ নামক দু'পুত্র সন্তান রেখে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন বক্তারপুর গ্রামে মারা যান। সেখানে একটি সমাধিও বিদ্যমান রয়েছে। বক্তারপুর গ্রামের মানুষজন জানেন এটি মসনদে আলা দিওয়ান ঈশা খাঁ'র সমাধি। বর্তমানে একদল ঐতিহাসিক একান্ত ভাবেই সমর্থন করেছেন বক্তারপুরের সমাধি ক্ষেত্রেই শুয়ে আছেন বাংলার স্বাধীনচেতা বীরসেনানী মসনদে আলা। কিন্তু কেমন করে ? আমরা যতোদূর জানি দিল্লি ফেরত

www.pathagar.com

দিওয়ান তো পরবর্তীতে কোন ঝক্কি ঝামেলায় পড়েননি। তাঁকে কোন বড় ধরণের সামরিক অভিযান ও পরিচালনা করতে হয়নি। তবে ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খাঁকে অনেক সামরিক অভিযান ও ধকল সইতে হয়েছে। সে ইতিহাস সহজেই আমরা হাতের কাছে পেয়ে যাই। কোন কোন ঐতিহাসিক ঈশা খাঁ ও মাসুম খাঁ কাবুলী একই খ্রিস্টাব্দে মারা যান বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা দেখতে পাই আধুনিক নরসিংদী জেলার চিনিশপুর মৌজায় তরোয়া নামক স্থানে প্রাচিন ব্রহ্মপুত্রের শাখা হাড়িধোয়া নদীতীরস্থ একটি মাজার রয়েছে যেটি কাবুল শাহের মাজার নামে পরিচিত। কিন্তু কে এই কাবুল শাহ? এনিয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত্ম নেই। এর সঠিক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রকৃত ঘটনা নির্ণয় করতে হলে ইতিহাসের আলোকে উন্মোচন করাই ভালো। আমরা দেখতে পাই ইতিহাসে মাসুম খান কাবুলী নামে একজন বীর সেনাপতির উল্লেখ রয়েছে। তিনি প্রথম জীবনে বিহারের জমিদার ছিলেন। মাসুম বাংলা বিহার বিদ্রোহের সময় আকবরের সৈন্য বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পূর্ববাংলায় পালিয়ে আসেন এবং ঈশা খাঁ'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহবাজ খাঁ কর্তৃক ঈশা খাঁ'র রাজ্য আক্রান্ত হলে ঈশা খাঁ ও মাসুম খান কোচবিহার থেকে ফিরে আসেন এবং বাজিতপুরের নিকট এক যুদ্ধে শাহবাজ খানের সহকারি সেনাপতি তারসুন খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। পরবর্তী সময় ঈশা খাঁ'র মৃত্যুর পর তার পুত্র মুসা খাঁ'র সংগে শীতলক্ষ্যায় এক নৌযুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুসা খাঁ'র প্রধান সেনাপতি ছিলেন মাসুম খান কাবুলী। যুদ্ধে মুসা খাঁ পরাজিত ও বন্দী হন। মাসুম খান পালিয়ে আত্মগোপন করেন জংগলাকীর্ণ স্থান তরোয়া নামক গ্রামে। তারপর থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্নহন মাসুম খাঁ কাবুলী। আজও প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে কাবুল শাহের মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়, ভক্তকুলে ভরে ওঠে মাজার প্রাঙ্গণ।

এখন মাসুম খান কাবুলীর মতো একজন সেনাধক্ষ্যের জীবন সম্পর্কিত অকাট্য তথ্যপ্রমাণ পাবার পর বিষয়টি আরো জোরালো ভাবে প্রমাণের দাবী রাখে, ঈশা খাঁ কোথায়? এদিকে ভাওয়ালের ফজল গাজী, তীলাগাজী, বাহাদুর গাজীদের সমাধি আমরা খুঁজে পেলেও অন্যান্য গাজীদের সমাধি খুঁজে পাচ্ছিনা। আমরা কি ধরে নিতে পারিনা, কথিত সমাধিটি গাজীদের মধ্যে যে কারো হতে পারে? অবশ্য ভবিষ্যৎ ইতিহাস-বিদগণই এর সঠিক সমাধান দিতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের জন্যে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, সমাধিটি সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ঐতিহাসিকগণ কিংবা ইতিহাসবেত্তাগণ আমাদের দিতে পারেননি।

www.pathagar.com

পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজ-উ-দ্দৌলা

সিরাজ-উ-দ্দৌলার শোচনীয় পরিণামের জন্যে পলাশীর যুদ্ধ যুগে যুগে আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে আসছে। আমরা সিরাজের শোচনীয় পরিণামে বেদনাহত না হয়ে পারি না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রায় দেড়শ'বছর ভারতে অবাধ বাণিজ্যের পর ইংরেজ কোম্পানিই ভারতকে একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলো। এ রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া কিন্তু প্রথম থেকে শুরু হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সতেরো শতকের শেষ সিকি অব্দি কোম্পানির বাণিজ্যিক আনাগোনা থাকলেও রাজনৈতিক অভিলাষ ছিলো না। দূরপ্রাচ্যে মসলা ব্যবসাই ছিলো প্রথম দিকে কোম্পানির লক্ষ্য। সেখান থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভারত বাণিজ্যের প্রতি চোখ পড়ে কোম্পানির।

ভারতের পশ্চিম উপকূল-বন্দর সুরাতে (১৬১৩) কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিলো। এভাবে কেটে গেলো দুই দশক। ১৬৩৩ সালে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কোম্পানির। অনিশ্চিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বাংলার সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্য যোগাযোগ চলে। ১৬৩৩ সালে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিগণের মধ্যে এই মর্মে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, কোম্পানির বাংলা- বাণিজ্য লাভজনক নয়। আর একারণেই বাংলায় বাণিজ্য যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় বেশ ক'বার। বাংলায় একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৬৫০ সালে। ১৬৫১ সালে হুগলীতে প্রথম এই বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়েছিলো। এরপর থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় বাণিজ্যিক বিনিয়োগ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ফলে, কোম্পানির ইউরোপীয়দের মধ্যে সবচে'বড় প্রতিদ্বন্দ্বি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো। আর তাই হুগলীতে কুঠি স্থাপনের ঘটনাকে বলা হয় "বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক"। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহও এ প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে রয়েছে ১৬৮৬-১৬৯০ সালের এ্যাংলো-মোগল যুদ্ধের পর প্রতি বছর তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় কোম্পানিকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়া এবং জব চার্নককে সুতানুটিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া। পাশাপাশি, যে বিষয়টি উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো ঃ ১৬৯৮ সালে কোম্পানিকে কোলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রামে সব ধরণের ক্ষমতা প্রদান করে জমিদারি সনদ দেয়া এবং কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপনের অনুমতি দেয়া। সম্রাট শাহরিয়ারের ফরমান (১৭১৭), রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের (১৭৪০-১৭৫৬) প্রতিক্রিয়া, সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কোলকাতা ও কাশিমবাজার দখল এবং শেষমেষ সিরাজ বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের নীল নক্শা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং পরিবেশ রচনা করা।

www.pathagar.com

এ্যাংলো মোগল যুদ্ধ ও জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি কুঠি স্থাপন (১৬৮৬-১৬৯০) ঃ

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এ্যাংলো মোগলযুদ্ধ ও জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি কুঠি স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার পথ পরিক্রমায় বাংলার ইতিহাসের অনেক পট পরির্বতন হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। প্রতিটি প্রেক্ষাপটই নানা ঘটনা ও পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনাই যে বড় বড় ঘটনার জন্ম দেয় এ্যাংলো-মোগল যুদ্ধ ও জব চার্নক কর্তৃক সুতানুটি কুঠি স্থাপন, সে সাক্ষ্যই বহন করে। ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ না করেও আমরা বলতে পারি যে, এই যুদ্ধ ও কুঠি স্থাপন বাংলার ইতিহাসের নব রূপায়ন ঘটায়। আমরা পলাশীর যুদ্ধের পরিবেশ তৈরিতে এর অভাবনীয় ভূমিকা বিবেচনায় আনতে পারি। আমরা জানি যে, এদেশে ইউরোপীয় পণ্যের চাহিদা ছিলো না। এজন্য কোম্পানি ইউরোপ থেকে পণ্য এনে এদেশে বাজার সৃষ্টি করতে চায়নি। বরং, ইউরোপ থেকে পণ্য আমদানী না করে সোনা-রূপা আমদানী করতে থাকে। এই সোনা-রূপা পরে স্বর্ণ-ডিম্ব হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। এই স্বর্ণ-ডিম্বের বিষয়টি আমাদের বিশেষ ভাবে আলোড়িত করে। এই স্বর্ণ-ডিম্বকে মোগল সরকার প্রকৃত অর্থেই অশ্ব-ডিম্ব বলে বিবেচনা করতেন। মোগল শাসকগণ ডিম্ব লাভের পথ সুগম রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ দেয়া হয় নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে। এই অর্থের পরিমাণ মাত্র তিন হাজার টাকা। এদিকে, কোর্ট অব ডাইরেক্টস লক্ষ্য করে যে বঙ্গ-বাণিজ্যে বিনিয়োগ দিনে দিনে বাড়ছে। এরই প্রেক্ষিতে পুঁজির নিরাপত্তার বিষয়টিও বিশেষভাবে, বিবেচিত হয়। পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মডেলে বাংলার উপকূল অঞ্চলের সুবিধাজনক জায়গায় একটি সুরক্ষিত সার্বভৌম বসতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৬৮২ সালের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ঢেলে সাজানো হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে মাদ্রাজ থেকে আলাদা করে একজন গভর্নর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ইংরেজদের সুরক্ষিত বসতির ব্যবস্থা তখন ছিলো না। প্রথম গভর্নর নিযুক্ত করা হয় উইলিয়াম হেজেজকে। উইলিয়াম হেজেজের পদবীর নাম ছিল 'Governor chief of the English India company in the Bay of Bengal.' তাঁর অফিস স্থাপিত হয়েছিলো মোগল নিয়ন্ত্রিত হুগলী বন্দরে। ব্যবসার স্বার্থে হেজেজই প্রথম বাংলায় ব্রিটিশ সামরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করতে থাকে। কোম্পানির বঙ্গোপসাগরীয় ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হেজেজের স্থলে গভর্নর হিসেবে জব চার্নককে (১৬৮৬) নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, জব চার্নকের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিলো। তাঁর প্রত্যাশা ছিলো সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যাক।

www.pathagar.com

১৬৮৬ সালে এ উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্যে তিনি চট্টগ্রাম দখল করেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে তিনি অনুমোদন লাভ করেছিলেন। ১৬৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এক স্কোয়াড্রন সৈন্য হুগলী আক্রমণ করে। কোম্পানি ও সরকারের মধ্যে প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলে।

কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কাজ করেছে কোম্পানির নৌশক্তি। অন্যদিকে, ইংরেজদের বিতাড়িত করতে মোগল সরকার যে সক্ষম হয়েছিলো-সেটি হচ্ছে স্থল শক্তি বলে। অনেক দিন ধরে জলপথ অবরুদ্ধ থাকার ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত হতে থাকে। এদিকে কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সরকার বঞ্চিত হতে থাকে বিপুল পরিমাণ ধাতব সম্পদ থেকে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৯০ সালে বিবাদ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইংরেজদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সুবাদার ইব্রাহিম খান সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কোম্পানিকে বছরে তিন হাজার টাকা পেশকাশ অর্থাৎ পুরস্কার প্রদানের আদেশ দেন। পাশাপাশি, বৈধভাবে ব্যবসা করার পরিবেশ রচনা করার একটা তাগিদও দেন। সুবাদার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার পরোয়ানা জারি করেন। পাশাপাশি, সুতানুটিতে কোম্পানির প্রধান কুঠি স্থাপনের অনুমতিও প্রদান করেন। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি সাত তাড়াতাড়ি সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং নতুন করে বাণিজ্য করতে থাকে। মূল কুঠি স্থানান্ত রিত হয়ে যায় হুগলী থেকে সুতানুটিতে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত এভাবেই রচিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে-দেশে ইংরেজ বণিকদের ফিরিয়ে আনার পিছনে কি কারণ ছিলো ?এর উত্তরে বলা যায় যে,অর্থনৈতিক কারণেই ইংরেজ বণিকদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এটি কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ইউরোপীয়দের মাধ্যমে দেশে রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো। অবশ্য মোগল সরকারের ব্যর্থতা যে ছিলো না, এমন নয়। সে ব্যর্থতার কারণ অন্যত্র নিহিত। নৌশক্তির ব্যাপারে বলা যায়, নৌশক্তি প্রবল করার কোনো পরিকল্পনাই মোগল সরকার গ্রহণ করেনি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই নৌশক্তিকে 'নাওয়ারা' নামে অভিহিত করা হতো। ভুলে গেলে চলবে না যে, নৌশক্তির বলেই ইউরোপীয়গণ-ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আনা-গোনা করতেন। সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল নৌশক্তি কাজ করলেও মোগল শাসকদের মধ্যে আত্মরক্ষার চেতনা সৃষ্টি হয়নি। মোগল সরকারের আর্থিক সক্ষমতা ছিলো যথেষ্ট। দেশে জাহাজ নির্মাণের সামগ্রীও কম ছিলো না। জনসম্পদও ছিলো যথেষ্ট। মোগল সরকার ইচ্ছে করলেই ইউরোপীয় জাহাজ নির্মাণ কারিগর-প্রকৌশলী নিয়োগ করতে পারতো। কিন্তু সরকার তা না করে ভাড়াটে ইউরোপীয় সেনাকে নিয়োগ দিয়েছিলো চাকরি দিয়ে। ফলে, ইউরোপীয়দের জন্যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়ে যায় সহজেই।

www.pathagar.com

মুর্শিদাবাদ দরবারে রাজনৈতিক কোন্দল ঃ

আঠারো শতকের প্রথম পাদে তিন যুগ ছিলো বাংলার ইতিহাসের জন্যে বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত অধ্যায়। অনেকেই এ সময়টিকে বিশেষ শান্তি-সমৃদ্ধির যুগ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। মুর্শিদকুলী ও সুজাউদ্দিন খানের প্রশাসনিক দক্ষতা, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, অভূতপূর্ব রপ্তানি বৃদ্ধির মতো ইতিবাচক পরিবর্তনে বিশেষিত ছিলো এই সময়কাল। কিন্তু, এই সময়ের ইতিবাচক দিকটা শেষ কথা নয়। এই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে কতিপয় মারাত্মক নেতিবাচক কর্মকান্ড সংঘটিত হতে থাকলো। দেশের রাজনীতিও মোড় পরিবর্তন করলো। ভূমিপ্রশাসন নীতিতেও ঘটলো অভূতপূর্ব পরিবর্তন। রাজা মহারাজা পদবীধারীদের পাশাপাশি উদ্ভূত হলো জমিদার শ্রেণী। প্রশাসন নীতির কারণেই শক্তিশালী আমলা-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো। বেনিয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো রপ্তানি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। সরকারও এই বেনিয়াদের সম্পদ ও সহযোগিতার উপড় অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, এইসব শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নবাবের দরবারেও স্থান পেয়েছিলো পরামর্শক হিসেবে। রাজনৈতিক ভাবেও এই নব্য শাসক শ্রেণী আস্তে আস্তে সোচ্চার হতে থাকলো। সমকালের ইউরোপের নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতই রাজনৈতিক ভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যনির্মাতার ভূমিকাই পালন করছিলো এই বেনিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণী। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৭২৭ সালে সুজা উদ্দিন খান ও ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খান সিংহাসন লাভ করেছিলেন তাদেরই আশীর্বাদে।

বানিয়া-ভূস্বামীচক্র অবশ্য অন্য একটি প্রাসাদবিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সে সময়টা ছিলো আলিবর্দীর নবাবীর শেষ সময়। এটি হয়েছিলো অর্থনৈতিক কারণেই। টানা চার দশক অর্থনীতি তাজা থাকার পর ১৭৪০ এর দশকে এসে অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিলো। অবশ্য বিশ্বব্যাপীই তখন অর্থনীতিতে মন্দাভাব চলছিলো। স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলো বাংলায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংকোচন নীতি গ্রহণ করতে থাকে। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সকলের উপর এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া পড়ে। অর্থনীতিকে বিশেষভাবে নুব্জ ও নাজুক করে তুলছিলো ঘনঘন মারাঠা আক্রমণ। উৎপাদন কমে যায় ও যুদ্ধজনিত কারণে সরকারি ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে, দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বগতি ঘটে মারাত্মক রকম হারে। এমন একটা সময় ছিলো, যখন ১৭৩৮ সালে এক টাকায় এক'শ সেরেরও বেশি চাউল ক্রয় করা যেতো। সেখানে ১৭৫৪ সালে একটাকায় সর্বোচ্চ তেত্রিশ সেরের বেশি চাউল পাওয়া যেতো না। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে সরকার কয়েক দফা ভূমিরাজস্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে, ভূস্বামী শ্রেণী বৈরী হয়ে যায়। বেশি বেশি অনুদান দাবি করার ফলে পুঁজিপতি অমাত্যরাও আস্থা হারিয়ে ফেলে সরকারের উপর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উদ্ভূত পরিস্থিতির পুরো সুযোগ গ্রহণ করে। চারদিকে তখন অর্থনৈতিক মন্দা। এই মন্দার কারণে কোম্পানি, আমলা-মুৎসুদ্দি ও ফৌজদারদের মধ্যে শীতল সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর তাই আগের

www.pathagar.com

মতো উৎকোচ ও নজরানা দিতে তারা অনীহা প্রকাশ করে। দরবারে নবাব বিরোধী অমাত্যদের সঙ্গে কোম্পানির কর্মকর্তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকে।

কোম্পানি-নবাব সম্পর্কে অবনতিঃ

ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে ছিলো বিবাদ। ইউরোপে অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধও এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে। ভারতে অবস্থানরত ইংরেজ-ফরাসিদের মধ্যেও বিবাদ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এই দুই পক্ষ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায়। ইংরেজ-ফরাসিদের মূলভূমি হয়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক। কর্ণাটকে কয়েকদফা যুদ্ধ হয়। এযুদ্ধে বেকায়দায় পড়ে যায় ইংরেজগণ। বাংলাদেশে যাতে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয় সেজন্যে ইংরেজগণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে থাকে। এক্ষেত্রে ইংরেজগণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দুর্গ নির্মাণ ছিলো সে প্রস্তুতির একটা দিক। বঙ্গে অবস্থানরত ইংরেজ ও ফরাসি উভয় জাতির যথোপযুক্ত নিরাপত্তা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেন আলিবর্দী খান। আলিবর্দী খান দুর্গ নির্মাণ থেকে বিরত থাকার জন্যেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। নবাবের আহবানে ফরাসিদের ইতিবাচক সাড়া মিললেও ইংরেজদের সাড়া মেলেনি। ইংরেজগণ সুবা সরকারকে এই মর্মে জানিয়ে দেয় যে, কোম্পানির স্বার্থরক্ষাই তাদের কাছে বড়। এ স্বার্থরক্ষার জন্যে প্রয়োজনে তারা যেকোনো পক্ষ বা যে কারো সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধা করবে না। কোম্পানি তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে থাকে। কিন্তু, এক্ষেত্রে নবাব বারবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কোম্পানিকে সুরক্ষিত করার জন্যে বারবার পদক্ষেপ নেবার ফলে নবাব ক্ষেপে যান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোম্পানিকে বারবার সুরক্ষিত করার উদ্যোগ ১৬৯০ সালে এ্যাংলো-মোগল চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু, এই চুক্তি লঙ্ঘন জনিত কারণে তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয়নি। বরং, তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে ইংরেজগণ যে অধিকার লাভ করেছিলো, সে সম্পর্কে তারা ছিলো সচেতন। সে অধিকারে সামান্যতম হস্তক্ষেপ করলেই তারা দ্রোহী হয়ে উঠতো। তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগনামা গঠন করে হাজির হয়ে যেতো। কিন্তু, অধিকারের বিপরীতে যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা ছিলো উদাসীন। শর্ত অনুযায়ী ইংরেজগণ দেশের আইন-কানুন মেনে চলার কথা। সরকারের প্রতি অনুগত থেকে কোম্পানি বাণিজ্য পরিচালনা করবে, প্রতি সনদেই তা উল্লেখ ছিলো। কিন্তু, কোম্পানি এবিষয়টিকে এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি এবং তাদের উন্নাসিকতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

পলাশীর পথে ঘটনা প্রবাহ ঃ

মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলার নবাব ছিলেন দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। নবাব নিজে উত্তরাধিকার মনোনয়ন দিতেন। পেশকাল প্রদান করে তা বাদশাহ কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, নবাবের মনোনয়ন মতো সব কিছু হতো না। বরং নবাবের ইচ্ছার বিপরীতেই ইংরেজগণ সব কিছু করতেন।

www.pathagar.com

কোম্পানির সঙ্গে সুবার সম্পর্ক ঃ

বাদশাহী ফরমান নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরায়। কোম্পানি কোনো অবস্থাতেই ফরমান মানতে রাজী নয়। ১৭১৭ সালের বাদশাহী ফরমান নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক আস্তে আস্তে শীতল করে তোলে। ফরমান বাস্তবায়নের জন্যে কোম্পানি দাবি জানাতে থাকে। নানা অজুহাতে নবাব ফরমানের পূর্ণ বাস্তবায়ন স্থগিত রাখেন। আলীবর্দী খাঁ নবাব থাকাকালীন সময় পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নবাবের অনুমতি না নিয়ে ইংরেজগণ দূর্গ নির্মাণ করতে থাকেন। এই দুর্গ নির্মাণ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সেই সময়টা ছিলো ১৭৫৪ সাল। কোম্পানি নবাবের সঙ্গে ধৃষ্টতাসুলভ আচরণ করে। কোম্পানি নবাবকে জানিয়ে দেয় যে, কোলকাতার প্রতিরক্ষার জন্যে তারা দুর্গ নির্মাণ করবে এবং প্রয়োজন মতো সমরাস্ত্রের সংখ্যা বাড়াতে থাকবে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তারা নবাবের নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করবে না বলেও জানিয়ে দেয়। ১৭৫২ সালে উত্তরাধিকার মনোনয়ন লাভের পর থেকে নানা সুবার দায়িত্ব পালন করছিলেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এরই সূত্র ধরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা কয়েকবার কাশিমবাজার কুঠি পরিদর্শনে যান। তিনি সব কিছু দেখে শুনে কোম্পানির কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, কোম্পানি কোনোভাবেই সুবার আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। বরং, তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতেই কোম্পানি অভ্যস্ত। কোম্পানির মনোভাব নবাবকে ক্ষিপ্ত করে, নবাব কোনো ভাবেই কোম্পানির লোকদের আচরণ সহ্য করতে পারছিলেন না। সুজাউদ্দিন ও আলীবর্দী খান কোম্পানিকে সহ্য করার অন্য কারণ রয়েছে। কোম্পানির পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলো কোম্পানির সমর্থক সুবার শ্রেষ্ঠ বানিয়া মুৎমুদ্দি শ্রেণী। স্বাভাবিকভাবেই বণিক ইংরেজ ও বণিক ভারতীয়দের স্বার্থের হাল হকিহত ছিলো অভিন্ন, কোম্পানির বিনিয়োগই ছিলো বানিয়া শ্রেণীর আয়ের উৎস। ১০এপ্রিল, ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উ-দ্দৌলা মসনদে আরোহণ করেই কোম্পানির প্রতি তাঁর নীতি ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজদের উপস্থিতি ও তৎপরতা যে এদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে তিনি তা বিশ্বাস করতেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। সিরাজ-উ-দ্দৌলা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনটি কারণে তিনি কোম্পানিকে তাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সিরাজের বক্তব্য হচ্ছেঃ ইংরেজ বণিকদের এদেশ থেকে তাড়াবার প্রধান কারণ হচ্ছে ইংরেজগণ দেশের আইন-কানুন মানে না। আইন ভঙ্গ করে কোলকাতায় তারা দুর্ভেদ্য দূর্গ ও পরিখা স্থাপন করেছিলো। দ্বিতীয়ত, তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং দস্তকের অপব্যবহার করেছে। কোনো আইন-কানুনের তোয়াক্কা নাকরে কোম্পানির নামে বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে দস্তক (বিনাশুল্কে বাণিক্য করার পাশ) বিতরণ করে সরকারকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্য ও বৈধ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। তৃতীয়ত জমিদারির ইজারার নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাদের কোলকাতা জমিদারিকে ইংরেজগণ সার্বভৌম এলাকা হিসেবে গণ্য করেছে। অনেক অপরাধী নবাবি আইন-আদালতকে তোয়াক্কা না করে পালিয়ে কোলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে, এবং কোম্পানি এসব অপরাধীকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছে।

www.pathagar.com

সিরাজের অভিযোগগুলো নতুন নয় পুরোনো। মুর্শিদকুলী খানের শাসনের শেষের দিকে তথা শেষ দশক থেকেই ইংরেজগণ বাড়াবাড়ি করতে থাকে। মোগল আইন ও সার্বভৌমত্বকে তারা তোয়াক্কা করতো না। এই তোয়াক্কা না করার প্রবণতা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। আলীবর্দী খানের শেষের দশক থেকে এই তোয়াক্কা না করার প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এখানে বলে নেয়া ভালো যে, সমকালীন ইউরোপে এধরণের অভিযোগের যে কোনো একটিই যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে ছিলো যথেষ্ট। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আলীবর্দী খান পর্যন্ত কোনো নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অথচ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ছিলো জরুরি। পরিবেশ-পরিস্থিতি, বাস্তব পরিবেশের কথা বিবেচনা করে কোনো নবাবই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। নানা কৌশলে, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্খায় সামরিক মোকাবিলা এড়িয়ে গেছেন বারবার। কিন্তু, সিরাজ-উ-দ্দৌলা দমে যাওয়ার মতো ব্যক্তি নন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা এর শেষ দেখার জন্যে সংকল্প ও গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার এপদক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্যার যুদু নাথ সরকারের মন্তব্য হচ্ছে যে, "সিংহাসনে আরোহণের আগে সিরাজ ইংরেজদের হাতে কয়েক দফা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ইংরেজগণ নবাবকে উপঢৌকন পাঠাননি বলে তিনি ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট হন। এর ফলশ্রুতিতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজের পতন নিজে ত্বরান্বিত করেন"। এক্ষেত্রে, সিরাজ-উ-দ্দৌলার কূটনৈতিক ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করতেই হয়। বিদেশী বণিক শ্রেণী কর্তৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী দফায় দফায় অপমানিত হওয়াকে কোনো ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সিংহাসন লাভের পর রাজ্যের উত্তরাধিকারী বিদেশী বণিক শ্রেণী কর্তৃক উপঢৌকন প্রত্যাশা করতেই পারেন। এটি তাঁর প্রত্যাশাই কেবল নয়, প্রাপ্য অধিকারও বটে। ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি কোনো প্রকার স্বীকৃতিই পাননি। যে কোনো রাজাই এতে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হওয়ার কথা। সিরাজ-উ-দ্দৌলাও হয়েছিলেন। অভ্যাগত বণিক শ্রেণী রাজ্যের নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করলে নবাব রুষ্ট হতেই পারেন। ধরা যাক এতোসব বাড়াবাড়ির পরও কোনো নরপতি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না, নিরবে চোখ বুজে সব সহ্য করলেন। তাহলে সে নরপতির আত্মমর্যদাবোধ, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে এবং তাঁকে অপদার্থ, দূর্বল, সম্মানবোধহীন ব্যর্থ নরপতি হিসেবেই আখ্যায়িত করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা সে অপবাদ পেতে চাননি। স্বাধীন সার্বভৌম নবাব হিসেবে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শান্তি পূর্ণভাবে ইংরেজগণ যাতে ব্যবসা করেন, সে আহবান জানিয়ে ছিলেন। তবে এটিও সত্য যে, ইংরেজদের জন্যে সিরাজ-উ-দ্দৌলা সকল সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করেছিলেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা শান্তিপূর্ণভাবে ইংরেজদের এ-ও জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, নিয়ম-কানুন না মেনে ব্যবসা করলে এবং যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত আচরণ করলে তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। অবশ্য একথা বলা ছাড়া সিরাজ-উ-দ্দৌলা তখন কি-ইবা করতে পারতেন। সিরাজের হুশিয়ারীকে কোলকাতা কাউন্সিল কোনো তোয়াক্কাই করেনি এবং সিরাজের হুশিয়ারীতে কর্ণপাতও করেনি। কোম্পানি বিভিন্ন ধরণের রাজবিরোধের কর্মকান্ডে জড়িয়ে যায়।

www.pathagar.com

কৃষ্ণদাস মামলা ঃ

বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খান যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন শাসন কার্যের ভার ছিলো নবাব আলীবর্দী খানের উত্তরাধিকারী সিরাজ-উ-দ্দৌলার উপর। সিরাজ-উ-দ্দৌলা কোম্পানির লোকদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পেয়েছিলেন। সিরাজ গোপনসূত্রে জানতে পেরেছিলেন যে, ঢাকা প্রদেশের রাজস্ব পরিচালক (দিওয়ান) রাজা রাজবল্লভ দীর্ঘদিন ধরে সরকারি তহবিল তসরুপকরে আসছেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকা প্রদেশের রাজস্ব সংক্রান্ত সকল নথিপত্র নিরীক্ষার জন্যে রাজবল্লভকে নির্দেশ দিয়ে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান। রাজবল্লভ ভিতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন এবং পুত্র কৃষ্ণদাসসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে আশ্রয়ের জন্যে পাঠিয়ে দেন কোলকাতা। প্রায় ৫৩ লাখ টাকা নিয়ে কৃষ্ণদাস কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোম্পানির পুঁজিবিনিয়োগে কৃষ্ণদাসের বেশ ভূমিকা ছিলো। কোম্পানির পুঁজিবিনিয়োগে কৃষ্ণদাস কর্তৃক আনীত অর্থ ভূমিকা রেখে ছিলো। তাছাড়া, তাকে নিরাপত্তা দেবার বিনিময়েও কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকর্তা পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেছিলো। কেবলমাত্র আর্থিক কারণ নয়, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার পিছনে রাজনৈতিক কারণও সক্রিয় ছিলো। রাজবল্লভ ছিলেন সিরাজের সিংহাসন লাভের প্রশ্নে শওকত জঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোলকাতা কাউন্সিল কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার মধ্য দিয়ে সুবার প্রতি দুর্দান্ত এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো।

দুর্গ নির্মাণ ঃ

সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিধি নিষেধ এবং কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও কোলকাতায় দুর্গ সম্প্রসারণের কাজ চালাতে থাকে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল। দুর্গ নির্মাণের প্রশ্নে সিরাজের যুক্তি ছিলো এই যে, আগে দেশে অস্বাভাবিক ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় এনে কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু,বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রজা-সাধারণের জানমালের নিরাপত্তা আগের তুলনায় অনেক বেশী। কাজেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গ নির্মাণের অর্থ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ারই নামান্তর। নবাবের পক্ষে এ প্রস্তুতি পর্বকে মেনে নেয়া সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। কিন্তু, সিরাজের সাবধানবানী এবং হুঁশিয়ারীতে কাউন্সিল কর্নপাত করেনি।

এহেন পরিস্থিতিতে সিরাজ-উ-দ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল প্রধান উইলিয়াম ড্রেককে চিঠি লেখেন এবং চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, পলাতক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয়া এবং কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণের তৎপরতা দু'টোই বেআইনি। এই তৎপরতা রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক। সিরাজ তাই কোলকাতা কর্তৃপক্ষকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কৃষ্ণদাসকে ফেরৎ পাঠানোর আহবান জানান এবং দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে বলেন। সিরাজের পত্রবাহক নারায়ণ সিংহকে উইলিয়াম ড্রেক চরমভাবে অপমাণিত করে বিদায় দেন।

www.pathagar.com

কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিরাজ-উ-দ্দৌলা শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। এলক্ষ্যে তিনি খাজাওয়াজিদ নামে একজন-খ্যাতনামা আর্মেনীয় বণিককে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন ড্রেকের কাছে। কিন্তু, ওয়াজিদ মিশন পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। দুর্ব্যবহার করা হয় খাজা ওয়াজিদের সঙ্গে এবং তাঁকে হুমকি দেয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে এধরণের দূতিয়ালির দায়িত্ব নিয়ে তিনি না আসেন।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা রাজনৈতিকভাবে সমস্যার-সমাধান করতে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিকভাবে সমস্যার-সমাধান করতে না পেরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা কোলকাতা কাউন্সিলের উপর সীমিত সামরিক চাপ প্রয়োগ করেন। উদ্দেশ্য ছিলো কোলকাতা কাউন্সিল যাতে আলোচনা করতে বাধ্য হয়। সিরাজ-উ-দ্দৌলা পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রয়োজনে কতিপয় কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি কোম্পানির কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজে হাজির হলেন সামরিক শক্তি নিয়ে কাশিমবাজারে। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ফ্যাক্টরি প্রধান উইলিয়াম ওয়াটস আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ওয়াটস আত্মসমর্পণ করলে সিরাজের আদেশে ফ্যাক্টরির মালামাল তালাবদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি সিল করে দেয়া হয় ফ্যাক্টরি। যাতে করে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ লুটপাট করতে না পারে।

কোলকাতার পতন ঃ

সিরাজ-উ-দ্দৌলা সামরিক চাপ প্রয়োগ করে কোম্পানিকে আলোচনায় আনতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার আত্মরক্ষামূলক নীতির কথা ড্রেক ভালোভাবেই জানতেন এবং সিরাজের আত্মরক্ষামূলক নীতির সুযোগ নিয়ে ড্রেক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই প্রতিশোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ড্রেকের নবাবের ঘাঁটি সুখসাগর আক্রমণ। সিরাজ আবারো ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের জন্যে আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। কিন্তু, ড্রেক তাঁর সিদ্ধান্তে স্থির থাকলেন। তিনি নবাবকে তাঁর ইচ্ছা পূরণের সুযোগ দিলেন না। ড্রেক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, নবাবের যুদ্ধংদেহী রূপ বাইরে থেকে যতোটা মনে হয়, বাস্তবে ততোটা নয়। কোম্পানির সঙ্গে সিরাজ কোনোভাবেই পুরোপুরি যুদ্ধে জড়িয়ে যাবেন না। সে শক্তি এবং সামর্থও সিরাজের নেই। দরবারে সিরাজ বিরোধী দলের কথা বিবেচনা করেই ড্রেকের এমন মনে হয়েছিলো। দরবারে সিরাজ বিরোধী বানিয়া দল ছিলো খুবই শক্তিশালী। এদিকে, সিরাজ-উ-দ্দৌলাও শত্রুর শত্রুকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। এজন্যে সিরাজ চিরাচরিত কৌশল প্রয়োগ করতেও সচেষ্ট ছিলেন। স্বদেশে রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে এমনিতেই ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলো ছিলো পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। ইংরেজকে শায়েস্তা করার চেষ্টা সিরাজের থামলো না। সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়ে ফরাসি এবং ওলন্দাজদের সামরিক সহযোগিতা লাভ করতে সচেষ্ট হন তিনি। কিন্তু, সিরাজের এই প্রচেষ্টা বাস্তবসম্মত ছিলো না। তারপরও সিরাজ কোলকাতা দখলের জন্যে গোলন্দাজ শক্তি জোরদার করেন।

সিরাজ ১৭৫৬ সালের ১৬ জুন ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কোলকাতা আক্রমণ করেন। কোম্পানির লোকজন ভাবতেও পারেননি নবাব এতো তাড়াতাড়ি কোলকাতা

www.pathagar.com

আক্রমণ করবেন। কোম্পানির লোকজন কোলকাতা রক্ষার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগও পাননি। নবাবের সৈন্যের সঙ্গে কার্যকরভাবে দাঁড়াতে পারেন, এমন সৈন্যের সংখ্যাও বেশী ছিলো না। এই সৈন্যের মধ্যে ছিলো ২৫০ জন ইউরোপীয়। এর সঙ্গে ছিলো এক হাজার ভারতীয় লস্কর। ৫০ টি ছিলো দূরপাল্লার কামান। কোলকাতা শহর ও দূর্গ সিরাজ-উ-দ্দৌলার বাহিনী ঘিরে ফেলে চারদিকে। যুদ্ধের প্রথমদিন অতিক্রান্ত্ম করার পর দ্বিতীয় দিন কোম্পানির লোকজন নিশ্চিত পরাজয়ের ব্যাপারটি আঁচ করতে পারে। সকলকে অবাক করে দিয়ে কোম্পানির লোকজন সব সিরাজের দলে ভিড় জমায়। তৃতীয় দিনে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ড্রেক দূর্গরক্ষার উপর মনোনিবেশ করেণ। শহর রক্ষার চেষ্টা তিনি পরিত্যাগ করেন। এরপরও অবস্থার উন্নতি হয়নি। সিরাজের গোলন্দাজ বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে ড্রেক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে, অপেক্ষমান জাহাজে করে পালিয়ে নদীর ভাঁটিতে চলে যাবেন। অবস্থা বেগতিক দেখে পলায়নপর জাহাজগুলো ইউরোপীয়দের নিয়ে ভাঁটিতে পাড়ি জমায়। কিন্তু, তখন সবাই ছিলো আতঙ্কিত। আতঙ্কিত অবস্থায় প্রিন্স জর্জ নামে একটি জাহাজ চরায় আটকে গেলে বিপত্তি ঘটে। আটকে পরা ইউরোপীয়দের মধ্যে ছিলো হলওয়েল। ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়েছে মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে। কোলকাতার চূড়ান্ত পতন ঘটে ২০-জুন বিকেল ৪ টায়। কোলকাতা আলিনগর নাম ধারণ করে আলীবর্দী খানের নামানুসারে। আলিনগরের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হয় মানিক চাঁদের উপর। সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলা তখন দারুণ ভাবে খুশি। বিজয়ের আনন্দে উল্লাস প্রকাশ করে তিনি তখন ফিরে যান মুর্শিদাবাদে।

কোলকাতা পুনরুদ্ধার ও আলিনগর সন্ধি প্রসঙ্গ ঃ

কাশিমবাজার ও কোলকাতার পতনের পর সিরাজের মনোবল বেড়ে গিয়েছিলো। সিরাজের জন্যে এই সামরিক বিজয় ছিলো কাঙ্খিত। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এবিজয় চূড়ান্ত হতে পারেনি। সিরাজের অদূরদর্শীতার জন্যেই এ বিজয় চূড়ান্ত হতে পারেনি। এজন্যে সিরাজকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো। ইংরেজদের নৌযান দেশের ভেতরে প্রবেশ রুদ্ধ করতে পারলে সিরাজের বিজয় চূড়ান্ত হতে পারতো। কিন্তু, নৌযান দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপারটি রুদ্ধ করতে না পারার জন্যে চরম বিপত্তি ঘটে। সিরাজের অবশ্য ক্ষমতাও ছিলো না যে, ইংরেজদের নৌযান দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ রুদ্ধ করে। এদিকে ড্রেক কোলকাতা থেকে পিছু হটে হুগলী নদীর মোহনায় ফুলতায় গিয়ে শিবির স্থাপন করে। উপযুক্ত নৌশক্তির অভাবের জন্যে সিরাজকে চড়া মাশুল দিতে হয়েছিলো। এই নৌশক্তির অভাবজনিত কারণেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা পলায়নপর শত্রুকে তাড়িয়ে সমুদ্র বক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেননি। বাধ্য হয়েই তিনি ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদে। কোলকাতা পতনের খবর পেয়ে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ ১৭৫৬ সালের ১৫-ডিসেম্বর ফুলতায় এসে যোগ দেয় ড্রেকের বাহিনীর সঙ্গে। এ অভিযানের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিলো। লক্ষ্যটি ছিলো-কোম্পানির অবস্থান কাশিমবাজার দখলের পূর্বাবস্থায় পুনঃস্থাপনের ব্যাপারটি সমাধান করা। পাশাপাশি, এ-ও নিশ্চিত করা যে, ভবিষ্যতে যেনো প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়।

www.pathagar.com

ক্লাইভ সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে এক চিঠিতে ক্ষতিপূরণ দানের আহ্বান জানায়। জায়গা-জমি, কোম্পানির সকল অধিকার, সহায়-সম্পত্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়ে দেবার আহ্বানও জানায় ক্লাইভ। বলাবাহুল্য, ক্লাইভের এই পত্র ছিলো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণারই পূর্বাভাস। সিরাজ অবশ্য যুদ্ধ পরিহার করতে চান। সিরাজ আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব দেন এবং সে প্রস্তাব দেন কোলকাতার দেওয়ান মানিক চাঁদের মাধ্যমে। প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি সকল কিছুর শান্তিপূর্ণ সমাধান চান। কিন্তু, ক্লাইভের যুদ্ধংদেহী এবং জঙ্গি মনোভাবের কাছে সিরাজ-উ-দ্দৌলার এই শান্তি প্রস্তাব কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সিরাজ-উ-দ্দৌলা বাধ্য হলেন সামরিক পন্থা অবলম্বন করতে। কিন্তু, ক্লাইভ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি যে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না, সেটি সিরাজ ভাবতেও পারেননি। অচিরেই সিরাজের বোধোদয় ঘটলো। কোলকাতা পুনর্দখল করলো ক্লাইভ। ৭-জানুয়ারি ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ কোলকাতা পুনর্দখল করলে পাল্টে যায় প্রেক্ষাপট। ক্লাইভ কোলকাতা আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে প্রত্যয় ব্যক্ত করলো। আর এই সংকল্পের অংশ হিসেবেই ক্লাইভ ১০ জানুয়ারি নবাবের হুগলি বন্দর ধ্বংশ করে এবং লুট করে নেয়।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সিরাজ আত্মরক্ষা মূলক নীতি অবলম্বন করেন। তিনি ক্লাইভ ও ওয়াটসের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং এইমর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, কোম্পানির সবধরণের ক্ষয়-ক্ষতি তিনি পূরণ করে দেবেন। আগের মতোই বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। সিরাজ অবশ্য কতিপয় শর্ত আরোপ করেন। শর্ত হচ্ছে এই যে, কোম্পানি ও সুবার মধ্যে খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টির হোতা ড্রেককে এদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ক্লাইভ সিরাজের এই শর্ত মেনে নিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে, ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি ও সুবার মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি ইতিহাসে 'আলিনগর সন্ধি' নামে পরিচিত। চুক্তিগুলোর ধারা ছিলো যথাক্রমেঃ (১) ১৭১৭ সালের বাদশাহী ফরমান বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ফরমান বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে কোলকাতার পার্শ্ববর্তী আটত্রিশ মৌজা কোম্পানিকে হস্তান্তরিত করা (২) দস্তকভুক্ত মালামাল যাতে নবাবী চৌকিতে তল্লাসী না করা হয়, সে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (৩) কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য শুল্কমুক্ত করা (৪) কোলকাতায় টাকশাল ও দূর্গনির্মাণে বাধা না দেওয়া (৫) কোম্পানিকে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা (৬) সন্ধির মধ্যস্ততাকারীদের উপযুক্ত সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য যে, 'অলিনগর' সন্ধির মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অসম ও গ্লানিকর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এ সময় তিনি এই মর্মে খবর পান যে, আফগান অধিপতি আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লি লুণ্ঠন করছেন এবং তিনি সুবা বাংলার দিকেই এগিয়ে আসছেন। সিরাজ তখন আবদালীকে মোকাবিলা করার জন্য ভাবতে থাকলেন এবং সেজন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন করলেন। সিরাজ এটি অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন যে, একই সঙ্গে দু'দিক থেকে দুই মহা শত্রুকে মোকাবিলা খুবই দুষ্কর, বলতে গেলে অসম্ভব। এদিকে ইউরোপের সপ্তর্ষিবর্ষ যুদ্ধের খবর ক্লাইভও পেয়ে যান। এই যুদ্ধ ১৭৫৬ সাল থেকে ১৭৬৩ পর্যন্ত চলেছিল। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। 'আলিনগর সন্ধি' তাঁর জন্যে বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, এই

www.pathagar.com

চুক্তির মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ফরাসিদের সঙ্গে 'যুদ্ধ মৈত্রী' গঠনের সুযোগ হারালেন। এমনিতেই নবাবের অনেক ওমরাহই 'আলিনগর সন্ধি'র জন্যে নবাবের উপর অসন্তোষ্ট ছিলেন। কেননা এই চুক্তিতে কোলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছিল। অপরদিকে, কোম্পানি কর্তৃক হুগলী বন্দর ধ্বংসের ক্ষতি-পূরণের দাবি মেনে নেয়া হয়নি। আবার ইংরেজরাও এতে খুশি হতে পারেনি। কারণ, নবাবের কোলকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানির ক্ষতিপূরণের কথা চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও সাধারণ ইংরেজদের ক্ষতির বিষয়টি এখানে মূল্যায়িত হয়নি। এই চুক্তিতে ইউরোপীয় ও দেশীয় নাগরিকদের ক্ষতির প্রসঙ্গটি আসেনি।

ইতিহাসের নতুন মোড় ঃ ক্লাইভের চন্দন নগর বিজয় ঃ

মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের বাংলা অভিযানের একাধিক উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন ঘটানো। সিরাজ-উ-দ্দৌলার স্থলে সেখানে একজন অনুকূল তথা পুতুল নবাব বসানো। যাতে করে কোম্পানির স্বার্থ ভবিষ্যতে হুমকির মুখোমুখি না হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে-বাংলাদেশ থেকে ফরাসি প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ইংরেজরা বাণিজ্যিক বৈরিতা ছাড়াও তাঁদের প্রতি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বৈরি আচরণের বিষয়টি ভুলে যায়নি। নবাবের এই বৈরি আচরণের পিছনে ফরাসি প্ররোচনা কার্যকরী ছিলো বলেও ইংরেজদের সন্দেহ ছিলো। ইংরেজগণ সপ্তর্ষি বর্ষের যুদ্ধের সুযোগে ফরাসিদের এদেশ থেকে বিতাড়ণের ব্যপারটি বিশেষভাবে অনুভব করলো।

ক্লাইভ অবশ্য 'আলিনগর সন্ধি'র মাধ্যমেই ফরাসিদের এদেশ থেকে বিতাড়ণের পথ সৃষ্টি করে নেয়। এদিকে নবাব ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, বাংলাকে একটি কর্ণাটকে পরিণত করার সুযোগ নবাব বিদেশীদের দেবেন না। সিরাজ এ-ও ঘোষণা দেন যে, বিদেশীদের এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু, একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার দেয়া হয়নি। নবাব স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, আইনলঙ্ঘন করে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আইনলঙ্ঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তি ও সাজা পেতে হবে। নবাবের এই হুশিয়ারি উচ্চারণে ইংরেজ বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে বলে ক্লাইভ উষ্মা প্রকাশ করে। ক্লাইভ নবাবের হুশিয়ারি উচ্চারণে দমে যায়নি। নবাবের হুশিয়ারি উচ্চারণকে কোন রকম পাত্তা না দিয়ে ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ৮-মার্চ চন্দন নগরের দিকে যাত্রা করে। এমতাবস্তায়, ফরাসিগণ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কিন্তু, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ক্লাইভ চন্দন নগর অবরোধ করেন। এরই সূত্র ধরে ২২মার্চ চন্দন নগরের পতন ঘটে।

বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদঃ সিরাজের বিরুদ্ধে ক্লাইভ-মীরজাফর গোপন চুক্তিঃ

ইংরেজ কর্তৃক ফরাসিদের অধিবাস চন্দন নগর দখলের ফলে ইতিহাসের নতুন বাঁক লক্ষ্য করি আমরা। যদিও চন্দন নগর দখলকে ইতিহাসে ততোটা গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়নি। ইতিহাসে সপ্তর্ষি বর্ষ যুদ্ধ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে ইতিহাসের গতিপথও পাল্টে যায়। বিশ্বজুড়ে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিলো। বাংলায় ফরাসিদের পরাজয় বিশ্বব্যাপী ইংরেজদের বিজয়ের বড় অধ্যায় সূচিত হয়েছিলো। এ বিজয় ইংরেজদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে। ক্লাইভ

www.pathagar.com

এবিজয়কে স্থায়ী রূপ দিতে চাইলেন। আর এ জন্যে তিনি ফরাসিদের প্রতি সহানুভূতিশীল নবাবকে সরানোর জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। ইংরেজদের মধ্যে এই আশঙ্কা কার্যকর ছিলো যে, সুযোগ পেলেই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা আবার কোম্পানিকে উৎখাত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এদিকে নবাবের দরবারে জগৎশেঠভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগে একটি ষড়যন্ত্রী চক্র তৈরি হয়ে যায়। ১৭৫২ সালে আলীবর্দী সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে নবাব হিসেবে মনোনয়ন দিলে চক্রী মহলটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই চক্র শওকতজং এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। সিরাজ-উ-দ্দৌলা মসনদে আরোহণ করেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে রদবদল করেন। যেমন সেনানায়কের পদথেকে মীরজাফরকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং বক্শি বা সেনানায়কের দায়িত্ব অর্পিত হয় মীর মদনের উপর। রায়দুর্লভকে রাজস্বও সমরশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। মোহনলাল সে পদে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়া সিংহাসনে আরোহণের আগে ও পরে জগৎশেঠকে সিরাজ-উ-দ্দৌলা বেশ কয়েকবার তিরস্কার ও ভৎর্সনা করেছিলেন। একজন পদস্থব্যক্তি তথা প্রভাবশালী আমীর হিসেবে এটি জগৎশেঠের অহমবোধকে আহত করে। তিনি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং ভবিষ্যতে সিরাজকে বাগে পেলে সমুচিত শিক্ষা দেবার সংকল্প আঁটেন। রায়দুর্লভও নিজের পদ হারিয়ে ক্ষিপ্ত হন এবং সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে এবং নবাবের কারণে ইংরেজগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ইংরেজগন বিশেষতঃ ইংরেজ বেনিয়া শ্রেণী নবাবের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফেটে পড়েন। নবাবকে তাঁরা পথের কাঁটা এবং এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। নবাবের বিরুদ্ধে তাদের যে মনোভাব, সে মনোভাবের জন্যে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে।

নবাবের দরবারেও নবাব বিরোধী একটি চক্র শক্তিশালী হতে থাকে। ক্লাইভ এ ব্যাপারে দরবারের লোকদের প্ররোচিত করতে থাকেন। তাছাড়া, দেশের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুঁজি করে ক্লাইভ নিজের আখের গোছাতে এবং নবাবের সর্বনাশ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। নবাবের বিরুদ্ধে থাকা সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ক্লাইভ কাজে লাগাতে থাকেন এবং এই বিরুদ্ধ শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও ক্লাইভ অক্লান্ত প্রয়াস চালান। এই ক্লাইভ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার জন্যে চরম হুমকির কারণ হয়ে দাড়ায়। নবাবকে উৎখাত করার জন্যে বিভিন্নভাবে নীল নক্শা প্রণয়ন করতে থাকে কোলকাতা কাউন্সিল। ক্লাইভ ছিলেন এই কোলকাতা কাউন্সিলের হোতা ও স্থপতি।

সিরাজকে উৎখাত করার জন্যে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের হেন ফাঁদ নেই, যা পাতেননি। সিরাজকে উৎখাতের প্রয়োজনে সামরিক নেতা ইয়ার লতিফ খানকে মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু জগৎশেঠের পরামর্শে এই মনোনয়ন পাল্টে যায়। ইয়ার লতিফখানের পরিবর্তে মীরজাফরকে মনোনয়ন দেয়া হয় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্যে। এই ষড়যন্ত্রীদের সংখ্যা একেবারে কম ছিলো না। ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে আরো যারা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেঃ রায়দুর্লভ, খাদেম হোসেন খান, মির্জা আমির বেগ প্রমুখ।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য যে, ষড়যন্ত্রীদের নেতা ছিলেন জগৎশেঠ। ১ম থেকে প্রায় ১ মাস ধরে ষড়যন্ত্রীদের দফায় দফায় বৈঠক হয়। কোলকাতা কাউন্সিলও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দরবারের ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে সিরাজ উৎখাতের জন্যে পরিকল্পিত আলোচনা করা হয়। এতে সিরাজ উৎখাতের নানা অপকৌশল প্রয়োগের ব্যাপারটিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, এবং ১৭৫৭ সালের ৪ জুন কোলকাতা কাউন্সিলের পক্ষে ওয়াট্স ও নবাব দরবারের ষড়যন্ত্রীদের পক্ষে মীর জাফরের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ষড়যন্ত্র আরো দানাবেঁধে ওঠে। কোলকাতা কাউন্সিল এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে উৎখাত করার পর মীরজাফরকে মসনদে বসানো হবে এবং তাকে নবাবী রক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি সবদিক থেকে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কোম্পানি এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ করেঃ

১। উভয়পক্ষ ৯ ফেব্রুয়ারির আলিনগর চুক্তি পালন করবে।
২। ইংরেজদের কাছে সমুদয় সম্পত্তিসহ ফরাসিদের সমর্পণ করা হবে।
৩। কোম্পানির সকল শত্রুকে নবাবের শত্রু বলে বিবেচনা করতে হবে। সে শত্রু এশিয়ই হোক আর ইউরোপীয়ই হোক। নবাব ভবিষ্যতে নবাবের জন্যে কোম্পানির সামরিক সাহায্য চাইলে নবাবকে এর তাবৎখরচ বহন করতে হবে।
৪। সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কোলকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানির যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন এক কোটি টাকা, ইউরোপীয়দের প্রাইভেট ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লাখ টাকা নগরীর বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের তথা হিন্দু-মুসলমান আর্মেনীয় অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৭ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হবে।
৫। কোলকাতার আশেপাশের জমিদারিসমূহ এবং কোলকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর কোম্পানিকে জমিদারিস্বত্ব প্রদান করতে হবে।
৬। ভবিষ্যতে হুগলীর ভাটিতে কোনো নবাবী দুর্গ স্থাপন করা যাবেনা।

পলাশীর প্রান্তর ঃ দুর্যোগের ঘনঘটা ঃ

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল যুদ্ধবাজরাই আগ্রাসনের জন্যে নানা অজুহাত প্রদর্শন করে থাকে। ক্লাইভও তা-ই করেছিলে। ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি মেনে চলেনি। আগ্রাসনের অজুহাত প্রদর্শন করে ক্লাইভ ষড়যন্ত্র চুক্তি করে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে এই মর্মে অভিহিত করে যে, তার পক্ষে আলিনগরের সন্ধি মেনে চলা সম্ভব নয়। আর তাই সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া কোম্পানির জন্যে কোনো পথ খোলা নেই। ক্লাইভের বাহিনী মূর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হলো ১২ জুন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার বাহিনীও কোম্পানীর অগ্রগতি রোধ করার জন্যে অগ্রসর হতে থাকে। পলাশীতে দুই বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়। নবাবের ছিলো ১৫,০০০ অশ্বারোহী, ৩৪,০০০ পদাতিক সৈন্য আর কামান ৪০টি। অন্যদিকে, ক্লাইভের অধীনে ছিলো মাত্র ২,৩০০ ইউরোপীয় ও দেশী সৈন্য এবং ৮টি কামান। এর আগে স্থলযুদ্ধে ইউরোপীয়গণ কোনোভাবেই ভারতীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে নিজেদের প্রমাণিত করতে

www.pathagar.com

পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই ২৩-জুন বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে বিকেল ৪টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সেনা বাহিনীর অধিকাংশই যুদ্ধের ময়দানে নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি সৈন্যগণও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সিরাজ-উ-দ্দৌলা বিহারে অবস্থানরত অনুগত রামনারায়ণের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। এজন্যে তিনি পাটনার উদ্দেশ্যে সপরিবারে গোপন অভিযাত্রা করলেন। কিন্তু বিধি বাম! পথিমধ্যে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে গেলেন এবং ২-জুলাই ১৭৫৭ সালে তিনি নিহত হন। আর এর মধ্য দিয়ে অর্ধশতাব্দির নবাবি যুগও শেষ ঘন্টা বাজিয়ে নিজের বিদায় ঘোষণা করে।

পলাশীর যুদ্ধের মূল্যায়নঃ

পলাশীর যুদ্ধ নামে অভিহিত যে ঘটনাকে আমরা যুদ্ধ বলে অভিহিত করি, সে যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ কি-না, তা নিয়েও অনেক বিতর্ক রয়েছে। পলাশীতে যুদ্ধ হবে জেনেও ক্লাইভ সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেনি। পলাশীতে সামরিক মহড়ার মাধ্যমে নবাবের পদ থেকে একজন সরে যাবেন, অন্য একজন নবাব পদে আসিন হবে, মূলতঃ এই ছিলো ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা। বলাবাহুল্য, সেই নীলনক্সাই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছিলো। ১৬৮৬ সাল থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন এ্যাংলো-মোগল থেকে আরম্ভ করে পলাশী পযর্ন্ত ঘটনাসমূহ অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে। উইলিয়াম হেজেজ এবং জব চার্নক সবার আগে এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্যের স্বপ্ন দেখেন। রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য না থাকলেও কোম্পানির লোকজন ছিলো আত্মস্বার্থ-সর্বস্ব। তারা মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মতো বাংলার উপকূল অঞ্চলে একটি সার্বভৌম সুরক্ষিত বসতি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যায়। কোম্পানি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে চার বছর ধরে যুদ্ধ করে। অবশেষে কোনো ভাবে সুবিধা করতে না পেরে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। সরকার তাদের বসতি স্থাপনের সুযোগ দেন এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। অবস্থা দৃষ্টে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে মুনাফা অর্জন করেছিলো বলেই কোনোভাবেই সেই মুনাফা হারাতে রাজী ছিলো না। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারে পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করা সঙ্গত হবে যে, নৌশক্তি নির্মাণে সরকারের অনীহা আমাদের মধ্যে রহস্যের সৃষ্টি করে। আর একটি ব্যাপারে প্রশ্নের উদ্রেক করে সেটি হলোঃ তিনটি গ্রামের জমিদারিস্বত্ব প্রদান করার পিছনে সরকারের কী উদ্দেশ্য বা লাভ কার্যকরী ছিলো। যে তথ্যটি বলার সেটি হচ্ছেঃ সুবাদার আজিম-উশ-শান কিছু নগদ পেশকাশ লাভ করেছিলেন। পেশকাশের বিনিময়ে একটি বিদেশি শক্তিকে আঞ্চলিক অধিকার ছেড়ে দেওয়া সর্বোপরি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রদানের মধ্যে নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও পশ্চাদপদতার পরিচয়। মনে রাখতে হবে যে, পার্শ্ববর্তী চীন এবং ব্রহ্মদেশেও ইউরোপীয়গণ দেশের মধ্যে বসতি স্থাপন করে বস-বাস করার অধিকার পায়নি। পেশকাশের বিনিময়ে সম্রাট ফররুখশীয়র ইংরেজদের বিস্তীর্ণ এলাকার ভূ-স্বত্ব প্রদানসহ কতিপয় অধিকার প্রদান করেন। এর ফলে আঘাত হানা হয় সার্বভৌমত্বের উপর। ইংরেজ ও সরকারের মধ্যে এ ভাবেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

www.pathagar.com

মোগল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থেকেও বাংলার নবাবগণ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ সাধন করেছিলেন। রাষ্ট্রের অগ্রগণ্য পেশাজীবীদের নিয়ে সুজাউদ্দিন খান একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছিলেন। ঐ পরিষদ আলিবর্দী খানের সময় সম্প্রসারিত হয়। মুর্শিদকুলী খান ও পরবর্তী নবাবগণ ফররুখশীয়রের ফরমান (১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাস্তবায়ন করেননি। অবশ্য কোম্পানির প্রচন্ড চাপ ছিলো। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার চিন্তায় সিরাজ-উ-দ্দৌলা ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। বাংলায় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থানকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, যে অশুভ শক্তির উত্থান দেখেছেন-সেভাবে আর কেউ দেখেননি। কোনো নবাবই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানকে বাংলার স্বাধীনতার জন্যে হুমকি হিসেবে দেখেননি। নবাবীর শুরুতেই তিনি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিকে জানিয়ে দেন যে, এদেশে ব্যবসা করতে হলে কোম্পানিকে আইনের অধীনে আসতে হবে। কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। সিরাজ-উ-দ্দৌলা প্রথমেই যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। কিন্তু, কোম্পানি শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়নি বলেই সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সামরিক পথে অগ্রসর হতে হয়েছিলো। কিন্তু, এই সামরিক পন্থা অবলম্বন করে সিরাজ-উ-দ্দৌলা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর দোদুল্যমানতাও অনেকাংশে দায়ী। বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশও সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের জন্যে দায়ী। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তখন ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিরা যুদ্ধরত, বাস্তব অবস্থার করণেই নবাবের পক্ষে ফরাসি সাহায্য লাভ কঠিন ছিলো না। কিন্তু ইংরেজগণ ফরাসি অধ্যুসিত চন্দননগর আক্রমণ করলে নবাব নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। অথচ নবাব আগেই কোম্পানিকে যুদ্ধবিগ্রহ না করার জন্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু হুশিয়ারি উপেক্ষা করে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করার পর নবাবের নিরপেক্ষতা ফরাসিদের কাঙ্খিত ছিলো না। অথচ নবাব তাই করলেন। ফরাসিরা আশা করেছিলেন যে, ইংরেজগণ চন্দননগর আক্রমণ করার পর নবাব যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ফরাসিদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ ভিন্নতর হতে পারতো। কিন্তু নবাবই সে পথ রূদ্ধ করে দিলেন। ইংরেজগণ ফরাসিদের পরাজিত বা বন্দি করলে প্রেক্ষাপট নবাবের বিরুদ্ধে চলে যায়। একা হয়ে যান নবাব। নবাবকে উৎখাত করাও তখন সহজ হয়ে যায়।

এদিকে, সিংহাসনে আরোহণ করেই সিরাজ অভ্যন্তরিণ প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করেন। মীরজাফরসহ সকল সন্দেহভাজন উচ্চাভিলাষী আমীরদের তিনি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন। এটি ছিলো সিরাজের জন্যে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু নবাব এই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেননি। কুচক্রীগণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত করে। কুচক্রীদের চাপে সন্দেহভাজন উচ্চাভিলাষী আমীরদের আবার তিনি স্বস্ব পদে পুনর্বহাল করেন। এটি ছিলো নবাবের জন্যে ভুল ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অথচ দূরদর্শী শাসক হিসেবে নবাবের উচিত ছিলো এই সন্দেহভাজনদের আটক করে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া। নবাব তা নাকরে তাদের দিলেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে ষড়যন্ত্রও সহজে দানা বাঁধবার সুযোগ পেয়ে যায়। এদিকে, নবাব অনুভব করলেন

www.pathagar.com

আহমদ শাহ আবদালীর আসন্ন হামলার। এই হামলার আশঙ্কা থেকে তিনি তাঁর একান্ত অনুগত ও দক্ষ সৈনিক, লড়াকু রামনারায়নের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং চৌকশ অংশকে পাটনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পলাশীর প্রান্তর যুদ্ধের প্রান্তর না হয়ে প্রহসনে পরিণত হলো। জয়ী হলেন ক্লাইভ। বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। যে কোনো বিচারেই সিরাজ-উ-দৌল্লা যোগ্য সাহসী বীর। তিনি ইংরেজদের বিভিন্ন সময়ে রুখেদাঁড়িয়েছেন, শায়েস্তা করেছেন। পাশাপাশি শওকতজংকেও রুখেদাড়িয়েছেন। তাঁর সামরিক দক্ষতাও প্রমাণিত। কিন্তু তিনি তাঁর বিচক্ষণতা ও পরিকল্পনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাননি। শাসকোচিত রূঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শত্রু জেনেও শত্রুকে ঘায়েল করেননি। এ জন্য নবাবকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিলো প্রাণ দিয়ে এবং সিংহাসন দিয়ে। তাঁর সামরিক দক্ষতাকে তিনি বিচক্ষণতা দিয়ে ধরে রাখতে পারেননি। তিনি হয়ে পড়লেন নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি অযোগ্য, চরিত্রহীন, অত্যাচারী, জিঘাংসু, নিষ্ঠুর, মদকাসক্ত-এটি ঠিক নয়। নবাবকে উৎখাত করার নৈতিক ভিত্তি রচনা করার জন্যেই নবাব সিরাজ-উ-দৌল্লা সম্পর্কে এহেন উক্তি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সিরাজ-উ-দৌল্লা অসম সাহসী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু মাঝে-মধ্যে ভাবাবেগে তাড়িত হওয়ায় তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা কখনো কখনো ক্ষুন্ন হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। এ সম্পর্কে C.B Malleson মন্তব্য করেন-সিরাজ-উ-দৌল্লা যা-ই দোষ ত্রুটি করে থাকুক না কেন, তিনি মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, দেশকে বিকিয়ে দেননি। পলাশীর ঐ বিয়োগান্তক নাটকে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ যিনি কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিতে চাননি। আলিবর্দী খান সিরাজের যোগ্যতা যাচাই করেই মসনদের জন্য তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু সময় তাঁর বিরুদ্ধে গেল। মাত্র চৌদ্দ মাসের নবাবি জীবনে তেইশ বছরের এই হতভাগ্য যুবককে এককভাবে এবং একাধারে লড়তে হয়েছে ঘরের শত্রু শওকতজং এর সঙ্গে, দরবারের শত্রু জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ চক্রের বিরুদ্ধে এবং বহিঃশত্রু ইংরেজের সঙ্গে। হতভাগ্য থেকে গেলেন তিনি মৃত্যুর পরও। ইংরেজ ও ইংরেজপন্থীরা শতাধিক বছর যাবৎ তাঁর চরিত্রের উপর কাল্পনিক কলঙ্ক লেপন করেছে পলাশী ঘটনাকে যৌক্তিক বলে দেখানোর জন্য'।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল ঃ

পলাশীর যুদ্ধ আসলে যুদ্ধ নয়। এটি আসলে পাতানো খেলা। এর মাধ্যমে তাই নবাবের পতনও সহজ হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এর আগে সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দী দু'জনেই সিংহাসন লাভ করেছিলেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজগণ যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলো, তা-ও অভিনব কিংবা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির পোয়াবারো হলো। ১৭১৭ সালের ফরমান ও আলিনগর সন্ধির (৯ ফেব্রুয়ারি'১৭৫৭) মধ্যে যে অধিকারের স্বীকৃতি ছিলো, পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি সেটিই লাভ করেছিলো। কেবলমাত্র সিংহাসনে নতুন

www.pathagar.com

লোক বসলো। সিরাজ-উ-দৌল্লার জায়গায় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। দিল্লীর বাদশাহও এ পরিবর্তন চটজলদি অনুমোদন করেছিলেন। এর নায়ক রবার্ট ক্লাইভকেও সাবুদ জং (রনে পরাক্রম) উপাধি দিয়ে সম্মানিত ও সম্বর্ধিত করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধ পাতানো হলেও এর ফলাফল ছিলো সুদূর প্রসারী। এই সুদূর প্রসারী প্রভাবের কারণেই পলাশী যুদ্ধের অধিক গুরুত্ব। পলাশী যুদ্ধের দু'টি ফলাফলকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এর একটি হচ্ছে অব্যবহিত ফলাফলও অপরটি সুদূর প্রসারী ফলাফল।

পলাশীর যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ

রাজনৈতিক অস্থিরতা পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত ফল। পলাশী যুদ্ধের ফলে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিলো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটিই ছিলো স্বাভাবিক। পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে নবাবি পরিবর্তনের কোম্পানির দূরভিসন্ধি ছিলো। মুর্শিদাবাদ দরবার রাজনীতিতেও দলাদলি স্পষ্ট ছিলো। স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হলো একটি দ্বন্দ্বময় রাজনৈতিক সম্পর্ক। এটি পলাশীর মতো একটি ঘটনার মাধ্যমেই নিরসন হওয়ার মতো নয়। মীরজাফরের মাধ্যমে কোম্পানি তার স্বার্থ হাসিল করেছে। মীরজাফরের উপর কোম্পানির দাবিরও শেষ ছিলো না। দাবি মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় মীর জাফরও উৎখাত হয়। মীর জাফরের পর নবাব হলেন মীর কাশিম (১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)। মেদেনিপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম-এই তিনটি জেলা ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে তিনি নবাব হন। কিন্তু, মীর কাশিমও বেশি দিন থাকতে পারেননি। তিনিও এক পর্যায়ে উৎখাত হন। সিংহাসনে বসানো হলো পুনরায় মীরজাফরকে। এভাবে সিংহাসনে পালাবদল ঘটেছে ফরাসি থেকে দিউয়ানি পর্যন্ত। কোম্পানির পরিকল্পনায়ই প্রতিবার বদল ঘটেছিলো সিংহাসন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলার উপর এর প্রভাব পড়েছে। প্রশাসন ও সমাজ জীবনের উপর স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিলো অরাজকতা।

পলাশীর যুদ্ধ ও লুণ্ঠনযজ্ঞ ঃ

পলাশীর সাজানো নাটক সমাপ্তির পরপরই মীরজাফর চুক্তি মোতাবেক সুবা বাংলার সিংহাসন লাভ করতে পারেনি। জুন মাসের ২৯ তারিখে ক্লাইভ এসে তাঁকে মসনদে বসিয়ে দিয়েছিলো। অর্থাৎ মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলো পলাশী যুদ্ধের ছ'দিন পর। অন্তর্বর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মুর্শিদাবাদে অবাধে লুটপাট ও লুণ্ঠন চলে। সুযোগ-সন্ধানীরা শহরে লুটপাট করে। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ হারেম ও রাজ-কোষাগারে লুটপাট চালায় ক্লাইভ ও তাঁর মিত্রবাহিনী। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে এই লুণ্ঠনযজ্ঞের জন্যে রবার্ট ক্লাইভকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিলো।

www.pathagar.com

নবাবী আমল

বাংলার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নবাবী আমলের আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। অনেক ধরণের বাস্তবতা পাড়ি দিতে হয়েছে এই নবাবী আমলকে। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দ বাঙলার নবাবি আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা এ সালেই ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিকসহ অন্যান্য ইউনিটগুলো শক্তিশালী করা হয়েছিলো সেগুলো স্থানান্তরের কারণে একেবারেই নেতিয়ে পড়েছিলো। অবশ্য হুটকরে একাজটি সম্পন্ন হয়নি। দিল্লিসম্রাট ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরমান জারী করেন যে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে প্রধান কার্যালয় পাটনায় সরিয়ে নিতে হবে।

এখানে মুর্শিদকুলী সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। তিনি দাক্ষিণাত্য-নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র। বালকাবস্থায় ছিলেন আশ্রয়হীন। ইস্পাহান নগরের বণিক হাজী সফি তাঁকে কিনে নেন ও স্বদেশে নিয়ে এসে নাম রাখেন মুহাম্মদ হাদী। বালক হাদীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধায় মুগ্ধ হয়ে হাজীসাহেব তাঁকে দাসহিসেবে নিয়োজিত না করে নিজেরসন্তানের মতো লালন পালন ও শিক্ষাদান করেন। আশ্রয়দাতা ও শিক্ষক বৃদ্ধাবস্থায় মারাযান। করুণ হৃদয় নিয়ে বালক হাদী নিজদেশ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে বেরারের দিওয়ান হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে রাজস্ব বিভাগে সামান্য বেতনে একটি চাকুরী জুটিয়েনেন। এরই মধ্যে হায়দরাবাদের দিওয়ানের পদটি শূণ্য হলে, তিনি শূণ্য পদে যোগদেন, এবং কার্যক্ষেত্রে প্রখর কর্মকৌশল এবং সকল কাজে পারদর্শীতা প্রমাণ করেন। বিভিন্ন কৌশলে তিনি আওরঙ্গজেবের দরবারে বহুলভাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ফলে, বাদশাহ্ তাঁকে সেনানায়কত্ব(মসনবী) প্রদান করেন ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে। নতুন মসনবদার নিজেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রকাশ করলেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন হলেন। ইতোমধ্যে জিয়াউল্লাহ খাঁ পদচ্যুত হলেন। তাঁর স্থলে মুহাম্মদ হাদী দিওয়ান নিযুক্ত হলেন, বাদশাহ তাঁর নাম দিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ এবং তিনি হলেন সুবে বাঙলার নাজিম ও দিওয়ান।

মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর বিশ্বস্থ অনুচরসহ দাক্ষিণাত্য থেকে ঢাকায় এসে পৌছালেন। বাঙলার রাজধানী তখন সুজলা-সুফলা উৎপাদিকা শক্তিতে অতুলনীয়। খাঁর জন্য এটা একটা সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রসাদলাভও বটে। তবে মুর্শিদকুলী খাঁ লক্ষ্য করলেন ঢাকার সবকিছুই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত। রাজকোষে উপযুক্ত অর্থ নেই, অনাচারের কারণে মোঘল শাসনের প্রথম থেকেই বাংলার সৈন্যসামন্তদের ভরণপোষণের জন্য অন্যসুত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ ছিলো জরুরী। মুর্শিদকুলী খাঁ আওরঙ্গজেবের নির্দেশে রাজস্ব সেরেস্তার আমূল সংশোধনে সক্ষম হলেন। এদিকে আজিমুশ্বান মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে লেগে গেলেন। অবশ্য তিনি যাতে সম্রাটের বিরাগভাজন না হন, সেদিকে খেয়াল রেখে মুর্শিদ কুলী খাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কিছু বলেননি।

মুর্শিদকুলী খাঁ নিজগুণে বাদশাহের আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। সুঅভিজ্ঞ রাজস্ব, সামরিক এবং নতুন জমিদার নিয়োগের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ কৃতিত্ব

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে সফলকাম হওয়ার কারণে তিনি অচিরেই সুনাম কুড়িয়ে ছিলেন। তিনি জমির উর্বরা শক্তিবৃদ্ধি, রাজকর বেঁধেদেয়া, বাণিজ্য শুল্কের একটি পরিপূর্ণ বিবরণী বাদশাহের দরবারে পাঠিয়ে জানালেন যে, উড়িষ্যা অঞ্চলে অল্প জমির স্বল্প আয়, রাজস্ব আদায় কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য বিধায়, বঙ্গের জায়গিরদারগণের সমস্ত জায়গির উড়িষ্যায় পরিবর্তন করা হলে রাজ্যের সুবিধে হয়। বাদশাহ সেভাবেই প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে বাংলায় নিজামতের ও দিওয়ানের বাদশাহী প্রধান সেনাপতি অধিনস্তদের জায়গা থাকলে এই বন্দোবস্তের ফলে উড়িষ্যা বেশি পরিমাণ ভূমিপ্রাপ্ত হলো এবং তাদের নিজনিজ অধিকারে শান্তিস্থাপন ও আয়বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকলো। এদিকে বাংলার উদ্ধত জায়গিরদারদের হাত থেকে প্রজাসাধারণ উপকৃত হলো ।

রাজকর সংগ্রহ দিওয়ান নিজহাতে রাখলেন। এতে করে সুবিশাল বাংলার আয় এক বছরে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। দিওয়ানের কর্মপারদর্শিতায় বাদশাহ্ উত্তরোত্তর খুশী হলেন। কিন্তু যুবরাজ আজিমুশ্বান ঈর্ষাকাতর হলেন। তিনি ফন্দি আটতে লাগলেন কিভাবে দিওয়ানকে বিনাশ করা যায়। অবশ্য মুর্শিদকুলী খাঁ নিজে তাঁর প্রতিপক্ষের প্রতি সর্বদা নজর রাখতেন, তাছাড়াও বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি বা চরের মাধ্যমে খোঁজখবর সংগ্রহ করতেন। এতেকরে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কুলী খাঁ ছিলেন সম্রাটের আস্থাভাজন। ফলে তিনি দিওয়ান, কানুনগো, রাজকর্মচারিগণের সাথে পরামর্শ করে নিরাপদস্থান হিসেবে বেছে নিলেন মুখসুদাবাদকে পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদকে। এদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব যুবরাজ আজিমুশ্বানের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁকে বিহার প্রদেশে অবস্থানের আদেশ জারী করলেন। আজিমুশ্বান বিহার নাগিয়ে পাটনায় অবস্থান করলেন এবং একটি দূর্গ নির্মাণ করে পাটনার নাম রাখলেন আজিমাবাদ।

মুর্শিদকুলী খাঁ একজন যোগ্যনেতা ছিলেন বটে। তিনি বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করে মুর্শিদাবাদে একটি টাকশাল নির্মাণ করতঃ মুদ্রাজারী করেন। জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁকে নায়েব-এ-দিওয়ান করে উড়িষ্যা পাঠালেন। এসময় মেদিনীপুর উড়িষ্যার সাথে সংযুক্ত ছিলো। এটি বাংলার সাথে একিভূত করা হলো। এর ফলে সমগ্র বাংলা মুর্শিদকুলী খাঁর হস্তগত হলে বাংলার জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো। নবাব কুলী খাঁও নবউদ্যমে সুব্যবস্থা প্রণয়নে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি বিশ্বস্ত হিন্দু আমিলদার নিযুক্ত করে তাঁদের মাধ্যমে বিশেষ তদন্তকার্য সম্পাদন করিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। চাকলায় রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োজিত করলেন। দিওয়ান স্বয়ং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করতেন। এদিকে এলাহাবাদ হতে ভূপতি রায় ও কিশোর রায়কে যথাক্রমে নিজ সহকারী ও মুন্সি পদে নিয়োগদান করলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রাপ্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন রাজকীয় কাজে, এতে করে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর বিশ্বস্থ কানুনগো দর্পনারায়ণ ছিলেন সর্ববিষয়ে হিতকারী পরামর্শদাতা এবং বাংলার একজন অভিজ্ঞ রাজস্ব আমলা। মুর্শিদকুলী খাঁর সুবিন্যস্ত রাজস্ব নীতির ফলে, রাজস্ব খাতে প্রভূত উন্নতির কারণে কেন্দ্রের রাজস্বের সম্যক উন্নতি হতে লাগলো।

www.pathagar.com

বাংলার রাজস্ব উন্নয়ন, সুব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে বাদশাহর দরবার হতে তিনি "মোতোমন-উল-মূল্‌ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসিরজঙ্গ মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি পেলেন, সাথে সাতহাজারী মস্‌নবী"।

২১ ফেব্রুয়রি ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ বাদশাহ আওরঙ্গজেব ৯২ বৎসর বয়সে উপনীত হলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র ভারত তাঁর করতলগত হোক। তিনি সে চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বাগে আনতে সক্ষম হননি। বাদশাহ ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসে আল্লাহর দরবারে শুক্রবার দিন তাঁর মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা জানালেন। পরম করুণাময় তাঁর আরজ মঞ্জুর করেছিলেন এবং এবছরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথানুসারে মুর্শিদকুলী খাঁকে আবার দিল্লির মসনদ থেকে সুবাদারী ফরমান সংগ্রহ করে বাংলায় ফিরে আসতে হয়েছিলো।

বাংলার নবাবের আসনে আসীন মুর্শিদকুলী খাঁ। শুধু মুসলমান নয়, তাঁর দরবারে হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে সকল গুণবানদের যথেষ্ট সমাদর ছিলো। উপযুক্ত হিন্দুদেরকে তিনি উপযুক্ত পদে আসীন করতে কখনও কার্পণ্য করেননি। স্বনামধন্য ভূপতিরায়, কিশোররায় এবং পুঠিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর, নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনরায় অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁর কৃপালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য মুর্শিদকুলী খাঁর বদান্যতার কথা জানতেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন খুবই মেধাবী ও সুপুরুষ। এদিকে আর এক শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ভাগ্যঅন্বেষণে বেরহয়ে বন্ধু ও সহচরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের সাথে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে নবাবের দরবার মুর্শিদাবাদে গমন করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীই গোলকপুর, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বগুড়া শহর থেকে দু'মাইল দূরে পশ্চিম দিকে চাকোন্ডা গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য পুত্রপরিজন নিয়ে বসবাস করতেন। সুদর্শন, উন্নতচরিত্রের অধিকারী, সুশিক্ষিত বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক তাই ছিলেন। সবদিক থেকেই চৌকস ছিলেন। ফলে চাকোন্ডা গ্রাম নিবাসী নিয়োগী বংশোদ্ভূত এক জমিদারের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হন। জমিদার তাঁকে কথিত চাকোন্ডা গ্রামেরই কিছু জমি ব্রহ্মক্ষত্রস্বরূপ দান করেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের মুর্শিদাবাদ যাত্রার কারণ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তা হলো, "শোলবর্ষ" পরগণা বগুড়া জেলার অর্ন্তগত জনৈক মুসলমান ভূমধ্যাধিকারীর শাসনাধীন ছিলো। এক মুসলমান বিধবা রমণী এই পরগণার অন্যতম অংশভাগিনী ছিলেন। উক্তবিধবা শরীকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন ঝাকর এলাকাটি ঝাকর নিবাসী কুমারসিংহ নামক এক ব্যক্তির নিকট কিছুদিনের জন্য ইজারাবন্দোবস্ত দেন। কুমারসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করে বিধবার সম্পত্তির সবটুকু আত্মসাৎ করে।

মুসলমান বিধবারমণী কুমারসিংহের অসৎ অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বিপন্নাবস্থায় সদাশয় ও ধার্মিক শ্রীকৃষ্ণআচার্যের শরণাপন্ন হলেন। দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীকৃষ্ণআচার্যও বিধবার প্রতি কুমারসিংহের অনাচার দূরকরার স্বার্থে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ রাজদরবারে

www.pathagar.com

নালিশ নিয়ে গমন করেন। পথে যেতে তিনি অপর ভাগ্য অন্বেষণী শ্রীকৃষ্ণচৌধুরী সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ পৌঁছান। উভয় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সৌভাগ্যের বরপুত্র। অচিরেই তারা নবাবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভকরেন। দরবারে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপায়। শ্রীকৃষ্ণআচার্য মুসলমান বিধবার কার্য্যোদ্ধার করতে সমর্থহন। নবাব সৈন্য কুমারসিংহকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলো। এ সময়ে সেই বিধবার মৃত্যুর সংবাদ তার কর্ণগোচর হয়। সুচতুর শ্রীকৃষ্ণআচার্য এ সুযোগ উপেক্ষা না করে অমাত্য রঘুনন্দরায়ের সাহচর্যে উত্তরাধিকারীবিহীন তরফ ঝাকরের সম্পত্তি নিজ নামে বন্দোবস্ত নিয়ে নবাবী সৈন্যসহ কুমারসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকরেন। আর এদিকে কুমার নবাবী ফৌজের কথা শোনা মাত্রই ঝাকর পরিত্যাগ করে অন্যত্র পলায়ন করেন। ভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণআচার্য কুমারসিংহের পরিত্যক্ত-বাড়ি সম্পত্তি ও বিধবার সম্পত্তি হস্তগত করে সেখানে নিরাপদে বাস করতে থাকেন। জানাযায়, কুমারসিংহের সেই বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছেন।

আবুলফজল বিরচিত সুবিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আলাপসিংহ পরগনাকে 'আলেপসাহি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুবিস্তৃত এ পরগনা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জরিপ নকসায় ৩,২৬,৫৫৬ একর, ২ রোড, ১১ পোল জমি, ৬০১ খানি গ্রাম এবং পরিমানফল ৫১,০২৪ বর্গমাইল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোগলসম্রাট মহামতি আকবরের রাজত্বকালে মোগলমারীর যুদ্ধেরপর ইতিহাসখ্যাত বাংলার 'বারভূঁইয়া'গণ কিছুদিনের জন্য নিজনিজ এলাকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান বংশের আদিপুরুষ তাদের অন্যতম। তিনি 'মসনদ-ই-আলী' উপাধি গ্রহণ করে আলেপসাহি, মমিনসাহি ও হোসেনসাহিসহ বাইশটি পরগণায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বিয়োগের পর এ রাজ্য বিভিন্ন জমিদারদের করতলগত হয়। 'টিকরা' গ্রাম নিবাসী জনৈক মেন্দিশেখ আলেপসাহি মমিনসাহি পরগণাপ্রাপ্ত হন। ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর সময়ে বন্দোবস্তগত কারণে আলেপসাহি পরগণাটি ঘোড়াঘাট চাকলার অন্তর্গতহয়। কথিত বন্দোবস্তের ফলে এই পরগণার ছয় আনার মালিক হন পুঠিদাণা নিবাসী রামচন্দ্ররায় ও ভবানীদেবরায় এবং দশ আনার মালিক হন লোরিয়া গ্রাম নিবাসী বিনোদরাম চন্দ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে আলেপসাহি পরগণার উল্লেখিত মালিক যখন নবাব দরবারে রাজস্ব প্রেরণ কালে রাস্তার মধ্যে তা দস্যুগণকর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হলে জমিদারগণ নবাবদরবারে অমানুষিক উৎপীড়নের শিকার হতেন সেই ভয়ে কথিত ব্যক্তিবর্গ যুগপৎ আলেপসাহি পরগণার স্বত্বত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। জমিদারদের উপর এই অত্যাচারের, যথাযথ বর্ণনা করেছেনঃ"One Nazir Ahamed is said to have subjected the Zamindars to every kind of torture when their rent fell in to arrears."

শ্রীকৃষ্ণআচার্য ছিলেন উন্নতর ও মননশীল কৃতবিদ্যযুবক। তারুণ্যের টগবগে প্রবাহছিলো তাঁর ধমনিতে। ভারতভূমির উন্নতিরকেন্দ্রসমুহ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। নবাব দরবারেও তিনি প্রভাবসৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণআচার্য মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। সুযোগ উপেক্ষা না করে তিনি উক্ত

www.pathagar.com

পরগণা লাভে বিশেষ যত্নবান হন। এজন্যে তিনি কূটকৌশলও প্রয়োগ করেন। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে নবাব তদন্তের জন্য কানুনগো গঙ্গারামরায়কে আলেপসাহি প্রেরণ করেন। সুচতুর শ্রীকৃষ্ণআচার্য রায়মহাশয়কে তার কাঙ্খিত এলাকাসহ কয়েকটিমহালের স্বত্বপ্রদান প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে তদন্তপ্রতিবেদন তাঁর অনুকূলে দিতে বাধ্যকরেন। সে অনুযায়ী রায়মহাশয় 'পরগণে আলেপসাহি অরণ্যসঙ্কুল, অনুর্বর, বিরলবাস, প্রজাদরিদ্র, খাজনার সংস্থাপনহয়না' ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রদানকরেন। এ সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন সুজাউদ্দিন তৎপর মির্জা মুহাম্মদ জয়লাভ করে আলিবর্দি খাঁ নাম ধারণ করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। সুজাউদ্দিন নামে মাত্র শাসক ছিলেন। আলিবর্দি খাঁ সিংহাসনে বসেন শ্রীকৃষ্ণআচার্যের প্রতি কৃতোপকারের প্রতিদান স্বরূপ ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে আলেপসাহি পরগনার জমিদারি শ্রীকৃষ্ণআচার্যের নামে বন্দোবস্ত দেন। সত্যবাদি শ্রীকৃষ্ণআচার্য যথারীতি কানুনগো গঙ্গারাম রায়ের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে বৈলর, লক্ষ্মীপুর, কাজিরশিমলা ও কালিবাজার এই চারটি মহাল তালুকস্বরূপ বন্দোবস্তদেন। সেই থেকে কথিত চারটি মহাল তাড়াসের জমিদারগণের অধীন ছিলো। এভাবে শ্রীকৃষ্ণআচার্য বিপুল জমিদারির মালিক হয়ে তদীয় জমিদারিতে রামরাম, হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম, এই চারপুত্রকে উত্তরাধিকার বর্তমানরেখে ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঝাকরের বাড়িতে ইহলীলা সাঙ্গ করেন। পিতৃবিয়োগের পর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম আচার্য স্বার্থমোহে মত্ত হয়ে ভ্রাতৃস্নেহ বিসর্জনপূর্বক স্বেচ্ছায় পৃথক হয়ে নিজ চারআনা অংশ আলাদা করে আলেপসাহি পরগনারই বাহাদুরপুরে অবস্থান করেন। অপর তিন ভাই কলহভুলে প্রথমে কিছু দিন বাহাদুরপুরে অগ্রজের সাথে বসবাস করে, পরে আয়মন নদীর তীরস্থ বর্তমান মুক্তাগাছা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। কিংবদন্তি আছে যে, মুক্তারাম নামে এক দরিদ্র কর্মকার একটি পিতলনির্মিত গাছা (দীপাধার) নজরপ্রদান করে এ জমিদারদিগকে বরণকরে নিয়েছিলেন বলে মুক্তারামের রাজভক্তি অমর করারমানসে ঐ গ্রামের নাম 'মুক্তাগাছা' রাখা হয়েছিলো। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরাম পৃথক হওয়ার পূর্বে বার আনির তরফ থেকে একটি দীঘি খনন করান যা বিষ্ণুসাগর নামে অভিহিত। তিনি বাগানবাড়িতে নিজ আবাসস্থল এবং অপর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা খানা বাড়িতে বসবাস করতেন। দু'ভ্রাতা একত্রে থাকার কারণে এই বাড়ির নাম আটআনী বাড়ি বলে খ্যাতিলাভ করে। তাঁদের এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সেসময় তাঁদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই জরুরি ছিলো। অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ এই দুই ভ্রাতা পরবর্তীতে সময়ের অনুশাসন মেনেই সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

রঘুনন্দন আচার্য শিবরামআচার্যের একমাত্র পুত্র। তিনি চারিআনি হিস্যায় পিতৃস্বত্বে স্বত্বাধিকারী হয়ে জমিদারি পরিচালনা করার সময়ে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে তথা ইংরেজি ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখাদেয়। এটি ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সময়ের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকেও করেছে ক্ষত-বিক্ষত। দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাবৎসল জমিদার রঘুনন্দন আচার্য অকাতরে নিজভান্ডার থেকে লাখ লাখ দূর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে অন্নদান করে তাদের জীবন

www.pathagar.com

রক্ষায় ব্রতি হয়েছিলেন। পরে জাতিবিরোধে জর্জরিত হয়ে রাজকীয় বিচারালয় মারফত নিজ চারিআনী হিস্যা ভাগকরে তথায় বাসকরতে থাকেন। এ কারণে তার অংশ 'দরি চারিআনী' এবং হরিরাম আচার্যের অংশ সাবেক চারিআনি নামে পরিচিত। বাটোয়ারার এই সূত্র ইতিহাসকে আত্মস্থ করার প্রয়োজনেই জরুরি।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপন করা হয়। বেলুহার কালেক্টর মিঃ রটন নবগঠিত জেলার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। তখন কালেক্টরের অফিসাদির জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিলনা। অফিস বসতো বেগুনবাড়ি কুঠীবাড়িতে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জমিদার রঘুনন্দনের জমিদারির মধ্যে 'নছিরাবাদ' নগর স্থাপিত হয় এবং তার বংশধরেরাই নগরের অধিকারী হয়েছিলেন। রঘুনন্দনের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি গৌরীকান্ত কে (দত্তক পুত্র) রাজ্যভার অর্পনকরে পরলোক গমনকরেন এবং কিছুদিন পর এই দত্তক পুত্রও অকাল বিয়োগ হলে বিধবা মহারানী বিমলাদেবী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি দয়া ধর্মের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন । তিনি কাশীধামে স্বামীর নামে গৌরীকান্তেশ্বর শিবস্থাপন করে তথায় অন্নছত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অন্ন-দান দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কাশীরজনতা তাকে 'রানী বিমলাদেবী অন্নপূর্ণা' বলে ডাকতো। এখনও সেখানে তার বাড়ি রয়েছে। কাশীতে তিনি ভরতপুরের মহারানীকে সই হিসেবে সম্বোধন করতেন। উক্ত মহারানী স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাঁকে বহুমূল্যবান পাথর উপহার দিয়েছিলেন। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পে উক্ত মূল্যবান পাথরটি ময়মনসিংহ শহরস্থ প্রাসাদের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রানী বিমলা দেবী কালিঘাটের কালীমূর্তির গলদেশে মহামূল্যবান মুক্তামালা প্রদানকরে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ জমিদারী অন্তর্গত বালিপাড়া গ্রামে প্রজাসাধারণের জলকষ্ট নিবারনার্থে একটি বড়দীঘি এবং নিজ শ্বশুরের নামে রঘুনেশ্বর শিবস্থাপন করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তাগাছায় নিজ নামে বিমলেশ্বরশিব স্থাপন করেন। স্বর্ণ কুম্ভশোভিত চিত্তহারী সুদৃঢ়মঠ তাঁর স্মৃতি অদ্যাবধি রক্ষা করে আসছে।

গোলকপুর ঃ

তৎকালীন ভারতবর্ষে ময়মনসিংহের গোলকপুর রাজ পরিবারের নাম সুনাম সুবিদিত ছিলো। গোলকপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণচৌধুরী দিল্লীর মোগল রাজ-দরবার থেকে নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ রাজশাহী জেলার তরপ কারুই (সেলবরস) এবং ময়মনসিংহ জেলার মমেনশাহী ও জাফরশাহী পরগণার জমিদারিপ্রাপ্ত হন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার বলে এ সকল এলাকায় মোগল রাজত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কৃতকর্মে খুশি হয়ে মোগল সম্রাট তাঁকে এ্যাষ্টেটের দায়িত্ব অর্পন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৌধুরী নাটোরের সন্নিকটে একটি গ্রামে সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহন করেন। ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। রাজ্য সংক্রান্ত কার্যে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। যার ফলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি দেখতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তা ও সাহসে ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর ছিলো ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র

www.pathagar.com

চাঁদ রায় ছিলেন যেমন সুন্দর তেমনি উন্নত গুণাবলীর অধিকারী। নিজের যোগ্যতায় নবাব সরকারে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি 'রায় রায়ান' পদবী সহ নবাব বাহাদুরের রাজস্ব মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। নবাব সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাসহ তিনি অর্থনীতি বিভাগেরও একজন নির্বাহীতে পরিণত হন। রাজস্ব মন্ত্রী ছাড়াও দিওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। অসাধারণ তেজষকার্যের জন্য তিনি সময় সময় নবাব সরকারের সামরিক বিভাগেরও দেখাশোনা করতেন। পুত্রের অস্বাভাবিক সাফল্যে পিতা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী অন্যান্য দু'একটি পরগণারও জমিদারি প্রাপ্ত হন। কিন্তু চাঁদ রায় যুবক বয়সে পিতার জীবদ্দশায়ই পরলোক গমন করেন। কিছুদিন পর পিতা শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীও মৃত্যুমুখে পতিতহন। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি চার পুত্রের মধ্যে ভাগাভাগী হয়। 'তরপ রায় লক্ষ্মী নারায়ন' নামে পরিচিত গৌরীপুর ও রামগোপালপুর জমিদারি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত দু'পুত্র যথাক্রমে কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপালের ভাগে পড়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্রের ঘরে জন্ম নেয় তিন পুত্র। এই তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ শ্যামচন্দ্রের অধীন গোলকপুর এবং অপর পুত্র রুদ্রচন্দ্র থেকে বাসাবাড়ি ও ভবানীপুরের জমিদারী বিস্তৃতি লাভ করে। এই তিনটি প্রাসাদ ও জমিদারি একত্রে 'তরপ চৌধুরী' নামে অভিহিত ছিলো।

শ্যামচন্দ্র ছিলেন তেজস্বী জমিদার। তিনি যে কোন মূল্যে সত্য ও সুন্দরের সমর্থন করতেন এবং দুষ্টমতি লোকেরা তাঁর নামেই ভয় পেতো। একারণে এবং অপরাপর গুনের জন্য তিনি সাধারণে 'শ্যামাচাঁদ বাহাদুর' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ছিলো এক কথায় অসাধারণ। নিজের দায়িত্বকে তিনি কখনও পাশ কাটাতেন না। নিচের একটি ঘটনা তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দেবেঃ

ময়মনসিংহ এবং জাফরশাহী পরগণার রাজস্ব সর্বপ্রথম সরকারে ন্যস্ত হবে, এক সময় এরূপ একটি প্রথা গড়ে উঠেছিলো। একবার ময়মনসিংহ পরগণার রাজস্ব পরিশোধে জমিদারদের বিলম্বজনিত কারণে দিতে দেরী হলে, অন্যান্য পরগণার রাজস্ব প্রথমে দেয়া হয়। অনুসন্ধানে শ্যামচন্দ্র যখন এ তত্ত্ব অবগত হলেন, তখন তার পৌরুষে প্রচন্ড ধাক্কা লাগে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি ক্রোধে অন্ধ হয়ে লাথি মেরে রাজস্ব পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন । তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাব দেখে কালেক্টর বাহাদুর যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হলেন। পরে শ্যামচন্দ্র যখন এর কারণ দর্শালেন, তখন কালেক্টর বাহাদুর তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাঁর ভেতরে এ রকম আত্মসম্মান বোধ ছিল ।

শ্যামচন্দ্রের একমাত্র পুত্র হলেন শম্ভুচন্দ্র। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ধর্মকর্মে ছিলো তাঁর প্রচ্ছন্নমতিত্ব। বুদ্ধিমত্তা এবং নিরপেক্ষ বিচার সকলের নিকটই গ্রহণযোগ্য ছিলো। দানের হস্ত ছিলো অবারিত এবং অনাহারীকে আহারদান তাঁর নিত্যস্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। অসহায়ের অসহায়ত্ব লাঘবে তিনি ছিলেন উদার স্বভাব। নিজ খরচে তিনি শম্ভুগঞ্জে একটি বিরাট বাজার স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে দূরদূরান্ত থেকে ক্রেতা সাধারণ এসে বাজার করতো। মুর্শিদাবাদে গঙ্গার তীরবর্তী জায়গায় তিনি থাকতেন। পৌঢ় ও বৃদ্ধকাল তিনি তীর্থ পর্যটন করে কাটিয়েছেন। বৃন্দাবনে তিনি

www.pathagar.com

একটি মন্দির নির্মাণ করে 'রাধা দামোধর' এর নামে তা উৎসর্গ করেন। এই বৃহৎ মন্দিরটি 'শম্ভুচৌধুরীর কুঞ্জ' নামে অভিহিত। মন্দিরের আশে পাশের লোকজনদের কাছথেকে নিজ অর্থব্যয়ে সম্পত্তি ক্রয়করে তিনি তাঁর আয় থেকে এর ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর হৃদয়ের বিশালতা প্রমাণিত করার জন্য তিনি ক্রয়কৃত সম্পত্তির অর্ধেক পূর্ব মালিকদের নিঃশর্তভাবে ফেরতদেন। বলা হয়ে থাকে যে, সনাতন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি যখন গভীর আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হতেন, তখন কথিত ধর্মমত অনুসারে 'আত্মার মুক্তির জন্য তিনি মস্তকের উপরিভাগের চুল ও চামড়া কেটে ফেলতেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজা হরিশচন্দ্রও একজন খ্যাতনামা জমিদার ছিলেন। বহুমুখী গুণ ও কর্মের সমাহার ঘটেছিলো তাঁর চরিত্রে। তিনি সঙ্গীত পিপাসু ছিলেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত সব সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সহায়তা করেছিলেন। পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তার পান্ডিত্য ছিলো। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়াদি পড়তে তিনি খুবই ভালবাসতেন। স্থাপত্য কলায় তাঁর বড় দখল ছিলো। তিনি হিন্দু শাস্ত্র ও মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়েও তিনি ঘাটতেন। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়ে তিনি প্রজাদের উপকার করতেন। স্থাপত্য সৌন্দর্যে তাঁর ছিলো আজীবন উৎসাহ। দামী আসবাবপত্র ও গ্যাসলাইট সমভিব্যাহারে তিনি অপরূপ স্থাপত্য কলায় গোলকপুরে নিজ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটাতেন বড় বড় নগরীতে। ভাড়া বাড়িতে থাকতে তিনি পছন্দ করতেন না। একারণে যেখানে থাকতেন, সেখানে তিনি সুন্দর বাড়ি কিনতেন কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করতেন। অতি দক্ষতার সাথে তিনি জমিদারি চালাতেন এবং তাঁর জমিদারি তিনি নিজে অনেক প্রসার করেছিলেন। তিনি উন্নত হৃদয়, উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং জনসাধারণের উপকারার্থে অবলীলায় কাজ করেগেছেন। দেশের কারিগরি শিক্ষায় সরকারকে তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছেন। কোলকাতার সিটি কলেজ ভবন নির্মাণেও তিনি উল্লেখযোগ্য দান করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষায় অংক শাস্ত্রে সর্বোচ্চ নম্বরধারীকে তাঁর একটি বৃহৎ দানের আয় থেকে বছরের পর বছর পুরস্কৃত করা হয়েছে। ময়মনসিংহের সরকারী বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদেরকে পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো আসামে কামাক্ষ্যা দেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের জন্য 'ঘূর্ণায়মান সোপান' তৈরী করা। আসামের কামাক্ষ্যা দেবীর মন্দিরটি একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থিত। লতা পাতা, গাছের ডাল-পালা ধরে পথ অতিক্রম করতে অনেকের জীবন ওষ্ঠাগত হতো এবং প্রায়ই ঘটতো মৃত্যুর মতো অঘটন। তীর্থযাত্রীদের এই অসুবিধা দূর করতে তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে প্রায় একমাইল পর্যন্ত দেবীর মন্দির অবধি 'স্টেয়ার কেছ' নির্মাণ করেন প্রচুর অর্থব্যয় করে। ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর এ অসাধারণ বদান্যতায় প্রীত হয়ে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ময়মনসিংহের জমিদারদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'রাজা' উপাধি পান। তিনি চৌধুরী বংশের কূলতিলক। শোভাবাজারের রাজাগণ, মহারাজা জীতেন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মত বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বের সাথে ছিলো তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। সুসংদুর্গাপুরের মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সাথেও ছিলো তাঁর দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব। এ কারণেও দুটি পরিবারের

www.pathagar.com

মধ্যে ভালবাসার বন্ধন ছিলো অটুট। তাঁর স্ত্রী রানী অমৃত সুন্দরীও ছিলেন স্বামীর মতো উদার হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর বদান্যতা দেশে-বিদেশে বিদিত। ভারতের বেনারসে এ রানী দুটি বৃহৎ ভবননির্মাণ করে তা, ছয়জন দেবীর নামে উৎসর্গ করেন। তিনি এর ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থায়ী সম্পত্তি দান করে যান। মন্দিরের কোল ঘেঁষে তিনি নির্মাণ করেন একটি 'ছত্র'। এখান থেকে ব্রাহ্মণ ও গরীব সংস্কৃত ভাষার ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে অন্ন বিতরণ করা হতো। 'বৈদ্যনাথের' মন্দিরে তিনি বৈদ্যনাথের পুজোর জন্য রৌপ্য পাত্র দান করেন। কোনরূপ নজরানা ছাড়া তিনি তাঁর প্রজাসাধারণকে ইঁদারা ও পুস্করিনী খনন করার অনুমতির রেওয়াজ প্রচলন করেন।

পিতা-মাতার যোগ্য সন্তান হিসেবে কুমার উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ১২৯২ বঙ্গাব্দে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১২৬৮ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর আজন্মমোহ। বহিরাঙ্গন চিকিৎসায় তিনি নিজেই রোগীদের চিকিৎসা করতেন এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতেন। নিজ পিতা জমিদার হরিশচন্দ্রের নামে একটি বহিরাঙ্গন দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এখানে একজন উপসহকারী সার্জনের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। তিনি জামালপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় প্রচুর অর্থ দান করেন। যৌবনে তিনি একজন অব্যর্থ নিশানার শিকারী ছিলেন। উদার ও দয়ার্ত ছিলো তাঁর হৃদয়। গরিব অসহায়দের জন্য ছিলো তাঁর হৃদয়ের টান। সাধারণ লোকদের শিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। ময়মনসিংহের গোলকপুরে এবং ভারতের বেনারসে নিজঅর্থে তিনি অসংখ্য ছাত্রদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থাকরেন। ময়মনসিংহে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনুদান অকিঞ্চিৎকর নয়। কোলকাতার সিটি কলেজেও তিনি প্রচুর অর্থদান করেছেন। তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ফান্ডে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। পিতামহের মতোই তিনি পূর্বধলার রাজ পরিবার ও বনগ্রামের তারকাচন্দ্র চৌধুরীকে অনেক সম্পত্তি দান করেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন তিনি। এ কাজে তিনি জনসাধারণ অভ্যাগতদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। কথিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বহুদিন ধরে বহুজনের মুখে প্রশংসিত হয়েছিল। জমিদারির ভার তাঁর সুযোগ্য পুত্র সত্যেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীর উপর অর্পণ করে তিনি ১৩২০ বঙ্গাব্দে অবসর জীবনযাপন শুরু করেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত ভদ্রলোক ছিলেন। দেখতে খুবই সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর দিদিমার জন্য 'নির্বাহী' নিযুক্ত করেছিলেন। জমিদারি পরিচালনায় তিনি পিতৃপুরুষদের মতোই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী। ময়মনসিংহ শহরে আনন্দ মোহন কলেজে আই.এস.সি শ্রেণী খোলার বিষয়ে তাঁর অবদান ছিলো অপরিসীম। তাঁর দু'ছেলে ও এক মেয়ে। সবাই ধর্মকর্মে অতিশয় নিষ্ঠাবান। তাঁরা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও সাধারণ জনসাধারণের প্রতি তাঁদের

www.pathagar.com

টানছিল গভীর। অন্যান্য পূজাঅর্চনা ছাড়াও তাঁরা গৃহদেবতার উপাসনায় মগ্ন থাকতেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর মাতাও ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি চমৎকার পত্র লিখতে পারতেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণে 'কুসুমাকলী' নামে একটি মেলোডি কবিতার বই লিখেছেন। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার প্রতিও ছিলো তাঁর হৃদয়ের গভীর টান। তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য 'চন্দ্র নাথে' একটি 'সভামন্ডপ' নির্মাণ করেছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর নামে বাজিতপুরে একটি মন্দির স্থাপন করেন। শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম সকল বিষয়েই এই রাজ পরিবারটির ঐতিহ্য ছিলো ঈর্ষণীয়।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অন্তপ্রাণ গোলকপুরের জমিদার পরিবারের ঐতিহ্য ও সুনাম একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। জমিদারি পরিচালনায় তাঁদের দক্ষতা ও নিষ্ঠাও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়, বরং উল্লেখযোগ্যও। গোলকপুরের জমিদার পরিবারের জমিদারি পরিচালনার নিজস্ব একটা স্টাইল ছিলো। সেই স্টাইল নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্রচিহ্নিত।

রামগোপালপুর (গৌরীপুর) ঃ

ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের রামগোপালপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে অপ্রশস্থ পাকা রাস্তায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে রামগোপালপুর অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে জমিদারদের একটি ধ্বংসোম্মুখ প্রকান্ড ভবন রয়েছে। এটি অবহেলা অযত্নে ধ্বংসোম্মুখ হলেও এক সময় এ ভবনটির শানসৌকত ছিলো, ছিলো প্রতাপশালী এক জমিদার বংশের আস্তানা। এ বিশাল ভবনের সিংহদ্বার ছিল দেখার মতোবস্তু। আজ প্রকৃতির করাল গ্রাসে এটি নিমজ্জিতপ্রায়, অথচ এক সময় প্রতাপশালী জমিদারবংশের এটি ছিলো সুরম্য আবাসস্থল। গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের জমিদারগণ ময়মনসিংহ ও জাফরশাহী পরগণার মালিক ছিলেন, এই জমিদারি প্রতিষ্ঠার প্রাণ পুরুষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের একজন রাজকর্মচারী ছিলেন। বাংলার নবাব তখন আলীবর্দী খাঁ। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁর থেকে ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারিপ্রাপ্ত হন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার করাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং নিজ যোগ্যতাবলে মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে সরকারি আমলা হিসেবে নিযুক্তি লাভকরেন। পরে তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁ'র বিশেষ কৃপালাভে সমর্থ হয়ে কথিত জমিদারিপ্রাপ্ত হন। তখন ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

রামগোপালপুর জমিদারির অন্যতম প্রাণপুরুষ রাজা কাশিকিশোর রায় চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণচৌধুরীর অধস্থন পঞ্চম পুরুষ। প্রতিষ্ঠাতা জমিদারের বিদূষী পুত্রবধু ছিলেন নারায়নী দেবী। নারায়নী দেবী তাঁর এক শরিকের সাথে বেশ ক'টি মামলাকরে শ্বশুরের সম্পত্তিতে তার যে অংশ প্রাপ্যছিলো, তা উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তিনি উপযুক্ত শ্বশুড়ের উপযুক্ত পুত্রবধূ ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তা ওয়ারেণ হেষ্টিংস নারায়নী দেবীকে একটি সনদপত্র প্রদানকরেন। এই সনদেরবলে তিনি তাঁর অধিকারলাভে ষোলআনা সমর্থ হন। স্বর্গীয় কাশিকিশোররায়

www.pathagar.com

চৌধুরী ছিলেন নারায়নী দেবীর প্রপৌত্র। কাশিকিশোরের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণীর মধ্যে রাজা কাশিকিশোর রায় চৌধুরী উচ্চশিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রাজ্ঞপন্ডিত, সুধীজন বিধায় রাজশক্তি তাঁকে এ জেলার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতের শাসনব্যবস্থা সরাসরি ইংরেজ সাম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়ার অধীনে চলে যায়। কাশিকিশোর যোগ্যতার সাথে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বছর এপদে বহাল থেকে নিজ যোগ্যতা, মেধার পরিচয় দান করেন। তিনি রামগোপালপুরে নিজ বাসভবনেই আদালত বসিয়ে সুচারুরূপে বিচারকার্য পরিচালনা করে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন । তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং ফরিদপুর, ঢাকা ও সিলেট জেলায় নতুন জমিদারি ক্রয়করে নিজ জমিদারি অনেকাংশ বৃদ্ধি করেন।

ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি গভীর অনুরাগ ও অকপট ভক্তি পোষণ করতেন রাজা কাশিকিশোর। রাজশক্তি তাঁর অনুপম রাজভক্তির নিদর্শনে প্রীত হয়ে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সম্মান সূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ধর্মের অনুশাসনে তার অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো। শাস্ত্রের প্রতিটি বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি সুচতুর, সুপন্ডিত, বিচক্ষণ এবং বাগ্মী ছিলেন। তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিলো নির্মল।

গৌরীপুর ও রামগোপালপুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠালগ্নকালে কাশিকিশোর রায় চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ জমিদারগণ কিন্তু খুব একটা নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ মজুমদার তাঁর বিরচিত 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' নামক প্রামান্য গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহ ও জাফরশাহী পরগণার জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন "ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জাফরশাহী পরগণার ৮,০৪৯ মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাড়িঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জমিদারি খাসে আনিলে পর, অভয় পাইয়া প্রজাগণ তাহাদের বাড়িঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬৪০ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে"। একই পুস্তকের অন্যত্র ৬১ পৃষ্ঠায় "এই সময়ে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগনার জমিদার স্বর্গীয় যুগল কিশোর রায় চৌধুরী সিংধা পরগনায় প্রবেশ করিয়া ঐ পরগনার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বহু ধন ও প্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়"। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরী গৌরীপুর কিংবা রামগোপালপুরের জমিদারগণ পূর্ব পুরুষদের অত্যাচারী মনোভাব তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে প্রাপ্ত হননি। রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী কাশিকিশোরের সুযোগ্য পুত্র। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর জন্ম। তিনি পিতৃগণের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর পিতার ন্যায় তাঁর প্রতিও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁর রাজভক্তি, প্রজাবাৎসল্য, সংগীতানুরাগ ও প্রত্যুৎপন্নতা দেখে রাজশক্তি তাঁকে ১৮৯৫ সনে সম্মানসূচক 'রায়

www.pathagar.com

বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সে কারণে প্রতি বছর বহু সংস্কৃত পন্ডিত তাঁর গৃহে আগমন করতেন এবং তিনি তাদেরকে যথাযথ পারিতোষিক দান করে বিদায় দিতেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কৃতকর্মে প্রীত হয়ে একটি সম্মানসূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীকে। এ প্রশংসা পত্রের মর্মকথা নিম্নরূপঃ "স-কৌন্সিল ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে ভারত-সম্রাজ্ঞী রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নামে এই সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র জমিদার বাবু কাশিকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীকে প্রদান করা হইল। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র কিশোর তাঁহার বিপুল জমিদারীর সুপরিচালনে এবং দেশ ও দশের কল্যাণ সাধনে সততঃ ব্রতী"।

(স্বাক্ষর)
আলেক জান্ডার ম্যাকেঞ্জি
বাঙ্গালার শাসনকর্তা
২০শে জুন ১৮৯৭ ।

'রায় বাহাদুর' উপাধি ছাড়া জমিদার যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন এবং ঢাকায় এর রাজধানী স্থাপিত হয়। মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে ব্যাপক সমর্থন জানালেও কায়েমি হিন্দুগণ প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেন। এখানকার অধিকাংশ হিন্দুদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে হিন্দু জমিদারগণও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করেন। মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর এর জমিদারগণ এতে হিন্দুদের সপক্ষে প্রত্যক্ষ মদদ যোগাতেন। সারা বাংলাদেশের মত তখন ময়মনসিংহ অঞ্চলেও শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জামালপুরের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দুদের দাঙ্গা পরিচালনার জন্য রামগোপালপুরের জমিদারের জামালপুরস্থ কাচারী সংলগ্ন 'দয়াময়ী' মন্দিরকে ব্যবহার করেন। এতে জমিদার যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিলো। তিনি তাঁর অধীনস্থ আমলা নায়েবদেরকে(তাদের প্রায় সবাই হিন্দু) স্বপক্ষ অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিঃ আর, নাথান তাঁর রিপোর্টে ২১ ও ২২-এপ্রিল, ১৯০৭ সনের এই দাঙ্গার বর্ণনা দিয়েছেন। এ সময়ে জামালপুর শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে একটি মেলা ও স্নান-উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিলো। গুজব রটে যায় যে, মুসলমানরা এই মেলা ও স্নান-উৎসবে হিন্দুদেরকে আক্রমণ করবে। হিন্দুরাও ছিল কৃত সংকল্প। যে কোন উপায়েই তাঁরা মেলায় যোগদান করবে। মিঃ আর নাথানের সরকারি প্রতিবেদনের ভাষায়, "জমিদারের কর্মচারী, উকিল, মোক্তার এবং ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল লাঠি হাতে একটি হাতি নিয়ে মেলায় আগমন করে। তাঁরা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি প্রদান করে, মুসলমান দোকানদারদের অপমান করে এবং খেলানা, মিষ্টি ও লবণ বিনষ্ট করে"। (বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩৫০, এশিয়াটিক সোসাইটি) এসকল কার্যকলাপে রামগোপালপুরের জমিদার রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রত্যক্ষ মদদ ছিলো।

www.pathagar.com

কানিহারী জমিদার ঃ

কানিহারীর জমিদারি শাসন ব্যবস্থার চাকা সামনে ঘুরাতে এই বংশের প্রয়াস ছিলো নিরন্তর। ময়মনসিংহ শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার্শ্ব ঘেঁষে কানিহারী গ্রাম অবস্থিত। বর্তমানে এটি ত্রিশাল থানাধীন। নবাব মর্শিদকুলি খাঁ'র আমল থেকেই এখানে চক্রবর্তী বংশীয় ব্রাহ্মণদের জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। কানিহারীর প্রখ্যাত জমিদার হরকিশোর চক্রবর্তীর ৫ম উর্ধ্বতন পুরুষ মুর্শিদকুলি খাঁ'র দরবারে সভাপন্ডিত ছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে ময়মনসিংহের 'তপ্পরণ ভাওয়াল' পরগনার দশ হাজার একর ভূমি লাখেরাজ করে দেন। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও উক্ত ভূমি নিস্কর ছিলো। ভাগ্যই কালীকিশোর চক্রবর্তীকে জমিদারি শাসনব্যবস্থায় টেনে এনেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর জমিদার হওয়ার কথা নয়। কপালে রাজটীকা দিয়েই জমিদারি শাসনব্যবস্থায় তিনি সোনালি দস্ত খত রাখেন।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১২৬২ বঙ্গাব্দে কালীকিশোর চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী কানিহারীতে আসেন 'দত্তক' হিসেবে। কানিহারীর ভূম্যাধিকারী হরকিশোর কালীকিশোরকে যখন 'দত্তক' পুত্র গ্রহণ করেন, তখন কালীকিশোর নিতান্তই বালক মাত্র। এরপর হঠাৎ করে হরকিশোরের আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী কালীশ্বরী দেবী এই এ্যাস্টেটের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। হরকিশোরের মৃত্যুতে আমলা নায়েব সহ নিকটাত্মীয়রা এই বিধবার জমি গ্রাস করার নিমিত্তে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা নিজ নিজ মতলব হাসিলের জন্য পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে। এ সময়ে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বরী দেবী স্বামীর এ্যাস্টেট নিজ হাতে তুলে নেন। কালীকিশোর তখনও নাবালক। কাশীশ্বরী দেবীর সুযোগ্য পরিচালনায় অচিরেই আমলা নায়েবগণ তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবী তাঁদের কৃত অপরাধ মাফ করে দিয়ে সবাইকে পুনরায় নিজ নিজ পদে পুনঃ বহাল করেন। এভাবে তিনি পূর্ব পুরুষদের জমিদারি টিকিয়ে রাখেন। তিনি নিজ বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও সাহসের বলে একটি ধ্বংসমুখী পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর দত্তক পুত্র কালীকিশোরের বিয়ে দেন ময়মনসিংহের 'কিতিলা' গ্রামের স্যার চন্দ্র ভট্টাচার্যি মহাশয়ের বিদুষী কন্যার সাথে। এই ভট্টাচার্যি মহাশয় ছিলেন বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক পরানানন্দের উত্তরসূরী ও অধস্তন পুরুষ। সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন চৌকষ। মাপা পায়ে চলার মানুষ।

দত্তক মাতার মৃত্যুর পর কালীকিশোর এ্যাস্টেটের অধিকর্তা হন। তখন তিনি যুবক। এর আগেই কানিহারীকে ব্রিটিশরা জমিদারি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অধিকর্তা হয়েই তিনি নজর দেন জমিদারির উন্নতির জন্য। তাঁর প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির কারণে শীঘ্রই তিনি জনগণের দৃষ্টি কেড়ে নেন। ধনী বিলাসী পরিবারে গড়ে উঠলেও তিনি জীবনযাপন করেন একবারে সাধারণ মানুষের মত সাদাসিধে। এ কারণে তাঁর

www.pathagar.com

আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শীরা তাঁকে খুবই ভালবাসতো। দয়ার্দ্র ও বদান্যতার প্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর সুযোগ্য দু'পুত্র প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী ও কামেশ্বর প্রসাদ চক্রবর্তী সেকালে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এরা সবাই রসিক ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের একজন প্রতিথযশা আইন ব্যবসায়ী এবং অপর একজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। ৬২২৬, ৬২২৭, ৬৪৬৭, ৬৪৪০, ১৩০৩১, ১০৭১৭ সহ ৮৮ নং তালুকের অংশে তাদের জমিদারি ছিলো। এছাড়া আরও ছোট ছোট দু'টি তালুক তারা ক্রয় করেছিলেন। কালীকিশোরের পিতা ও পিতামহ উভয়েই এই জমিদারি বৃদ্ধিতে একান্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন। তপ্পেরণ ভাওয়ালে তাঁদের জমিদারির ১/৩ অংশ মূলতঃ মূল্যবান গজারী বৃক্ষের বন ছিলো। এতে তাঁদের আয়ও হতো প্রচুর। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে কালীকিশোর অনেক জনহিতকর কাজ করেন। জমিদারি পরিচালনায় তাঁর সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা তাঁকে দক্ষ শাসকে রূপান্তরিত করে। ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন-যাপন করলেও গরীব প্রজাসাধারণের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূশীল। তিনি প্রজাসাধারণের হতদরিদ্রদশা ঘুচাতে জমিদারি মনোভাবের কিছুটা হলেও ছাড় দেন। তাঁদের মানবেতর জীবন-যাপন দেখে তিনি অনেকটাই প্রজাদরদী হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর সহচর ও প্রতিবেশীদের ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রতি তিনি দয়ালু মনোভাব প্রদর্শন করতেন। তিনি ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী ছিলেন মিশুক প্রকৃতির সামাজিক মানুষ। মানুষের দূর্দশা তাঁকে পীড়িত করতো বলে নিজের অবস্থান ভুলে গিয়ে তিনি প্রজাসাধারণের কল্যাণার্থে ইতিবাচক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। তাঁর আমলে জমিদারি শোষণ অনেকটা কমে এসেছিলো। মানুষ হিসেবে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কালীকিশোরের প্রজাসাধারণ তাঁর কাছ থেকে দয়া দাক্ষিণ্য পেয়ে প্রীত হতেন। প্রজাসাধারণের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। বোধকরি জন্মগতভাবে জমিদারি শাসন ব্যবস্থায় মানবাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই থাকে ভুলুণ্ঠিত। তাঁর আমলে মানবাধিকার সীমিত পরিসরে হলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। মানুষের মানবিক মর্যাদার প্রতি কালীকিশোরের শ্রদ্ধা তাঁকে মানবহিতৈষীতে রূপান্তরিত করেছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে গিয়ে কালীকিশোরের কথা ভাবলে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়।

কালীকিশোরের দত্তক পিতা হরকিশোর ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীর সংলগ্ন এক নয়নাভিরাম জায়গার নিজ প্রসাদের পাশেই একটি চমৎকার মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরে এটিতে কালী দেবীর বিগ্রহ স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহ শহরেও দেবী সেবার নামে তিনি বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। কানিহারীর মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ৪৩৫৭ নং তালুকটি কালেক্টরকে উৎসর্গ করেছিলেন। পিতার পদাংক অনুসরণ করে কালীকিশোরও অনেক জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন। কানিহারী গ্রামে রেললাইনঘেষে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টি রয়েছে এটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁদের দান অপরিসীম। দেশ বিভাগের সমসাময়িক কালে এ বংশের অনেকেই দেশ ছেড়ে ভারত পাড়ি জমান, তবে তাঁদের অধস্তন দু'একজন এখনও এখানে বাস করছেন।

www.pathagar.com

ধলার জমিদার ঃ

ধলার জমিদারগণের গুরুত্ব ছিলো অন্যরকম। ধলার জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন তীলককার আচার্য ও তাঁর ছোট ভাই গোবিন্দ বর বিদ্যালংকার। এদের আদিনিবাস ছিলো বর্তমান পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলা। এ নদীয়া জেলা পূরাকালথেকেই সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চায় সারা বঙ্গে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলো। তীলকাচার্য ও গোবিন্দবর উভয়েই ছিলেন প্রাজ্ঞপন্ডিত। তাঁদের পান্ডিত্যের কথা দিল্লিশ্বরের কর্ণগোচর হলে দিল্লিশ্বর বাদশাহ শাহজাহান তাঁর দরবারে তাঁদেরকে ডেকেপাঠান। এর পর শাহসুজা বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তাঁরা পুনরায় শাহসুজার সাথে বাংলায় চলে আসেন। সম্রাট পুত্র তাঁদের কার্যকলাপ ও মেধার পরিচয়পেয়ে গোবিন্দবরকে রণ ভাওয়ালের জমিদারি দানকরেন। সেসময় রণ ভাওয়ালের প্রায় এলাকাই গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিলো। গোবিন্দবর সে কারণে রণ ভাওয়ালের সর্ব উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ধলার ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারায় নিজ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর অল্পদিন পরে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র অনন্তরাম চক্রবর্ত্তী ধলার প্রাসাদে ওঠেন এবং কৃতিত্বের সাথে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর সময়ে তিনি তাঁর জমিদারিতে নতুন এ্যাস্টেট ক্রয় করে বর্ধিত করেন। অনন্তরামের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কিন্তু নির্বিঘ্নে জমিদারি করে যেতে পারেননি। মুঘল শাসনের এ সন্ধিক্ষণে সারাবাংলায় 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলছিলো। ফলে, জমিদারি তাঁদের হস্তথেকে সুযোগ সন্ধানী অসৎ ব্যক্তিদের হাতে চলেযায়। কয়েক পুরুষ এ ভাবেই চলে। দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হলে কিছুকাল পরে ইংরেজরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে 'চক্রবর্ত্তী জমিদারদের ভাগ্য' পুনরায় খুলেযায়। গোবিন্দবরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ আনন্দিরাম ইংরেজদের কাছথেকে পূর্বপুরুষদের জমিদারির অধিকাংশ এলাকা প্রাপ্তহন। আনন্দিরাম কিছুদিন পর রামকিশোর ও ব্রজকিশোর এই দুই ছেলের মৃত্যুজনিত কারণে শূণ্যতা অনুভব করেন দারুণভাবে। আনন্দিরামের উত্তরাধিকারী রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ব্রজকিশোরকে সুযোগ্য সম্মৃদ্ধশালী জমিদারে পরিণত করেছিলেন। প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে প্রসন্নকুমারের ভিতর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞানের পরিস্ফুটন দেখা যায়। তাঁর দক্ষতা ও কর্মকুশলতা শীঘ্রই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এতদসঙ্গে জেলায় কর্মরত ইংরেজ কর্মকর্তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনগণ ও রাজকীয় কর্মচারীগণ তাঁর কর্মের সম্যকমূল্যায়ন করতে শুরু করে। প্রতিটি গণপ্রতিষ্ঠানেই তাঁর ছিলো অকাতর বদান্যতা। তিনি দীর্ঘকাল 'ময়মনসিংহ স্বারস্বত কমিটির' সেক্রেটারি ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল জেলাবোর্ডের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে অনেক জনহিতকরকর্মে অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত দক্ষতারসাথে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একারণে তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেসির আজীবন সদস্য ছিলেন। ধলাতেও তিনি জনহিতকর অনেক কর্ম সম্পাদন করে অমর হয়েছেন। ধলার বিখ্যাত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টি বহুবছর যাবৎ বঙ্গদেশে একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। ধলায় তিনি

www.pathagar.com

একটি দাতব্যচিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ধলাতে ডাকঘর ও রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠাকরেন তিনি। যোগাযোগের জন্য তিনি জেলাবোর্ডের সদস্য হিসেবে বহু রাস্ত াঘাট নির্মাণে নিজপ্রভাব খাটিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন। এক কথায় তিনিই বর্তমান ধলার স্থপতি। অভাব অনটনে তিনি অসহায় লোকদেরপ্রতি নিজহস্ত প্রসারিত করে দিতেন। ব্রিটিশরাজ তাঁর কর্মে প্রীতহয়ে ১৯১০ খিস্ট্রাব্দে তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। তিনি যখন 'স্বারস্বত সমিতির 'সম্পাদক ছিলেন, তখন একটি কৃষি ও শিল্প মেলার আয়োজনকরে তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয়প্রদান করেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ 'ভূমধ্যাধিকারী' সভার আজীবন সদস্য ছিলেন এবং কোলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সমিতিরও সভ্য ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তীও পিতার গুনেগুনান্বিত ছিলেন। রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যদিকে পরলোকগমন করেন।

ধলারজমিদারগণ নিজগুণে আশেপাশের এলাকাকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার তাবৎ ব্যবস্থাগ্রহণ করেন। সংস্কৃতি চর্চায় ধলার জমিদারদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে মনেরাখার মতো। প্রজাসাধারণকে অহেতুক হয়রানি এবং তাদের উপর যখনতখোন খরবদারি করা থেকেও নিজেদের মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। প্রজারঞ্জক শাসক ধলারজমিদারদের খ্যাতি উত্তরকালকেও স্পর্শ করেছিলো।

কৃষ্ণপুর জমিদার পরিবার ঃ

ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে ১৮মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কৃষ্ণপুর নামে সুন্দরগ্রামটি অবস্থিত। এটি বর্তমানে গৌরীপুর থানাধীন। বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সমাজেরমধ্যে অত্যন্ত কুলীনহিসেবে খ্যাত লাহিড়ি চৌধুরীরা হচ্ছেন এ এলাকার জমিদার। কুলীনব্রাহ্মণ হিসেবে তাঁদের খ্যাতি ছিল সারাবাংলাব্যাপী, নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। নদী নয় নদ। লোকেবলে, একসময় পুরুষোচিত হাক ডাক জাক জমক ছিলো। আজ ক্ষীণকায়া, বয়সের ভারে সম্ভবত পঙ্গু প্রায়। বিশেষতঃ যমুনাই এখন মূল স্রোতস্বিনী। বিকৃত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, এর বুক চিঁড়ে এখন বিস্তীর্ণবালুচর, কাশবন, কৃষিক্ষেত্র। চৈত্রে এ নদ মরেযায়। অনেক জায়গাতেই থাকে হাঁটু পানি। প্রায় হেঁটে বস্ত্রবাঁচিয়ে একূল ওকূল পার হওয়াযায়। এরই তীরঘেষে কৃষ্ণপুর। ব্রহ্মপুত্রের মতোই আজ তার জীর্নদশা। অথচ, একসময় কৃষ্ণপুর গ্রামের শানশওকত ছিলো। সকাল সন্ধ্যায় ঢোলশহরত হতো, সানাই বাজতো। জমিদার বাড়ি থাকতো সরগরম। কালের করাল গ্রাসে আজ সবই শুধু স্মৃতি। গৌরীপুরের প্রখ্যাত জমিদার হরিকিশোর রায় চৌধুরীর এক কন্যা কৃষ্ণমনির নাম অনুসারেই এ গ্রামের নাম হয়েছে কৃষ্ণপুর। কৃষ্ণমনি নামে কৃষ্ণমনি হলেও তার গাঁয়ের রং ছিলো দুধেআলতায়। বাপমায়ের আদরেরনিধি ছিলেন এই কৃষ্ণমনি। কিশোরী বয়সেই তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুরপর কৃষ্ণমনির বিয়ে হয় নাটোর জেলার খাজুরা গ্রামনিবাসী গোবিন্দ প্রসাদ লাহিড়ির সাথে। পিতার অবর্তমানে মা ভগিরথীদেবীই বিয়ের সকলকার্য সমাধা করেন। কিন্তু বিধিবাম পরিপূর্ণ যুবতী হওয়ার আগেই কৃষ্ণমনি বিধবা হয়ে গৌরীপুরে চলেআসেন।

www.pathagar.com

ভগিরথী দেবী স্বামীর প্রয়াণে বিশাল জমিদারি এ্যাস্টেটের দায়িত্ববুঝে নেন। তাঁদের কোন পুত্র সন্তান ছিলোনা । বাধ্য হয়ে জমিদারি রক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ করেন। জনৈক আনন্দকিশোরকে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কৃষ্ণমনিকে ফিরিয়ে আনা হয় পিত্রালয়ে। বিধবা কন্যার সকল ব্যবস্থা গ্রহণকরেন বিধবামাতা। গৌরীপুরের অনতিদূরে ছায়াসুনিবিড় প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ ব্রহ্মপুত্রের কিনারেই তাঁর জন্য নির্মাণ করা হয় এক সুরম্য প্রাসাদ। নতুন প্রাসাদের নাম হয় 'কৃষ্ণপুর'। পুকুর, বাগান বাড়ি ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করা হয় নতুন বাড়ি। কৃষ্ণমনিরা চলে আসেন নতুন প্রাসাদে। ঢাকার বিক্রমপুর পরগণার মূলচর গ্রামের নবকুমার সান্ন্যালের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদকে দত্তক হিসেবে গ্রহণকরেন কৃষ্ণমনি। যথারীতি সবধরণের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মানসে কৃষ্ণমনি দত্তকপুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন উপযুক্ত পন্ডিতের উপর দায়িত্ব দিয়ে।

বালক কৃষ্ণপ্রসাদ গৃহেই দত্তকমাতার তত্ত্বাবধাণে পাঠ শুরু করেন। শিকার থেকে আরম্ভ করে সর্ববিদ্যায় পাটিয়সী করে তোলাহয় ছেলেকে। অচিরেই মেধাবী কৃষ্ণপ্রসাদ বাংলা, পারসী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। গানবাজনা নাটকসহ সংস্কৃতির সকল প্রাঙ্গনেই ছিলো তাঁর অনায়াস বিচরণ। উপযুক্ত বয়সেই বিক্রমপুরের কেত্তয়ার গ্রামের স্বর্গীয় গৌরীনাথ চৌধুরীর বিদূষী কন্যা স্বর্ণময়ীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। তাঁদের কোল জুড়ে আসে তিন কন্যা সন্তান। সিন্ধুবালা, গিরীবালা ব্রজগোপী। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় কৃষ্ণপ্রসাদ বিয়োগ হন। বিধবা দত্তক মাতা কৃষ্ণমনি কৃষ্ণপ্রসাদের অকাল মৃত্যুতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বাড়ি ছেড়ে তীর্থ পর্যটনে বের হন । অনেক পুণ্যভূমি পর্যটন করে অবশেষে তিনি বেনারস ধামে বাকীজীবন কাটানোর জন্য মনস্থির করেন এবং ধর্মকর্মেই তাঁর জীবন অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন। কৃষ্ণপুরে থাকাবস্থায় তিনি জমিদারীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। দু'একটি জেলায় তিনি তাঁর পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের সহায়তায় নতুন জমিদারি ক্রয় করেন। বিশেষত ঢাকা জেলায়ও তিনি একটি জমিদারি ক্রয় করেছিলেন। দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন কৃষ্ণমনি। প্রায় একশত বছর বয়সে তিনি বেনারসেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী কৃষ্ণপ্রসাদের অকাল মৃত্যুর পর এবং শাশুড়ী তীর্থে যাবার লগ্ন থেকেই জমিদারির ভার ন্যস্ত হয় স্বর্ণময়ীর উপর। পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি রাজশাহীর বালীহারের স্বর্গত যোগেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ির পুত্র সুরেন্দ্র প্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। বিশাল জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি ভবিষ্যত উত্তরাধিকারের সুশিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। জমিদারি পরিচালনায় লিঙ্গভেদ তার জন্য কোন সমস্যারই সৃষ্টি করেনি। প্রজারা তার সন্তান তুল্য ছিলো। তিনি সুখে দুঃখে সব সময়ই প্রজাদের পাশে থাকতেন। কাজকর্মে তিনি অত্যান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন। শাশুড়ীর মতই তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। ১৯২১ খিস্ট্রাব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি পবিত্র বেনারস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। 'দান সাগর শ্রাদ্ধ উৎসব' তারই স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার নরনারী এই দান সাগরে আপ্যায়িত হয়েছিলেন। অদ্যাবধি

www.pathagar.com

লোক মুখে তা কিংবদন্তীর মত শোনা যায়। অকৃপণ হস্ত ছিলো স্বর্ণময়ীর। দরিদ্র, অসহায়দের জন্য ছিলো তাঁর দরজা সবসময় অবারিত।

সুরেন্দ্রপ্রসাদ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলার বালিহারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দত্তক পুত্র হিসেবে স্বর্নময়ী দেবীর প্রাসাদ কৃষ্ণপুরে আসেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ি। স্বর্নময়ীর অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসম্ভব বুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মায়ের মৃত্যুর পর জমিদারির সম্পূর্ণ দায়িত্ব পান তিনি। মিতব্যয়িতা, সদালাপ চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে তিনি সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সকল মানবিক গুণের অপরূপ সমাহার হয়েছিলো তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে। উদার ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, এবং খুবই প্রজাবৎসল ছিলেন তিনি। সঙ্গীত ও শিল্পকলায় তাঁর খুবই পান্ডিত্য ছিলো। তিনি সুললিত কণ্ঠে ঘন্টার পর ঘন্টা গান গেয়ে আসর মাতিয়ে রাখতে পারতেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বসতো তাঁর কাচারি বাড়িতে সঙ্গীতের আসর তিনি তিন পুত্র যথাক্রমে সুরেশপ্রসাদ, সুশীলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদ এবং এক কন্যা সাবিত্রী বালার জনক। পুত্র কন্যাগণ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশপ্রসাদ একজন উত্তম এথলেটিক ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের ভবানীপুরের প্রথিতযশা জমিদার রাজা সতীশ চন্দ্র চৌধুরীর নাতনিকে বিয়ে করেন। ২য় পুত্র সুশীল প্রসাদ তৎকালীন সময়ের একজন সেরা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র সত্য প্রসাদও খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন এবং চমৎকার গলা ছিলো তাঁর গানে। সবশেষে জন্ম গ্রহণ কারিনী একমাত্র কন্যা সাবিত্রীবালাও খুবই মেধাবী ছিলেন। এঁরা সবাই পিতা মাতার গুণাবলী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ময়মনসিংহে মুর্শিদাবাদের নবাব ও জমিদারগণের রাজকার্য ও কর্মচারী বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে নির্দিষ্ট ছিলো বলে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে জানা যায় ঃ

(ক) মন্ত্রিবর্গ ঃ

১। দিওয়ান-ই-আলা-প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister)

২। দিওয়ান খাল্‌সা শরিফা- উজির মালী (Finance Minister)

৩। দিওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্র সচিব
(Minister of domestic affairs or home Secretary)

৪। দিওয়ান-ই-তন্‌-তন্‌ খা দেওয়ান
(Paymaster general and minister of the masters)

৫। দিওয়ান-খান-সমান
(Lord High Steward)

www.pathagar.com

(খ) প্রাদেশিক বিভাগ ঃ

(১) নায়েব সুবেদার (Deputy Governor)- বিহার, উড়িষ্যা ও ঢাকায়, তিনজন।

(২) দিওয়ান সুবাজাৎ - প্রাদেশিক মন্ত্রী। তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও ঢাকার রাজস্ব সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

(গ) বিচার বিভাগ ঃ

১। কাজী উল্ কোজাৎ-প্রধান কাজী। প্রধান বিচারক। ইংরেজিতে যাঁকে বলা হয় (Chief Justice)-বাদশাহ কাজী উল্ কোজাৎ কর্তৃক তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। বিচারক হলেও বাদশাহর অধীনে থেকেই তাঁকে বিচার কার্য সম্পাদন করতে হতো। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে বাদশাহী প্রভাব থেকে মুক্ত হন কাজী উল্ কোজাৎ। তখন থেকেই যিনি বিচারপতি থাকতেন, তিনি সুবাদার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। বিচারপতি পদবী পরিবর্তিত হয়ে এক পর্যায়ে সদরস্ সদুর নাম দেওয়া হয়। তিনি রাজধানীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

২। দারোগা-ই-আদালত-তিনি ছিলেন নিজামতী ও দেওয়ানী এই দুই প্রধান বিচারালয় কর্মকর্তা। যাঁকে বলা যায় Registar বা নিবন্ধক।

৩। মুফ্তী-তিনি ছিলেন মুহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনে প্রধান প্রধান বিচারালয়ে একজন করে পন্ডিত নিয়োগ লাভ করতেন।

৪। মোহ তসীব-তাঁর দায়িত্ব ছিলো মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি, বিপথগামী তরুণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার করা। তিনি ওজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এবং শহরের আইন-শৃঙ্খলা অবনতি জনিত বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন। তিনি 'Town Magistrate' হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

(ঘ) সামরিক বিভাগ ঃ

১। প্রধান সেনাপতির পদবী ছিলো মীর বক্সীকুল বা সেপাসালার আজম।

২। সামরিক বিভাগে আরো বিভিন্ন ধরণের ও শ্রেণীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা বক্সী দুয়েম, চাহারম, সুয়েম প্রভৃতি নামে অভিহিত হতেন।

৩। Royal Guards বা Commander-এর পদবী ছিলো বক্সী আহাদিয়ান্।

৪। চোপদারসহ সমশ্রেণীর সৈনিকদের অধিপতির পদবী ছিলো বক্সী সার্গেদ পেসা।

৫। প্রাদেশিক নায়েব সুবার অধীন সেনাপতির পদবী ছিলো বক্সী সুবাজাৎ।

৬। পদাতিক সেনানায়ক জমাদার নামে পরিচিত ছিলেন।

৭। পাঁচশ' থেকে এক হাজার পর্যন্ত সৈনিকের পদবী ছিলো হাজারী। নৌবিভাগের দারোগা এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণও হাজারী'র অধীনে দায়িত্ব পালন করতেন।

(ঙ) সেরেস্তা কর্মচারী ঃ

(১) মুস্তোফী (দেওয়ানী সেরেস্তাদার)

www.pathagar.com

(২) প্রাইভেট সেক্রেটারি বা ব্যক্তিগত সচিবের পদবী ছিলো খাসনবীস। তিনি 'নিজামৎ' নামেও অভিহিত হতেন।

(৩) সেরেস্তার পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টরকে বলা হতো মুসরেফ।

(৪) সনদ, ফর্মান প্রভৃতির অধ্যক্ষকে বলা হতো হুজুর নবীস।

(৫) দেওয়ানখানার অধ্যক্ষকে বলা হতো 'দারোগা কাছারী'

(৬) ভবন পরিদর্শক ও গণপূর্ত পরিদর্শককে বলা হতো দারোগা কারখানাজাৎ ও দারোগা-সহরৎ-ই-আম্। ইংরেজিতে বলা যায়- Building Inspector and Inspector, public works.

(৭) রাজস্ব বিভাগের প্রধান আদায়কারীকে বলা হতো কারোরিয়ান্ খাল্সা।

(৮) রাজস্ব বিভাগের অন্যতম একজন কর্মকর্তা ছিলেন কানুনগো। এই বিভাগের পেশকারসহ কিছু কর্মচারীও নিয়োজিত ছিলেন।

(৯) জরীপের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে ছিলেন আমলী কাছারী ও আমীন সুবাজাৎ।

(১০) সেরেস্তা কর্মচারীদের মধ্যে মুন্সী ও মোহরের পদবিধারী কর্মচারীও ছিলেন।

(চ) খাজাঞ্চী খানা ঃ

(১) খাজাঞ্চী খাজনা জমা ও খাজাঞ্চী খাজনা খরচ (দুইজন)

(২) মুদ্রা পরীক্ষকের পদবী ছিলো ফোতাদার (পোদ্দার)। তাঁর অধীনে কিছু কর্মচারীও নিয়োজিত ছিলেন।

(৩) মণিমাণিক্যসহ মূল্যবান দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তিনি তহবিলদার নামে পরিচিত ছিলেন।

(ছ) দৌত্য ও সংবাদ বিভাগ ঃ

(১) রাষ্ট্রদূত বা Ambassadors-এর পদবী ছিলো এল্চিয়ান।

(২) দরবারের প্রতিদিনের বৃত্তান্ত যিনি লিখতেন, তিনি ওয়াকে নবীস্ পদবীধারী ছিলেন।

(৩) সংবাদ পত্রের সরকারী লেখককে 'সওয়ানে নেগার' বলা হতো।

(জ) ফৌজদারি ও শান্তিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ শান্তিরক্ষা ঃ

(১) হাল আমলে যিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেন, সেই ম্যাজিস্ট্রেটের তৎকালীন পদবী ছিলো ফৌজদার।

(২) ডেপুটি ফৌজদারের পদবী ছিলো থানাদার। কোনো কোনো শহরে এই পদবী ধারী বিচারিক কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।

(৩) বড় শহরের পুলিশ বিভাগের প্রধানকে বলা হতো কোতোয়াল।

(৪) হাল আমলের সি আই ডি, ডিবি'র কর্মকর্তাদের দায়িত্ব যাঁরা পালন করতেন, তাঁরা দারোগা-ই-দাগ নামে অভিহিত হতেন। তাঁর অধীনে কিছু নিম্নপদস্থ কর্মচারী কাজ করতেন।

www.pathagar.com

(ঝ) অন্যান্য বিভাগ ঃ

(১) দরবার, জৌলুস প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ককে বলা হতো মীরতোজক।

(২) ইমারত বিভাগের প্রধানকে বলা হতো মীর এমারৎ।

(৩) শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্বে যিনি থাকতেন, তিনি দারোগা সাহেব নামে অভিহিত হতেন। তাঁর অধীনে ছিলেন 'আমিন চৌকিয়াৎ।' প্রত্যেক চৌকিতে একজন 'আমিন চৌকিয়াৎ' দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন চৌকির প্রধান কর্মচারী।

(৪) প্রধান কানুনগো-সমগ্র ভূসম্পত্তির সাধারণ রেজিস্টার হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি ছিলেন প্রধান কানুনগো। তিনি ছিলেন বাদশাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁর অধীনে নায়েব, সেরেস্তাদার প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন।

সে সময়ে প্রধান প্রধান বিভাগের কার্যপ্রণালী ও কর্তব্য নিম্নলিখিত ভাবে নির্দেশিত ছিলো–

(১) দেওয়ান-প্রধান রাজস্ব সচিব দেওয়ান নামে অভিহিত হতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালের আগ পর্যন্ত 'দেওয়ান' পদবিধারী কর্মকর্তা রাজস্ব সচিবের দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। রাজস্ব ক্ষমতার দিক থেকে তিনি ছিলেন সুবাদারের কর্তৃত্বের বাইরে। তিনি স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে রাজস্ব সচিব হিসেবে কর্তব্য সম্পাদন করতেন। কর্তব্য সম্পাদনের পর তিনি বাদশাহর দরবারে উজিরের নিকট হিসাব দাখিল করতেন। রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো জটিলতা দেখা দিলে উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কাজ করতেন। সুবাদার প্রয়োজন মত দেওয়ানের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। যদিও রাজস্বকার্যে সুবাদার হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। রাজ্যের আয়-ব্যয়ের সমগ্র ভার ছিলো দেওয়ানের ওপর ন্যস্ত। দেওয়ানী বিভাগের কর্মচারীগণ সম্পূর্ণভাবে বাদশাহী কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সুবেদারি আমল থেকেই এধরণের স্বতন্ত্র দেওয়ান নিয়োগের প্রথা ওঠে যায়। এর পিছনে বাদশাহর ক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারটিও জড়িত। মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজের নামে দেওয়ানি পদলিখিয়ে নিয়ে কার্যনির্বাহের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছিলেন। বাদশাহী দেওয়ানের জায়গীর ছিলো। পরবর্তীকালে এই জায়গীর ভোগই নবাবের আত্মীয় দেওয়ান বাহাদুরের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার হয়ে বাঙ্গলায় খাল্‌সা দেওয়ানের (রাজস্ব সচিবের) পদ নতুন করে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথম তিনি স্বয়ং এই বিভাগের কাজ পরিদর্শন করতেন। তাঁর নিজের অধীনে পেশকার পদবীধারী একজন কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীতে, দেওয়ান খাল্‌সা শরীফা নামে একজন দেওয়ানের হাতে এই বিভাগের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বাদশাহী দেওয়ানের স্থানে পরে ' দেওয়ান-ই-আলা' নামে একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত হন। খাল্‌সা দেওয়ানের কাজ বর্তমান রাজস্ব সচিবের মতো ছিলো না। রাজ্যের সমগ্র আয়-ব্যয় তিনি নির্বাহ করতেন। দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন

www.pathagar.com

তিনি। তবে রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ নিতেন। কখনো কখনো তিনি নিজে আবার কখনোবা তাঁর প্রতিনিধি দারোগা এই বিরোধের বিচার কার্য সম্পাদন করতেন।

২। প্রাদেশিক নায়েব-নাজিম–রাজকীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া অন্য সব কাজ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা ছিলো প্রাদেশিক নায়েব-নাজিমের। প্রাদেশিক নায়েব নাজিমগণের দেওয়ানগণের হাতে রাজস্ব বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রমও ন্যস্ত ছিলো। ফৌজদারগণ মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে নায়েব নাজিমের অধীনে ন্যস্ত হন। প্রাদেশিক নায়েব-নাজিমগণের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে জায়গির ছিলো।

৩। ফৌজদারি ও ফৌজদার–নবাবী আমলের সমগ্র বঙ্গদেশ দশটি ফৌজদারিতে বিভক্ত ছিলো। ফৌজদারিগুলো হলো ঃ ইসলামাবাদ (চট্রগ্রাম), শ্রীহট্ট, রাঙ্গামাটি, রঙ্গপুর, আকবর নগর (রাজমহল), জেলাল গড় (পূর্ণিয়া), রাজশাহী, মেদেনীপুর, বর্ধমান, বক্স বন্দর (হুগলি)। এছাড়া, মুর্শিদাবাদ শহরেও একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন।

৪। সদরস্ সদুর -সদরস্ সদুর ছিলেন সে আমলের একটি সুবার প্রধান বিচারপতি। প্রতিটি সুবায়ই একজন সদরস্ সদুর দায়িত্ব পালন করতেন। সদরস্ সদুর ছিলো আপীল আদালত। কাজীগণের বিচারে সন্তোষ্ট না হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ উল্লেখিত আপীল আদালতের শরণাপন্ন হতেন। মূর্খ ধর্মজ্ঞানহীন লোক যাতে কাজীর পদে আসীন না হতে পারে, কাজীর পদের অপব্যবহার করতে না পারে, সে দিকে উল্লিখিত আদালত নজরদারি করতেন।

৫। মোহ্তসীব–হাটে-বাজারে-বন্দরে ব্যবসায়ীগণের কর্মপরিধি পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন, বাজারদর নির্দিষ্ট করণ, ওজনের বাটখারাসহ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখাই ছিলো মোহ্তসীবের কাজ।

৬। সওয়ানে নেগার (Newes writer)-যাঁরা সংবাদ লিখতেন, তাঁদেরকে সওয়ানে নেগার বলা হতো। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই সংবাদ লেখকগণ নিয়োজিত থাকতেন। কোন্ স্থানে কি ঘটনা ঘটেছে, তা লিপিবদ্ধ করে নবাব বা বাদশাহ্র দরবারে প্রেরণ করাই ছিলো তাঁদের কাজ।

৭। প্রধান কানুনগো–প্রধান কানুনগো সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সুবাদার নিয়োজিত পরগণায়-কানুনগোগণ নিয়োজিত ছিলেন। পরগণা-কানুনগোদের হাতে যে সব দায়িত্ব ছিলো, সে গুলো হচ্ছেঃ–(১) দস্তুর উল্ আমল, (২) আমল দস্তুর, (৩) শাহী আমদানি, (৪) ফিরিস্ত দেহাৎ, (৫) দৌল তকসিস্ বন্দোবস্ত, (৬) আব্ওয়াব্গী, (৭) জমা সায়েব চবুতরা কোতয়ালী, মায়

www.pathagar.com

চৌকিয়াৎ ও গুজার ঘাট, (৮) জমাবন্দি খাস্, (৯) জমা মহল মীর বক্সী, (১০) জমা পাঁচ উৎরা, (১১) হকিকৎ বাজে জমা, (১২) ইস্মনবিসী জমিদারান্, (১৩) ওশুলবাকি, (১৪) হকিকৎ ফৌজদারান্, (১৫) জমা মোকরবী ও হস্তমুরারী।

নবাবী আমলে সামরিক বিভাগে কর্মচারী বেতন ও সৈন্য পরিসংখ্যান দেওয়ান থাকতেন। তিনি 'দিওয়ান-ই-তন্' নামে অভিহিত হতেন। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'Paymaster of the forces'। -

পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, কেবলমাত্র মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলেই নয়, মহারাজ সূর্যকান্তের আমলেও উল্লেখিত প্রশাসনিক বিন্যাস এবং রাজকীয় কার্যবিধি প্রচলিত ছিলো। কার্যকারক এই প্রশাসনের ক্ষেত্রে ছিলো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এক্ষণে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

মহারাজ সূর্যকান্ত বাহাদুর তাঁর জমিদারি কার্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী গ্রন্থের 'ব্যাপকতা ও ব্যাখ্যা ' অধ্যায়ে ১২৮৯ সনের নিয়মাবলী রহিতকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান নিয়মাবলী ময়মনসিংহ, ঢাকা, বগুড়া বহরমপুর, মালদহ, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, পাটনা ইত্যাদি জেলার অন্তর্গত মহল ও কাছারীর জেলা, সাবডিভিশন ও কোলকাতাস্থ মোক্তারগণের প্রতি প্রযোজ্য হবে বলে সূর্যকান্ত জানান।

প্রধান কার্যকারক সম্পর্কে আলোচ্য বইয়ে বলা হয়েছে। এতে প্রধান কার্যকারকের কর্তব্য ও তহবিলের দায়িত্ব সম্পর্কেও জানানো হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে যে, প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিনেই শেষ করতে হবে। প্রতিদিনের করণীর কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ডায়েরি বইতে লেখার কথা রয়েছে।

অধীনস্থ কর্মচারীদের অফিসিয়াল অসদাচরণ ও ত্রুটি ডায়েরি লিখে রাখার কথা ও তাদের প্রতি অন্যায়ভাবে বিরাগভাজন হয়ে কিছু লিখে রাখা সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। ডায়েরি ঠিকভাবে লেখা না হলে এজন্যে যে খেসারত দিতে হবে, সেকথাও বলা হয়েছে। এনটিডেট করলে দন্ড হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তোষাখানা ও হাবেলীরাস সময়ে সময়ে তদন্ত করার বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

প্রধান কার্যনির্বাহি অনুপস্থিত থাকলে যে দায়িত্ব পালন করবেন, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কোন কারণে শ্রীযুত কার্যভার অন্যকে দিতে না পারলে কার্যভার নিজের হাতে রাখার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। দেওয়ানের বিভাগ পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য, সার্কুলার জারীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সার্কুলার জারীর ক্ষমতার বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কি করতে হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দেওয়ানের বছরশেষে বাজেট প্রস্তুত করার ও দ্বিমাসিক রিপোর্ট দেবার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো নতুন ব্যয়ের প্রয়োজন হলে দেওয়ানকে সে রিপোর্ট

www.pathagar.com

করতে হবে, সেটিও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, দেওয়ানের ক্যাশ দেখে দ্বিমাসিক রিপোর্টে মন্তব্য লেখার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দেওয়ানের দ্বিমাসিক রিপোর্টে মুন্সিখানার কার্যের মন্তব্য লেখার কথাও বলা হয়েছে। সম্পত্তির স্বত্ত্বরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মোকদ্দমা, খাজনা, দাখিল ইত্যাদি বিষয়ে দেওয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। নতুন সম্পত্তি সম্পর্কে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। সরকারী অফিসের নিলামের সময় রিপোর্ট করার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

দেওয়ানের খোরাকি ও ভিক্ষার খরচ-চিঠি দস্তখতের ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। প্রধান কার্যনির্বাহিগণের মফস্বল কাছারী পরিদর্শনের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

প্রধান কার্যনির্বাহিগণের কাজের দোষ-ত্রুটি হলে শাস্তির প্রকৃতি কি হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি দন্ড হবে সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে জমিদার কার্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে।

'জমিদারি কার্যসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী' গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে 'সাধারণ বিধি'। 'সাধারণ বিধি'তে প্রয়োজন মত সিলমোহরের ও একের স্থলে অন্যের নিযুক্তির বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। অতিরিক্ত কাজের জন্যে মোহরের ও কর্মচারী নিযুক্ত করবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানান্তরে পত্র পাঠাতে কি করণীয় এবং ডাকে পত্র পাঠালে ব্যায়ারিং ইনসাফিসিয়েন্ট হলে তদন্তের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। খুন এবং মৃতদেহের ক্ষেত্রে পুলিশে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। প্রেরিত পত্রের অবিকল নকল রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেরেস্তার কাগজ অন্যত্র দেওয়ার প্রয়োজন হলে কিংবা জীর্নতা প্রযুক্ত কাজের অনুপযুক্ত হলে তা রাখার বিষয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। সরকারী পত্রে নিজের প্রার্থনা না লেখার বিষয়ে বিশেষভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পত্রাদিতে লেখকের নাম–ধাম ও পদোপাধি লেখার কথা বলা হয়েছে। কোন কার্যকারক স্থানান্তরে গমন করলে তার কর্তব্য কি হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রাত্যহিক উপস্থিতির বহি ও মাসিক বেতনের হিসেব রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কাছারীতে আগমনের ও প্রত্যাগমনের সময় নির্ধারণের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কার্যকারকের স্থানান্তর থাকার সময় খোরাকীর বিধি বিষয়েও বলা হয়েছে। কার্যকারকগণের অপরাধও তার দন্ডের কথাও উল্লেখ করা হেয়েছে। অন্যের অপরাধ গোপন না করার ও গোপন করলে দন্ডের বিষয়ে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

প্রজাদের নিকট পুরস্কার এবং উৎকোচ গ্রহণ করলে দন্ডের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রজাদেরকে উৎকোচ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের জন্যে সাময়িক নোটিশ জারীর বিষয়েও বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ না হলে সময় বৃদ্ধির এবং শৈথিল্যক্রমে কাজ না করলে দন্ডের কথা বলা হয়েছে। সেরেস্তার উর্ধ্বতন

www.pathagar.com

কার্যকারকের সেরেস্তা বিষয়ে দায়িত্বের কথাও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। দপ্তরীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

অফিসের গোপনীয় বিষয়ের গোপনীয়তা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গোপনীয়তা প্রকাশ করলে বিশেষ দন্ডের কথা বলা হয়েছে। উর্ধতন কার্যনির্বাহিগণের সেরেস্তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার কথা উল্লেখ রয়েছে। 'সাধারণ বিধি'তে জেলার মোক্তার ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর অপরাধ সরকারের প্রকাশ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি, উল্লেখ রয়েছে মোক্তারগণের সালকাবার পাঠানোর কথা। মোক্তারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে 'সাধারণ বিধি'তে। বিশেষতঃ শরিকী মহালের সদর খাজনাদি দাখিল সম্বন্ধে মোক্তারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ রয়েছে। ডিক্রীজারীর রেজেস্টারি বহি রাখার কথা এবং তিন মাস অন্তর অন্তর সে সম্পর্কে সদরে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠানোর কথাও 'সাধারণ বিধি'তে উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি, উল্লেখ রয়েছে মোক্তারগণের মাসকাবার পাঠানোর কথা । অনুগ্রহ বিদায়ের কথাও উল্লেখ রয়েছে। নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণের বিদায় প্রার্থনা যে প্রণালীতে করতে হবে, সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে। মফস্বলের আমলাগণ যেভাবে বিদায় প্রার্থনা করবে, সে সম্পর্কেও 'সাধারণ বিধি'তে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

প্রধান কার্যকারকগণের প্রাপ্ত বিদায় শেষে যে ধরণের ব্যবস্থা হবে ও তাদের বিদায় প্রার্থনা যেভাবে করতে হবে, সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে। বিদায় আরজী জারী সম্বন্ধে সেক্রেটারির দায়িত্ব ও কর্তব্য কথাও 'সাধারণ বিধি'তে উল্লেখ রয়েছে। ইজারার মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে পুনরায় বন্দোবস্ত নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। কোনো কার্যকারকগণের অন্য অফিস থেকে কাগজ-পত্র নিতে হলে তাঁর করণীয় কি হবে, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। টাকা প্রদান করলে যে তার রসিদ রাখতে হবে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট বলা আছে।

অধীনস্থ আমলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে, তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কাজের নির্দিষ্ট কার্যকারক ছাড়া অন্যের অনধিকার চর্চা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অনধিকার চর্চার দন্ডের কথাও বিশেষভাবে বলে দেয়া হয়েছে। বেতনভোগী ইজারাদারগণ দেয় খাজনার টাকা আত্মসাৎ করলে তার দন্ডের কথা বলা হয়েছে।

'সাধারণ বিধি'তে ইজারাদার ও কার্যকারকগণের কৃত নিস্পত্তির প্রতিকূলে আপীলের কথাও উল্লেখ রয়েছে। অধীনস্থগণের আচার-আচরণ ও চরিত্র সম্পর্কে উর্ধ্বতনের দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে। সেরেস্তার কাগজ-পত্র রেজেস্টারি বা ফিরিস্তি বিষয়েও বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি তলব চিঠি দস্তখতের প্রণালীর কথা উল্লেখ আছে। লিখিত রিপোর্ট স্পষ্ট ও পরিস্কার হতে হবে। লেখা যাতে কোনোভাবেই দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট না হয়। যে যে সেরেস্তার জারিয়াতে যে যে কাজে আসার কথা, তা নয় আসলে সে সম্পর্কে করণীয় ও দন্ডের কথা উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

সদরের আমলাগণের সর্বক্ষণ নিজ নিজ সেরেস্তার কাগজ-পত্র সম্পর্কে সুশৃঙ্খল মতামত রাখার কথা বলা আছে। তাছাড়া, অফিসিয়াল পত্রাদি লেখার ব্যাপারটি কিভাবে সম্পন্ন হবে, তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে। অস্থায়ী কার্যনির্বাহিগণ স্থায়ী কাজের বেতন যে পাবেন না, তা-ও বিশেষভাবে বলা আছে। দাখিলী টাকার চালানাদিতে ক্যাশ বিভাগের প্রধান কার্যকারকের দস্তখত করার বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে। খোরদার খরচ চিঠি সম্পর্কে করণীয় কি সেটিও স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সরকারের অনুমতি ছাড়া যে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, সেটিও উল্লেখিত হয়েছে।

প্রজাদের প্রদত্ত কবুলিয়তের নকল বহি রাখার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি , বলা হয়েছে প্রজাগণকে চেক দাখিলা দেয়ার কথা। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রিপোর্ট সর্ম্পকীয় কর্তব্যের বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। দেওয়ান ও জারী সেক্রেটারির ডায়েরি পরীক্ষার কথাও বলা আছে। ক্যাশ বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে জামিন নেওয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সদরের প্রধান কার্যকারক ও মফস্বলের নায়েবের অনুমতি ছাড়া কর্মচারীগণের জমি গতা-গত না করার কথাও বলা আছে।

মহালে আলাদা ভাবে সুদের কমিশন না দিয়ে প্রজার নামে বেনামে ঐ কমিশন দেওয়ার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। দেবোত্তরের কার্য সুচারুভাবে নির্বাহের এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বের বিষয়টিও বলা আছে। গোমস্তার কর্তব্য কি হবে, তা-ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গোমস্তার দেবসেবা ও অতিথি সেবা না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। দেবালয় পরিস্কার রাখার কথাও বিশেষ ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। ভোগের জিনিসপত্র বিষয়ে গোমস্তার দায়িত্বের কথাও বিশেষভাবে বলা আছে। অতিথি বিষয়ে গোমস্তার কর্তব্য কি হবে, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। প্রসাদ এবং শীতলাভোগ বিতরণের কথাও বলা আছে। দেবোত্তরের মহাল সম্বন্ধে গোমস্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব কি হবে, সে বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। দাদনের টাকা রিপোর্টের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। বাড়ির সেবাইতের মধ্যে কেউ দোষ-ক্রটি করলে গোমস্তা কর্তৃক দন্ডিত হবার কথাও বলা আছে।

ঠাকুরবাড়ী ও কালীবাড়ীর ভোগ হলে গোমস্তার কর্তব্য কি হবে, সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১২ টার মধ্যে ভোগ ও অতিথি সেবা সম্পাদনের কথা বলা আছে। বিগ্রহ সকলের অলঙ্কার রাখার প্রণালী ও লিস্ট তৈরির বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতি গোমস্তার অসরল ব্যবহার ও খাতির না করার কথাও বলা হয়েছে। দোল দুর্গোৎসবাদি নির্বাহের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। সোনা-রূপা ও তামা-কাঁসা ইত্যাদি বাসনের লিস্ট ও তা পরিস্কার রাখার ব্যাপাটিও আলোচনা করা হয়েছে। পর্বোপলক্ষে বিগ্রহদেরকে সাজানো ও সতর্কতা নেয়ার কথাও উল্লেখ আছে। আরও আছে প্রাতে বাল্যভোগের কথা।

দেবালয়ের কোন দ্রব্য কেউ উপহার দিলে কি করণীয়, সে সম্পর্কে বলা আছে। দেবালয় পরিস্কার সম্বন্ধে গোমস্তার করণীয় বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। পর্বোপলক্ষে

www.pathagar.com

আগত ফরমাইশী দ্রব্যের জমা ও কম-বেশী রিপোর্ট করার কথাও বলা আছে। ফরমাইশী দ্রব্যের জমা খরচ রাখার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেক পর্বের জমা-খরচ আলাদা রাখার কথা আছে। পর্বসমূহের কার্যনির্বাহার্থে যে সকল লোকের প্রয়োজন, তাদেরকে তলব দেওয়ার কথাও বলা রয়েছে।

প্রধান কার্যকারকের সামনে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীগণের বেতনের টাকা বন্টন করার প্রসঙ্গটিও উত্থাপিত হয়েছে। 'দেবোত্তর বিভাগ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দেনা-পাওনার হিসাব মাসে মাসে আপ টু ডেট রাখতে হবে এবং খরচ পত্র সম্পর্কে প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। পুরোহিতদের কর্মকান্ড পরিচালনা করার পর তাঁদের সম্মানী হিসেবে জিনিস-পত্র প্রদানের কথা বলা হয়েছে। 'মুন্সীখানা' অধ্যায়ে মুন্সীখানার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। মোক্তারগণের নিকট থেকে মাসকাবার ও সাল কাবার নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

পত্রের উত্তর পাঠানোর বিষয় ও আগত পত্রের রেজিস্টারি বহি রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। চেক, বিল ও হুন্ডি ইত্যাদি আসলে যেভাবে কাজ করতে হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। মহাফেজখানায় রাখার উপযুক্ত কাগজ আসলে তার কর্তব্যের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

পর্বোপলক্ষে মিছিল ইত্যাদির প্রয়োজন হলে মুন্সীগণকে যথাসময়ে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের নিকট এগুলো দিয়ে পাস গ্রহণ করতে হবে। যদি তাদের ত্রুটির জন্যে পাস নেয়া না হয় এবং সে কারণে কাজের ব্যাঘাত হয়, তাহলে মুন্সীদের ১ টাকা করে দন্ড হবে বলেও উল্লেখ করা হয়। শ্রীযুত স্থানান্তরে থাকলে পত্রাদি খোলার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেরেস্তায় ডাক টিকেট রাখার ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বেয়ারিং কি ইনসাফিসিয়েন্ট পত্র আসলে রাখার কথাও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বৃক্ষাদি লেনদেনের জন্যে প্রজার নামে ক্ষতি পূরণের নালিশের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আমমোক্তার নামার রেজিস্টারি বহি রাখার কথাও বলা হয়েছে। হেড মুন্সীর ক্ষমতা, তাঁর দায়িত্ব ও দন্ডের কথাও আলোচিত হয়েছে।

হস্তগত হওয়া পত্র সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ ও তাঁর উত্তর বিলম্বে গেলে সে সম্পর্কে কর্তব্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মোকদ্দমাদি সম্পর্কীয় জেলা মোকামের খোরদান খরচের ব্যবস্থা ও জমা-খরচের কথাও মুন্সীখানা অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। হেডমুন্সীর আপন ক্ষমতা ও দায়িত্বে কোন কোন কাজ করার কথাও 'হাবেলীরাস বিভাগ' অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। মহাফেজ খানা সম্পর্কে প্রধান কার্যকারকের কর্তব্যের কথাও বর্ণিত হয়েছে। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও ডিক্রিজারীর রেজিস্টারি বহি রাখার কথাও বলা হয়েছে।

গৃহাদি জীর্ণসংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্টে আলোচিত হয়েছে। কন্ট্রাক্ট দ্বারা কাজ করানোর কথাও 'হাবেলীরাস বিভাগ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধে নোটিশ দেওয়ার ও সে সম্পর্কে কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। কন্ট্রাক্ট-পত্রে মেয়াদ উল্লেখ ও

www.pathagar.com

কার্য নির্বাহের কথাও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। হাবেলীরাসের কার্যের এস্টিমেট এবং কার্যান্তে ব্যয়ের ন্যূনাধিক বিবরণ ঘটিত রিপোর্ট প্রদানের বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। এই বিভাগের মাস কাবা'র পাঠানোর কথাও বলা হয়েছে।

গৃহাদি মেরামত ও প্রস্তুতের এস্টিমেট দেওয়ার কথাও 'হাবেলীরাস বিভাগ'এ বর্ণিত হয়েছে। বাড়ি-ঘর পরিস্কার রাখার জন্যেও সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। অন্যথায় দন্ডের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। বাড়ির কোনো স্থানে দুর্গন্ধময় এবং স্যাঁতসেতে না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যেভাবেই হোক, পরিস্কার রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তা না হলে শাস্তি তথা দন্ডের কথা বলা হয়েছে। বাড়ির দালানের ছাদে বা দেওয়ালে ঘাস বা গাছ যাতে না হতে পারে, সেজন্যেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সালকাবার দাখিলের কথাও বলা হয়েছে। জিম্মায় জিনিস রাখলে, তা হারিয়ে গেলে কিংবা নষ্ট হলে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। অধীনস্থ ব্যক্তির করণীয় এবং স্বীয়কর্ম সম্পাদন কিংবা কর্তব্যে অবহেলা করলে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দন্ডিত হতে হবে, সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। অধীনস্ত ব্যক্তিগণ বিভাগীয় প্রধানের সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সংশোধিত না হলে, কি করতে হবে সে বিষয়েও 'হাবেলীরাস বিভাগ' এ আলোচিত হয়েছে। 'হাবেলীরাস বিভাগ' এ বিল প্রস্তুত ও তাঁর টাকা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। চাকরগণের হাজিরা বহি ওভারসিয়ারের সামনে রেজিস্ট্রি হওয়ার ব্যাপারটিও আলোচিত হয়েছে।

কন্ট্রাক্টটারের সাথে সরকারি কার্যকারকদের কোনো সম্পর্ক না রাখার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। শ্রীযুত যদি স্থানান্তর গমন করে, তাহলে যার জিম্মায় যে জিনিস থাকবে তার রসিদ রাখার ব্যাপারটিও বর্ণিত হয়েছে। 'হাবেলীরাস বিভাগ' এ কর্মচারীগণ ওভারসিয়রের অধীনে থাকতে বলা হয়েছে। কর্মচারীগণ ত্রুটি করলে, কি দন্ড হবে-তা-ও আলোচিত হয়েছে। ওভারসিয়রের তত্ত্বাবধায়ক প্রধান কার্যকারকের অধীনে থাকার বিষয়টিও বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ওভারসিয়রের নিয়মাবলী' বিধির সম্যক অধীনে থেকে কাজ করার কথাও বলা হয়েছে।

সদর আমীন ও জমাসেরেস্তার কি করণীয়, সে বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। মহাল জরিপের প্রয়োজন হলে শ্রীযুতের আদেশ নেওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। জরিপের আদেশ হলে, আমীন নির্বাচনের জন্যে নোটিশ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আমীন নিযুক্ত হলে জরিপের জন্যে দিন নির্ধারণের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। জরিপ কাগজ দাখিল করা হলে কি করতে হবে, তা-ও আলোচিত হয়েছে। আদেশ ছাড়া নিরিখ বৃদ্ধি বা বন্দোবস্ত পাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। জোত-জমি ক্রয়-বিক্রয় না হওয়ার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। দস্তখতের রেজিস্টারি বহি রাখার ব্যাপারেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এ-ও বলা হয়েছে যে, আমীনগণকে প্রতি সপ্তাহে খসড়া চিঠি দাখিল করতে হবে।

www.pathagar.com

আমীনগণকে সাবেক প্রজার নাম না লেখার ও হাল দাখিল কারকের নাম, দখলের কারণসহ কৈফিয়ত লিখে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। মুজরাই জমির রেজিস্টারি রাখতে হবে বলেও আলোচনা করা হয়েছে। জরিপ আমীনগণ রং-এর পরিবর্তন করে জমি কম-বেশী করলে আমলাগণের করণীয় কি হবে, সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে।

মফস্বলের জমা ওয়াশীল দাখিল হলে করণীয় কি, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। মেয়াদের মধ্যে কাগজ প্রাপ্ত না হলে শ্রীযুতের নিকট যথাসময়ে রিপোর্ট দাখিল করার কথাও বলা হয়েছে। তলবতৌজী প্রস্তুতের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। জমাওয়াশীল প্রস্তুত ও দেখানোর বিষয়েও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে পুনঃবন্দোবস্ত নেওয়ার কথা 'সদর আমীন বা জমাসেরেস্তা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বার্ষিক আয়ের কাগজ প্রস্তুত করবার কথাও বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ইজারাদারগণের মন্ডল কর্মচারী নিয়োগ ও অবসর সম্পর্কে সরকারের অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারটিও আলোচিত হয়েছে।

সর্ব প্রকার কাগজের লিস্ট রাখার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক জরিপী মহালের কাগজের নকল সেরেস্তায় রাখবার কথাও বলা হয়েছে। নামজারী করবার কথাও বলা হয়েছে। প্রজার জমির স্বত্ত্বভোগ ছাড়া অন্য ক্ষমতা রহিতের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। প্রজার সাথে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রফা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

কোম্পানি আমলে ময়মনসিংহ

মানুষ সমাজে সামাজিক স্বকীয়তাকেও ধ্বংস করে। প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় নতুন নিয়ম। সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তা প্রতিরোধ করে। তারপরও সামাজিক গতিধারার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্যে কোম্পানি আমল ছিলো বিরাট চ্যালেঞ্জ। ময়মনসিংহবাসীর জন্যেও স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি আমল চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাঁরা এ চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করেছিলো, তা অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে।

ইংরেজ শাসক, বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাংবাদিক, পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীগণ এই মর্মে একমত পোষণ করেন যে, বাঙলার জন্যে ইংরেজ শাসন কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছিলো। শান্তি ও প্রগতির অগ্রপথিক হিসেবে ইংরেজ শাসকদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাঁদের শোষণ-জুলুম-নির্যাতনকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়নি। শাসিত বাঙালি ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে কি অভিমত করেন, এক্ষেত্রে এটিও বিবেচ্য বিষয়। শাসকগণ তাঁদের শোষণকে আড়াল করে নিজ শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নানা ধরণের অপচেষ্টা চালায়। শাসক-শাসিত ও শোষিতদের অভিমতের দিকে না গিয়েও বস্তু নিষ্ঠভাবে যদি আমরা কোম্পানি আমলকে বিবেচনা করি, তাহলে একথাটি আমরা বলতে পারি যে, কোম্পানির রাজত্বের প্রথম দু'দশকে শাসকগণ শাসন নয়, দুঃশাসন চালিয়ে ছিলেন। অরাজকতা সৃষ্টি করে এাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। রাজস্বনীতি বলে কিছুই ছিলো না। রাজস্ব আদায়ে সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়ে ছিলো। অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিলো। সহায়-সম্বলহীন মানুষের সংখ্যা তখন বাড়ছিলো আশংকাজনক হারে। সে সময়ে ময়মনসিংহের অবস্থাও ছিলো করুণ। ময়মনসিংহের অনেক সম্পদ লোপাট ও পাচার হয়েছিলো। চরমদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে ছিলো চারদিকে। মৃত্যু বিভীষিকার করাল ছায়া দেখা দিয়েছিলো ময়মনসিংহের আকালে। কাজেই বাংলার অন্য সব এলাকার সাধারণ মানুষের মতো ময়মনসিংহের সকল স্তরের মানুষের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানানো সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে কর্ণওয়ালিস থেকে বেন্টিং এর আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত নতুন করে ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভূমিভিত্তিক সামাজিক কাঠামো বদলে যায়। বদলে যায় জনজীবনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট। প্রবর্তিত হয় নতুন শাসন ব্যবস্থা, পাল্টে যায় বিচার ব্যবস্থার খোলনলচে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। প্রথা প্রতিষ্ঠানেও পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। বিচারের নামে চলে অবিচার। সামাজিক প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সমূহ ভাঙাগড়া ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। জনজীবনে, সামাজিক অনাচার, চুরি, ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের নানামুখী প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সামাজিক দুর্বৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে প্রাকৃতিক রাজ্য সৃষ্টি করে। তাতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ময়মনসিংহের মানুষও উদ্বাস্তু ও উন্মূল হয়ে পরে। সহায় সম্বলহীন এসব মানুষগণ স্বাভাবিকভাবে প্রমাদগুণতে থাকে। ময়মনসিংহ বাসী স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পরে। বেন্টিংকের আমল থেকে সংস্কারের নামে দুঃশাসন চলে, জনদুর্ভোগ বাড়ে।

www.pathagar.com

খ্রিস্টধর্ম প্রচারের নামে মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মহীন ও ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলে। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের নামে মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুভূতিকে আহত করার চেষ্টা চালানো হয়। লাখেরাজ জমি নির্বিচারে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সামাজিক আভিজাত্যও এতে ক্ষুণ্ন ও সংক্ষুব্ধ হয়। অবাধ বাণিজ্যনীতির নামে বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকট তৈরি করা হয়। ব্রিটেনের কল-কারখানা থেকে জাত সস্তা পণ্য আনার ফলে দেশীয় পণ্য মার খেতে থাকে। এর বিরূপ প্রভাব পরে অর্থনীতিতে। সামাজিক শোষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ কায়েমের ফলে জনজীবনের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। ময়মনসিংহের সাধারণ মানুষও এতে অসহায় হয়ে পরে। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। সরকারের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে নীলকরদের অত্যাচার বেড়ে যায়। নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এরপরও বাংলার তথা ময়মনসিংহের মানুষ কিভাবে ইংরেজ শাসন-শোষণকে আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করে, তা আমাদের মাথায় আসে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত্ম, জনজীবনে দূর্ভোগ নেমে এসেছিলো। শাসকগণ এজন্যে নানা ধরণের অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাঙালির সামাজিক সত্তা, স্বকীয় ও স্বাধীনসত্তার ক্ষেত্রে কোম্পানি শাসন ছিলো বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। শাসনের প্রথম পর্বে দুঃশাসন, নিপীড়ন, নির্যাতন, দ্বিতীয় পর্বে সমাজবিন্যাসের উলটপালট, তৃতীয় পর্বে পুরাতনকে ভেঙে দিয়ে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে নতুন ভারত গড়ার পরিকল্পনা সবই ছিলো বাংলার সামাজিক জীবন ও ইতিহাস বহির্ভূত বিষয়। এটি যেকোনো বিবেচনায়ই অগ্রহণীয় ও নিন্দনীয়। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী শাসনকার্য পরিচালনা করে ছিলো এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। কোম্পানি আমলের ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। এ সম্পর্কে শাসকের পক্ষ থেকে বক্তব্য এনে কোম্পানি আমলকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, শাসিতের বক্তব্যকে বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় আনেনি ঐতিহাসিকগণ। নিঃসন্দেহে এটি একটি, ঐতিহাসিক সংকট। ব্রিটিশদের শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছিলো, তা ব্রিটিশ উৎস থেকেই জেনে নেওয়া সম্ভব। যদিও এ সম্পর্কে তথ্য উপাত্তের যোগান খুব বেশি নেই। ইংরেজদের প্রভাব–বলয়কে অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই ইংরেজ দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বাঙালিরা। ইংরেজদের রাজনৈতিক ও প্রভাববিস্তার ছিলো ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী। এর থেকে বাঙালিরা রেহাই পায়নি। অধিকন্তু, কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাগণ বেআইনী ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির স্বার্থে যতোটা কাজ করেছে, তার চেয়েও বেশি কাজ করেছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। বিদেশীদের চাপের মুখে দেশীবণিকগণ অধিকহারে শুল্ক দিতে বাধ্য হতো বলে দেশী বণিকগণ বিপাকে পরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভের সুচতুর কুট কৌশলের কাছে চরম মূল্য দিয়েছে বাংলা তথা ময়মনসিংহের সকল স্তরের মানুষ। ময়মনসিংহের ব্যবসায়ীদেরও এ জন্যে চরম মাশুল গুণতে হয়েছে। কোম্পানির মনোনীত এজেন্টও ছিলেন কোম্পানির তাঁবেদার । মুৎসুদ্দির উৎপাতও কম ছিলো না।

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রতিরোধ করার জন্যেও বাংলার বিভিন্ন জনপদের মানুষের মতো ময়মনসিংহে সতেচন অনেক মানুষ কাজ করেছিলেন। এ জন্যে অনেকে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু, সেই সংগ্রামী বীরদের সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছুই বলেননি ঐতিহাসিকগণ। বাংলার ইতিহাসের এই দুর্ভাগ্যজনক শূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পীড়া দেয়। সরকারি নথিপত্র ও বিবরণে এ সম্পর্কে প্রাপ্ত সীমিত আকারের তথ্যই আমাদের ভরসা। এ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করেই বলা যায় ইংরেজ শাসন শোষণ তথা কোম্পানি শাসনকে বাংলার মানুষ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কোম্পানি শাসন বাংলার ইতিহাসে দুর্ভাগ্যজনক এক অধ্যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমকালীন বাঙালি সমাজ মারাত্মকভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত ও বর্ণাশ্রয়ী ছিলো। বাঙালি সমাজকে স্বাভাবিকভাবেই বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। এক্ষেত্রে, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীগত চ্যালেঞ্জ কমছিলো না। ধর্ম, বর্ণ ও অঞ্চল ভেদ করে কোনো আন্দোলনই তাই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। জমিদার, রায়ত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অনুসারীগণ চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কারিগর, সেনাবাহিনীর সদস্যগণ সকলেই ব্রিটিশ শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো না কোন সময়ে ব্রিটিশ শাসন প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু, সমন্বয়হীনতার কারণে এই প্রতিরোধ সর্বাত্মক জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নিতে পারেনি। এটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। অবশ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমিত সুযোগ, শিক্ষার নিম্নহার, জাতীয়বাদী চিন্তাধারা বেগবান না হওয়া ও মানসিক প্রস্তু তিসহ সকলধরণের প্রস্তুতিও ছিলো কম। এসব বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তুতিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারলে ময়মনসিংহের মানুষও ইংরেজ শাসন প্রতিরোধে আন্দোলনে তাঁদের সাফল্যের খাতায় নতুন নতুন অনেক কিছু যোগ করতে সক্ষম হতো। তবে বাঙ্গালীদের ইংরেজ শাসন প্রতিরোধের চেতনাবোধ ছিলো না এটি কোনোভাবেই বলা যায় না। এটুকু বলা যায় যে, চিন্তা চেতনার উজ্জীবন যেভাবে হওয়ার দরকার ছিলো, সেভাবে হয়নি। মানুষের চেতনাবোধ স্থানীয় আচার-প্রথা-বর্ণভিত্তিক হওয়ার কারণে ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা তেমনভাবে সঞ্চারিত ও বিকশিত হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে জনগণ যে খুব একটা আগ্রহী ছিলো, তেমন বলারও কোনো সুযোগ নেই। স্থানীয় আচার, প্রথা–প্রতিষ্ঠান নিয়েই তাঁদের ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মোগল সরকারও স্থানীয় আচার, প্রথা–প্রতিষ্ঠানে হস্ত্মক্ষেপ করতেন না। কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় প্রথা–প্রতিষ্ঠানে হস্ত্মক্ষেপ করলে জনগণ তা প্রতিহত করতে উদ্যোগী হতেন। এ কারণেই মোগল সরকারকে মেনে নিতে জনগণের কোনো কারণেই আপত্তি ছিলো না। কিন্তু, ঔপনিবেশিক স্বার্থে স্থানীয় ব্যাপারে কোম্পানির সরকার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করতেন। বাঙালিরা সে হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে মরিয়া হয়ে। সে প্রতিরোধ আন্দোলনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মূল্যবান অংশগ্রহণ করে।

এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শাসন ব্যবস্থায় জমিদারগণই ছিলেন আঞ্চলিক প্রভু। জমিদারদের পুলিশী ও বিচারিক ক্ষমতাও ছিলো। কেবল মাত্র রাজস্ব সংগ্রহই তাঁদের কাজ ছিলো না। সোজা কথায় তাঁরা ছিলেন সরকারের স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রতিনিধি। সরকার জমিদারদের রায়তের প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করতেন এবং সেভাবেই তাঁদেরকে নিযুক্ত ও পরিচালনা করা হতো। জমিদারদের উপরে কেন্দ্রীয় সরকার ও নিচে রায়তশ্রেণী। ফলে, জমিদারদের মাপা পায়ে পথ চলতে হতো। উভয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কসূত্র রচনা করে তাঁদের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হতো। জমিদাররা কোনো কোনো রায়তদের স্বার্থও বিবেচনা করতেন এ জন্য যে, রায়তগণ ক্ষেপে গেলে এজন্যে তাঁদের চরম মাশুল গুণতে হবে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বিষয়টিও তাঁদের মনে রাখতে হতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা মনে না রাখলে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে বলে জমিদারদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও গুরুত্ব দিতে হতো। সরকার ও রায়তদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারদের কাজ করতে হতো। ফলে, তাঁদের দায়িত্ব ছিলো ঐতিহাসিক। কিন্তু, কোম্পানি সরকার প্রবর্তিত হওয়ার ফলে জমিদারদের ঐ ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মোগলদের ন্যায় ইংরেজ সরকার জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাঁদের বর্ধিত হারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা হয়। বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে ইজারা দেয়া হতো। ইংরেজ সরকারের এ নীতি জমিদারদের ক্ষুব্ধ করে। তারা কোনোভাবেই এটি মেনে নিতে পারেনি। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই জমিদারগণ কোম্পানি শাসনকে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। তবে সে প্রতিরোধ ছিলো সীমাবদ্ধ। ব্যক্তি ও অঞ্চলকেন্দ্রিক ছিলো সে প্রতিরোধ। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েও এ প্রতিরোধ কখনো কখনো স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলো। আবার কখনো কখনো সে প্রতিরোধ ছিলো নিরস্ত্র আইন অমান্য আন্দোলন। পরাক্রান্ত এই বৃহৎ জমিদার গোষ্ঠীর কেউ কেউ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে কোনো কোনো দুর্বল জমিদার, য়ারা দূর্বল এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র-তাঁরা তাঁদের আঞ্চলিক প্রভাব প্রয়োগ করে ইংরেজ শাসনকে অচল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সশস্ত্র জমিদারদের বিদ্রোহী আন্দোলনেরও সূত্রপাত করতে হয়। ডালভূম রাজাদের বিদ্রোহ সশস্ত্র প্রতিরোধকারী জমিদারদের সশস্ত্র প্রতিরোধেরই ফলশ্রুতি। পশ্চিম মেদেনীপুরের বিদ্রোহের এই প্রভাব ময়মনসিংহেও পড়ে। কোম্পানি নানা ধরণের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। দেওয়ানী লাভের ফলে প্রতি বছর রাজস্ব হার বাড়তে থাকে। এর ফলে জমিদারগণ অতিরিক্ত চাপের মুখোমুখি হন। এই চাপের মুখেই ডালভূমের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজা তাঁর সুরক্ষিত ঘাটশিলা দূর্গ থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদাণ করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন যে, কোম্পানি শাসকদের অমানসিক ও নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা তিনি কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। এটি তাঁর মর্যাদা ও নিজস্ব অস্তিত্বের প্রতি সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং আঘাত। আরোপিত হস্তক্ষেপ, আঘাত ও বিধি ব্যবস্থা অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে রাজা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তার মধ্য দিয়ে কোম্পানি শাসনের স্বরূপই উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে জমিদারদের দ্রোহী মনোভাবের পুঞ্জিভূত ক্ষোভই প্রকাশিত হয়েছে। এ কথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রায়তদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জমিদারদেরই যদি এ ধরণের রোষানলে পড়তে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কতটা চরমে পৌঁছেছিলো-তা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

কোম্পানি শাসন আসলে ইংরেজদের আধিপত্যবাদ ও বাণিজ্যসুলভ কর্মকান্ডের অমানবিক উপাখ্যান। কোম্পানি শাসন আগের যে কোনো শাসন থেকেই জনস্বার্থ বিরোধী এবং নিবর্তন মূলক। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারগণ আসলে জনগণের মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রাজা ঘাটশিলা দুর্গ থেকে এইমর্মে ঘোষণা করেন যে, কোনো অবস্থাতেই তিনি ফিরিঙ্গিরাজ মেনে নেবেন না। শুধু তাই নয়, ফিরিঙ্গি রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্যে তিনি সকলকে আহবান জানান। বিদ্রোহ দমনের জন্যে সরকারও সচেষ্ট হন এবং অভিযান প্রেরণ করেন। বিদ্রোহের দাবানল এক পর্যায়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রাজা জগন্নাথের নেতৃত্বে এই সশস্ত্র প্রতিরোধ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকার জগন্নাথের সব দাবি দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হন, এবং তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা বজায় রেখে তাঁর অঞ্চলে নতুনভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে জমিদারদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণেরও মনোবল বেড়ে যায়।

জমিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হতে থাকেন। ময়মনসিংহের জমিদারগণও কম-বেশি সংগঠিত হচ্ছিলেন। এ সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদারদের সশস্ত্র প্রতিরোধ বাড়তে থাকে। সন্দীপ জমিদারদের বিদ্রোহ কোম্পানি শাসনকে আর একবার ঝাঁকুনি দেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলকাতার প্রভাবশালী বানিয়া জয়নারায়ণ ঘোষাল ও তাঁর ভাইপো গোকুল ঘোষাল ইংরেজ প্রভুদের দাবি মিটিয়ে সন্দিপের ইজারা লাভ করেন। পরবর্তীতে, সরকার থেকে তিনি জমিদারি লাভ করেন। বঞ্চিত জমিদারগণ তা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা প্রতিরোধী ভূমিকা পালন করেন। কৃষকগণও তাঁদের এই প্রতিরোধী ভূমিকাকে সমর্থন জানায়। ঘোষালদের নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য কৃষকদের উপর নানা ধরণের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তাঁদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালানো হয়। কৃষকদের উপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়। সে কর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে আদায় করা হতো। বঞ্চিত জমিদারগণ কৃষকদের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঘোষালদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে কৃষকদের উপর নানা ধরণের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কৃষকদের উপর আরোপ করা হয় অত্যাচারমূলক কর। এই কর সংগ্রহে অবলম্বন করা হয় নির্মম পন্থা । বঞ্চিত জমিদারেরা নির্যাতিত কৃষককুলের সহযোগিতায় ১৭৬৯ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সরকারও বিদ্রোহ ঠেকাতে দমন এবং দলননীতি অনুসরণ করেন। কয়েক দফা সিপাহী পাঠায় সরকার। বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র করতে সরকারি বাহিনীকে বেগ পেতে হলেও বাহিনীর সদস্যগণ শেষমেষ তা করতে সক্ষম হন। জমিদারদের ও ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁদের অধিকার। এরপরও ঘোষাল পরিবার উপরস্থ জমিদার হিসেবে টিকে থাকতে সক্ষম হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৭৫৯ সালের বিদ্রোহের পরও সন্দীপের জমিদাররা কয়েকবার সশস্ত্র প্রতিরোধ করে উপরস্থ জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেন। ১৭৮৬ সালে কালেক্টর রাউটন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, জমিদারদের দমন করতে হলে ও শিক্ষা দিতে হলে সামরিক অভিযান ছাড়া বিকল্প

www.pathagar.com

কোনো পথ খোলা নেই। হাতিয়া ও সন্দিপের জমিদারগণ ১৭৮৭ সালে সম্মিলিতভাবে সরকারের অত্যাচারমূলক 'লবণনীতি'র বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং লবণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মচারীদের এলাকা থেকে বহিস্কার করেন। লবণ শ্রমিক, যারা 'মুলঙ্গী' নামে পরিচিত, তাদেরকে হাতিয়া ও সন্দীপের জমিদারগণ লবণ ইজারাদারদের নানা প্রকারের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন। এর প্রভাব ময়মনসিংহেও পড়ে। জমিদারগণ বিদ্রোহ করেছেন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। তাঁদের সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা ছিলো না। জমিদারগণের উপর অন্যায়ভাবে মাত্রা অতিরিক্ত রাজস্ব কর ধার্য করা হয় এবং সরকারি রাজস্বের চাপ সহ্য করতে না পেরেই জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধে অংশ নেন। সশস্ত্রপন্থা অবলম্বনকারী জমিদারদের সংখ্যা অবশ্য সীমিত। অধিকাংশ জমিদারই ব্রিটিশ বিরোধিতা করলেও চরমপন্থা অবলম্বন না করে অন্যভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

একপর্যায়ে জমিদারদের প্রতি কোম্পানী আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আমরা ১৭৭২ সালে দেওয়ানী নিজ হাতে নেয়ার পর কোম্পানি যে রাজস্বনীতি অবলম্বন করেছিলো, তা মনে করতে পারি। জমিদারদের স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুন্ন করার জন্যে কোম্পানি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জেলায় জেলায় ইউরোপীয় কালেক্টর নিয়োগের ব্যাপারটি। এর ফলে জমিদারদের স্বাধীনতা অনেকটা কমে আসে এবং পাঁচসনা নিলামি বন্দোবস্তের ফলে অধিকাংশ জমিদারি জমিদারদের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তা ফটকাবাজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই ফটকাবাজ ইজারাদারগণ অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকায় অবতীর্ন হন। জমিদারদের তখন প্রাপ্য ছিলো কেবল মাসোহারা। জমিদারদের সম্পদ যাচাই করার জন্যে ১৭৮৬ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি 'আমিনি কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। জমিদারদের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব চাপিয়ে দেয়াই ছিলো এই তদন্ত কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য। দিনে দিনে বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্যে কোম্পানি বারবার তার রাজস্বনীতি পরিবর্তন করে। দেখা গেলো যে মোগল আমলে জমিদারদের যে ক্ষমতা ছিলো, কোম্পানী আমলে এসে তা আর থাকলো না। জমিদারদের সমূলে উৎখাত করাই ছিলো কোম্পানীর উদ্দেশ্য। কোম্পানি সরকার জমিদারদের উৎখাত করার হীন ও সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মর্মে প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হয় যে, জমির মালিক জমিদারগণ নন, জমির মালিক সরকার। জমিদারগণ তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই এর বিরোধিতা করেন। অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ ও জমিদারদের উৎখাত করার অঘোষিত নীতি অবলম্বন করে কোম্পানী। এই নীতির যাতে সফল বাস্তবায়ন না ঘটতে পারে, সেজন্য জমিদারগণ গ্রহণ করতে থাকেন প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এ জন্যে জমিদারগণ বিভিন্ন অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জমিদারগণের বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে ছিলো নানা অজুহাতে সরকারি রাজস্ব বাকী রাখা। জমিদারগণ তাঁদের উপর চরম চাপ প্রয়োগের আগ পর্যন্ত রাজস্ব বাকী রাখতেন। জমিদারগণ ইজারাদারদের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে, জমিদারগণ ইজারাদারদের উপর

www.pathagar.com

আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিলেন না। অযাচিত ইজারাদারদের বিরুদ্ধে রায়তদেরকে উস্কিয়ে দিতেও জমিদারগণ কার্পন্য করতেন না। জমিদারগণ রায়তের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে জমিদারগণ সরকারকে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতেননা। বরং, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর ক্ষেত্রে জমিদারগণ বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। সরকারি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে তাদেরকে হয়রানি করার ক্ষেত্রেও জমিদারগণ ভূমিকা পালন করেন। জমিদারগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজনে ভূমি জরিপ, ভূমিদখল, বাটোয়ারা ইত্যাদি ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েও সরকারকে সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকেন। কারণ সরকারকে অসহযোগিতা করাই ছিলো তাঁদের ব্রত। এ ছাড়াও সরকারকে অসহযোগিতা করার জন্যে জমিদারগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। সরকারি নীতি ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষেত্রে জমিদারগণ বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন, সরকারকে অসহযোগিতা করে। জমিদারগণ তাঁদের দাবি আদায়ে সক্ষম হন। সরকার এ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, জমিদারদের বাদ দিয়ে কোনো ভূমিনীতি সফল করা সম্ভব নয়। ১৭৮৪ সালের পীট্স ইন্ডিয়া অ্যাক্ট জমিদার অধিকার স্বীকার করে নেয়। এদিকে, কোর্ট অব ডাইরেক্টস কলকাতা সরকারকে ১৭৮৬ সালে ভূমি নিয়ন্ত্রনের নির্দেশ দেয়। জমিদারদের অধিকার মেনে নেবার কথা বলে। জমিদারগণ যাতে চিরস্থায়ীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত পায় সেজন্যেও সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়। এক পর্যায়ে কোম্পানির সরকার অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, জমিদারদের স্থানীয় প্রভাব খুব বেশি এবং স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় অফিসার তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বিশাল রাজ্য শাসন করতে পারবে না। কোম্পানি সরকার উপয়ান্ত না দেখেই ১৭৯৩ সালে জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে বাধ্য হয়। অন্য এলাকার জমিদারদের মতো ময়মনসিংহের জমিদারগণও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে যান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো বড় একটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জমিদারগণ আশ্চর্যভাবে সফল হন। এদিকে সরকার এই মর্মে প্রচার কাজ চালাতে থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জন্যে চিরাট এক আশীর্বাদ। কারণ, এই বন্দোবস্ত দেয়ার ফলে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। চিরকালের জন্যে একই হারে রাজস্ব দেবার সুযোগ লাভ করে। তাঁদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি হয় অপরিবর্তনীয় রাজস্ব দেবার। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জমিদারদের বক্তব্য ছিলো ভিন্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম শর্ত ছিলো যে, জমিদারদের নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করতে হবে। সরকারি রাজস্ব কোনো ভাবেই বাকি রাখা যাবে না। রাজস্ব বাকি পড়লে জমি নিলামে চড়িয়ে রাজস্ব আদায় করা হবে। জমিদারগণ এই কঠিন শর্ত মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে, তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে, বাংলাদেশের মতো একটি মওসুমী বৃষ্টি নির্ভর কৃষি অর্থনীতির দেশে এ ধরণের শর্ত কঠিন বললেও কম বলা হয়, বরং বলা যায় মারাত্মক। খরা, বন্যা তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই ভুখন্ডের ফি বছরের নিয়তি। এটি এমন একটি দেশ, যেখানে খরা ও প্লাবন আসে পালাক্রমে । সরকার যদি এই শর্ত বজায় রাখে, খাজনা অনাদায়ে জমিদারি নিলামে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। জমিদারগণ রাজস্ব মওকুফের জন্যে বিভিন্ন ধরণের যুক্তি উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেন যে, মোগল আমলে ফসল নষ্ট হলে রাজস্ব মওকুফ করে

www.pathagar.com

দেওয়া হতো। পরবর্তীতে, ফসল ভালো হলে বাড়তি হারে রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিদারদের জন্যে এটি ছিলো একটা সুযোগ। কোম্পানি সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠিন শর্ত আরোপ করার সে সুযোগ আর থাকলো না। মোগল আমলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজস্ব আদায় বাকি থাকলে সেজন্যে জমিদারি নিলামে চড়তো না। কিন্তু, কোম্পানি আমলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠিন ও কঠোর শর্ত আরোপ করায় সে সুযোগ আর থাকলো না। মোগল আমলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে রাজস্ব আদায় বাকী থাকলে সে জন্যে জমিদারি নিলামে চড়তো না।

কিন্তু কোম্পানি আমলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠিন ও কঠোর শর্ত আরোপ করায় সে সুযোগ আর থাকলো না। জমিদারগণ স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়েন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক বিদ্রোহের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে জমিদারদের মোগল আমলে উচ্ছেদ করা হতো না। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের মাত্রা অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপকে জমিদারগণ সরকারের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করলেন। জমিদারগণ এই মর্মে যুক্তি উত্থাপন করেন যে, মৌসুমী বৃষ্টি যেহেতু সব সময় হয় না, সেহেতু জমিদারদের পক্ষে সব সময় নিয়মিত সরকারকে রাজস্ব প্রদান করাও সম্ভব নয়। এদিকে, 'সূর্যাস্ত আইনের' প্রতিবাদে জমিদারগণ জেলায় জেলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ময়মনসিংহ জেলাও এই প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ থেকে বাদ পড়েনি। জমিদারগণ 'সূর্যাস্ত আইনের' প্রতিবাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানান। ময়মনসিংহের জমিদারগণও এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে বাধ্য হন। কোনো কোনো জমিদার কালেক্টরের চাপে জমিদারী গ্রহণ করেন নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে আরো বেশি ক্ষুদ্ধ হন এজন্যে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে রায়তদের উপর জমিদারগণ নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেললেন। কেননা নতুন আইনে রায়তের উপর কোনো ধরণের অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের সুযোগ থাকলো না। রায়তদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা, বলপূর্বক খাজনা আদায় করা, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রোক করা কিংবা অন্য কোনো প্রাকারে রায়তদের উপর জুলুম করা নতুন আইনে দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। জমিদারগণ এই মর্মে আরো অভিযোগ করেন যে, নতুন আইনে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা জমিদারদের জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে তালুকদারদের উপর জমিদারদের কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রন থাকলো না। তালুকদারগণ বলতে গেলে জমিদারগণের নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা হয়ে পড়লেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে তালুকদারদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্তের বিধান রাখা হয়। তালুকদারদের উপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে জমিদারগণ হতাশ ও ক্ষুদ্ধ হন। উল্লেখিত আইনসমূহ জমিদারগণ রুখে দাঁড়ান এবং প্রতিরোধে উদ্যোগী হন। জমিদারদের প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন সংশোধন করতে বাধ্য হয়। প্রজাদের উপর জমিদারদের সর্বময় ক্ষমতা দান করা হয়ে ছিলো ১৭৯৯ সালে পঞ্চম আইনে এবং ১৮১২ সালের পঞ্চম আইনে।

ইতিহাসের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ব্রিটিশ শাসনে জমিদারি প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জমিদারদের

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতি ও পাল্টে যায়। আগের প্রতিক্রিয়া ছিলো আঞ্চলিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু এবারও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় কোনো প্রকার অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারেনি। অর্থাৎ দাবি-দাওয়ার জন্যে কোনো প্রকার কাঠামো তখনো পর্যন্ত রচিত হয়নি। সেজন্যে ব্যক্তির অসন্তোষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ারও কোনো সুযোগ ছিলো না।

ত্রিশের দশকে এসে পাল্টে যায় প্রেক্ষাপট, বদলে যায় দৃশ্যপট। জমিদারদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জেগে উঠতে থাকে এবং ময়মনসিংহের জমিদারদের মধ্যেও শ্রেণীচেতনা সে সময়ে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। জমিদারগণ বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে শ্রেণীচেতনা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কয়েকটি সমস্যাই জমিদারদের মধ্যে এই উপলব্ধির জন্ম দেয়। সরকার ১৮২৮ সাল থেকে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে এক অভিযানের গোড়াপত্তন ঘটায়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোগল ভূমিব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির কারণে বলতে গেলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি লাখেরাজ বা নিষ্কর হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষা, দরগা, পীর, মন্দির, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতিপালনের জন্যে ভূমি লাখেরাজ দেয়ার ব্যবস্থা ছিলো। কোম্পানি সরকারও এই লাখেরাজ জমির বৈধতা স্বীকার করে নিয়ে ছিলো। কিন্তু, সরকার ১৮১৮ সালে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে আইন পাশ করেছিলো। উল্লেখ করা যেতেপারে যে, বেন্টিংকের আমলে সেই আইন ব্যাপক ভাবে কার্যকরিও হয়। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হন। কেননা সব জমিদারের দখলেই কম-বেশি লাখেরাজ বা নিষ্কর জমি ছিলো। জমিদারগণ তাঁদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই উল্লেখিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানায়। এজন্যে জমিদারগণ ১৮৩৮ সালে 'Landholder's society' নামে একটি সংগঠনও করেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাই ছিলো এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। দেশীয় জমিদারদের পাশাপাশি ইউরোপীয় জমিদারগণও এই সংগঠনে যোগ দেন। কেননা ইউরোপীয় জমিদারদের স্বার্থও এতে নিহিত ছিলো। মূলতঃ ইউরোপীয় জমিদার ও নীলকরেরাই দেশীয় জমিদারদের এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকান্ডও দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ইউরোপীয় জমিদারদের আঁতাতের অন্য একটি কারণ। মিশনারিরা এক পর্যায়ে রায়তের পক্ষ নেয়। এদিকে, আবার জমিদারদের শোষণ- নির্যাতন ও উৎপীড়নের স্বরূপ সরকার ও ইংল্যান্ডের জনগণের কাছে মিশনারিরা তুলে ধরেন। তাঁরা দেশী-বিদেশী জমিদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রায়তদের রক্ষা করার জন্যে বিভিন্নভাবে প্রচারকার্য চালাতে থাকে। মিশনারিদের বিরুদ্ধে জমিদারগণও পাল্টা সংগঠন করে এবং প্রচারকার্য চালাতে থাকে। এলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন জমিদারগণ। এলক্ষ্যে জমিদারদের পরিচালিত সংগঠন এবং পত্র-পত্রিকাও কাজ করতে থাকে। এভাবে জমিদারদের সাংগঠনিক শক্তিও বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও জমিদারগণ সরকারি নীতির বিরুদ্ধে তদ্‌বির করার জন্যে ডেলিগেশন পাঠায় এবং এর প্রতিকার দাবি করে। বাধ্য হয়েই জমিদারদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে বাধ্য হয়। ১৮৪৩ সালে এসে সরকার লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বন্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

কোম্পানি আমলে রাজস্বনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো ক্রমাগত রাজস্ববৃদ্ধি করা। জমিদারগণ এ বিষয়টিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা রায়তদের উপর এই রাজস্বের চাপ প্রয়োগ করেননি। জমিদারগণ যথাসম্ভব নিজের ক্ষতি স্বীকার করে হলেও রায়তদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বাড়াননি। কারণ, এতে করে রায়তদের সীমাহীন দুর্ভোগ বাড়বে। রায়তগণ স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি আমলের কর্মকান্ডকে মেনে নেননি। বরং, জমিদারদের বন্ধু, এবং কোম্পানি সরকারের লোকদের শত্রু ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, রায়তের স্বার্থবিরোধী কাজ করাই ছিলো কোম্পানি সরকারের লক্ষ্য। নিজেদের স্বার্থ হাসিল ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য কোম্পানি সরকারের ছিলো না। এজন্যে জমিদার এবং রায়তদের উপর নিবর্তনমূলক ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সরকারের দ্বিধা কিংবা সংশয় ছিলো না। জমিদারগণ মহাজন থেকে ধার এনে কোম্পানি সরকারের রাজস্ব দাবি মেটাতে সচেষ্ট ছিলেন। রাজস্ববৃদ্ধিকে জমিদারগণ সম্মানহানিকর বলে বিবেচনা করতেন। এটি যে রায়তদের জন্যে সমূহ ক্ষতির কারণ এবং রেওয়াজ বিরুদ্ধ এবিষয়টিও জমিদারগণ বিস্মৃত ছিলেন না। কিন্তু, জমিদারদের মত এই বিবেচনাবোধ ইজারাদারদের ছিলো না। ইজারাদারদের মনোযোগ একটি ব্যাপারেই নিবিষ্ট ছিলো, আর তা হচ্ছে কি করে সবচে' বেশি খাজনা আদায় করা যায়। যে সব রায়ত ইজারাদারদের এ্যাস্টেটের অধীনে ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত। আর এ কারণেই স্থানীয় বেদখল জমিদারগণ বাধ্য হয় উৎপীড়িত রায়তদের সংগঠিত করেছিলেন ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে। ইজারাদারদের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক বৃটিশদের বিরুদ্ধে ও জনমত তৈরিতে বেদখল জমিদারগণ সচেষ্ট ছিলেন। অনেক বিদ্রোহী জমিদারও রায়তদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ফলে, আমরা দেখতে পাই যে, সন্দীপ ও মেদিনীপুরের জমিদার বিদ্রোহে রায়তরাও যোগ দিয়েছিলেন এবং জমিদারদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ছিলেন। রংপুরের রায়তবিদ্রোহ (১৭৮৩) রায়তদের সংগঠিত বিদ্রোহের ফলশ্রুতি। তবে, এটি সত্য যে, রায়তগণ সশস্ত্র প্রতিরোধে জড়িয়ে ছিলেন কম। রায়তগণ জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণীর বিদ্রোহে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। রায়তগণ নিজেদের উদ্যোগে খুব একটা লিপ্ত হননি। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহেও রায়তদের সক্রিয় সহযোগিতার কথা আমরা মনে করতে পারি।

আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, বিষ্ণুপুর বিদ্রোহে রায়তশ্রেণী দস্যুদের সঙ্গে আঁতাত করতেও কুণ্ঠিত হননি। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্রিটিশ রাজস্ব নীতি রায়তদের অতিষ্ঠ করে তুলে ছিলো। বৃহত্তর শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের কৌশল হিসেবে রায়তগণ বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়েছিলেন। আমরা এটিও লক্ষ্য করেছি যে, সরকার যখন জনগণের দাবি-দাওয়া মেনে নিলো, তখন আমরা রায়তগণকে দস্যু হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হই। প্রকৃতপক্ষে, রায়তগণ আত্মরক্ষার্থেই ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। যে কোনো বিদ্রোহই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ, রায়তগণ এমনটি ভাবতেন। আর এ কারণেই যে কোনো বিদ্রোহের প্রতি আমরা রায়ত শ্রেণীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সমর্থন লক্ষ্য করি।

www.pathagar.com

বাইশ পরগণা হস্তান্তর

বাইশ পরগণা হস্তান্তর ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলো। ইতিহাসের ব্যাকরণ ও গতির স্বাভাবিক নিয়মেই বাইশ পরগণা হস্তান্তরিত হয়ে ছিলো। ময়মনসিংহের ইতিহাসের নতুন গতিপথ সৃষ্টিতে বাইশপরগণা হস্তান্তরের ভূমিকা অভাবনীয়। মুঘলদের বাংলা বিজয়ের পূর্ব হতে এবং পরেও আমরা লক্ষ্য করেছি বারোভূঁইয়াদের উৎপত্তি। মূলতঃ মুসলমান শাসনকাল বাংলাদেশের ভূঁইয়াদেরযুগ বললে বোধহয় ভুল হবেনা। এই ভূঁইয়াদের সংখ্যা মূলতঃ বারো এর অধিক ছিলো। নানা কারণে পন্ডিতগণ এর সংখ্যা বারোই বলেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এমত পোষণ করেন যে, "বারোভূঁইয়াগণের সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকার কারণেই তাঁদের বারোজন বলা হতো"। ইতিহাসের, 'Border line sitution'-তৈরিতে ও 'subjective meaning'-এর স্বার্থে বারভূঁইয়াগণ বারোজন না হলেও বারোজন। এরা ইতিহাসের সত্যমোহনায় মিলিত হয়েছেন।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে হিন্দুগণ বারো সংখ্যাটি পবিত্র জ্ঞান করতো এবং দ্বাদশ রাজার সম্মিলনও তাঁদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব। সুপ্রাচীন কাল থেকে ১২ জন সামন্ত রাজের প্রসঙ্গ চলে আসছে। মনুসংহিতার মাধ্যমে জানাযায় যে, মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানা সম্বন্ধযুক্ত বারো প্রকার নৃপতি ছিলেন, বাংলার মতো আসামে বারোজন রাজা বা মন্ত্রী না হলে রাজ্যশাসন চলতো না। আরাকান, শ্যাম দেশে রাজপ্রধানের অভিষেক সম্পন্ন হতে আবশ্যক হতো বারোজন ভূঁইয়া। তবে কোনো লেখকই বারোজন ভূঁইয়ার সঠিক তথ্য উপস্থাপনে বোধহয় এপর্যন্ত সফল হতে পারেনি। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে আধুনিকযুগেও বোধহয় আমরা এই বারো এর বলয়হতে বেরুতে পারিনি। এই সেদিন দেশের কুখ্যাত নরঘাতক এরশাদ শিকদারের ফাঁসিপর্বটি (১০-০৫-২০০৪ রাত ১২.১ মিনিট) কার্যকর করার সময় খুলনা জেলখানায় ১২ জন অস্ত্রধারী সৈনিকের উপস্থিতির প্রয়োজনছিলো। আলোচিত বারো সংখ্যাটির সঠিক ইতিহাস উদঘাটনের দায়িত্বভার পেশাদার গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কাছে ছেড়েদিলাম,কেননা এবিষয়টি তাঁরাই সঠিকভাবে তুলে আনতে সক্ষম হবেন। একথা ঠিক যে, ভূঁইয়াগণ প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন। আবার এটাও সত্য যে, সব ভূঁইয়ারা দেশপ্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেননি। তাঁরা তিন যুগেরও বেশী সময়ধরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। এঁরা আঞ্চলিক শক্তিরুপে প্রায় দু'শতাব্দি কাল জুড়ে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হন। এখানে শুধুমাত্র মসনদে আলা ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিষয়েই আলোচিত হলোঃ

"ঈসা খাঁ দি গ্রেট" মারা যাবার পর তাঁর ২২ পরগণা তারই বংশধরগন শাসন করতেন ঠিক, তবে তাদের দুর্বল প্রশাসন, বিভিন্ন অভিযোগের কারনে (রাজস্ব অনাদায়) মুর্শিদাবাদ নবাবদের অধিকারে চলে যাওয়া ও পরবর্তীতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক নিলামে বিক্রিত হওয়ায় এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের জরিপ রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে

www.pathagar.com

১। **আলেফশাহী ঃ** সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বড়বাজুর চন্দ ও পুটিজানার রায় পরিবারের হাতে চলে যায়। এটি নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য কিনেনেন যথাক্রমে পুটিজানার রামচন্দ্র রায় ও ভবানী রায়ের নিকট হতে ছয় আনা। লোকিয়ার বিনোদ রায় চন্দের কাছ থেকে দশ আনা অংশ। পরে অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্থকালীন এই পরগনার সদর জমা ৬৫৩৯৩/- টাকা ধার্য হয়। যার পরিমাণ ফল দাঁড়ায় ৫১০·২৪ বর্গ মাইল।

২। **মোমেনশাহী ঃ** মঙ্গলসিদ্ধি গ্রামে বাস করতো দত্তবংশীয় নরপতিগণ। তাঁদের কাছ থেকে নবাব আলীবর্দী খার সময় কৌশলে এ্যাস্টেটের খাজনা বাকী দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী গৌরিপুর, রামগোপালপুর, ভবানীপুর, গোলকপুর, কালীপুর, কৃষ্ণপুর, বাসাবাড়ি, ধানকুড়া, ডৌহাখোলা প্রভৃতি এলাকা কিনেনেন। এসময় জাফরশাহী পরগনাসমেত সদর জমা ধরা হয় ১২৩৬০৬/- আর মোমেনশাহীর পরিমাণ ফল দাড়ায় ৬০৩·৭৮ বর্গমাইল।

৩। **হোসেনশাহী ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি প্রথমে রাজস্ব অনাদায়ে নিলামের মাধ্যমে নাটোর রাজগণের হস্তগত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ নিলামের বলী হন। তখোন খাজে আরাতুন নামক আর্মেনিয়াম বণিক এ পরগনা ক্রয় করেন। আরাতুন মারা গেলে তার ছেলে-মেয়েরা স্টিফেন্স কেসপার্ক, মিসএজিনা ও মিস কেথেরিন নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে থাকেন। কিছুদিন পর জমিদারি বিক্রয় প্রস্তাব উঠলে, আঠারোবাড়ির শম্ভুনাথরায় কেসপার্জের অংশ, মোহিনীমোহন রায় কেথেরিনের অংশ, নীলকর মিঃ ওয়াইজ ও গোবিন্দদত্ত মিলে মিস এজিনার অংশ এবং মিঃ ওয়াইজ আলাদা এবং এককভাবে স্টিফিনসের অংশ ক্রয় করেনেন। ইতিহাসের কলংক মিঃ ওয়াইজ দেশ ত্যাগ করার সময় মুক্তাগাছার জমিদার রামকিশোর আচার্যের নিকট ছয় আনা গাঙ্গাটিয়ার দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মসুয়ার হরিকিশোর রায়, সরারচরের জয়গোবিন্দ রায় নরসিংদী জেলার বেলাবস্থ নীলকুটির অধ্যক্ষ মিঃ টি.টি. কেলানোজের নিকট বাকী অংশ বিক্রয় করেন। রামকিশোর মারা গেলে তাঁর অংশ পান তাঁর পুত্র জগৎকিশোর রায়। তখোন তিনি ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং ঋনগ্রস্থ। ফলে, সম্পত্তি চলে যায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর অধীন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ্যাস্টেট গুলো বিভিন্নজন কিনেনেন। সবচেয়ে বেশী অংশ ক্রয় করেন আঠারোবাড়ির তালুকদারগণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পরগনার সদর জমা ছিলো ৪৫,৪৫৭/- টাকা পনের আনা। পরিমাণ ৩২৫.৪৩ বর্গমাইল ছিলো।

৪। **বড়বাজু ঃ** ঐতিহাসিকগন মনে করেন বড়বাজু ছিলো এককালে সর্ববৃহৎ পরগনা। টাঙ্গাইল জেলার আটিয়া ও কাগমারি এ পরগনাভুক্ত ছিলো। ঈসা খাঁর পূর্বে সম্রাট আকবর করোটিয়ার জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ সাঈদ খাঁ পন্নিকে জায়গির হিসেবে নিয়োগ দেন। সাঈদ খাঁ পন্নি বিখ্যাত তাপস বাবা আদম কাশ্মিরীর মাজার শরীফ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করেন। যার বার্ষিক আয় ছিলো ১৫,০০০/- হাজার টাকা। তাছাড়া সম্রাট আকবর শাহেজামান হযরত মাহি সওয়ারকে কাগমারি

www.pathagar.com

পরগণা লাখেরাজ হিসেবে দান করেন। হযরত ছিলেন সংসার বিমুখ মানুষ। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য বাফলা গ্রামবাসী যাদবেন্দ্র রায়ের হাতে এই পরগনার দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেছিলেন। যাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ইন্দ্রণারায়ন রায় ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হন এনায়েতউল্লাহ চৌধুরী নাম ধারণ করে পরগনার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন পর পবিত্র হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভুমে গমন করলে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ পাবার পর তাঁর ভাইয়ের ছেলে বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী পরিবারের সকল সদস্যগনকে হত্যা করে নিজে ঐ পরগনার অধিকার লাভ করে। ঈসা খাঁর এ্যাস্টেট, তার বংশধরদের হাত হতে চলে গিয়েছিলো বেলকুচির পীর মোহাম্মদ আফজালের হাতে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১ এপ্রিল এই পরগনার নয় আনা অংশ পাবনার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট পাঁচ আনা মোমেনশাহী জেলার ২৬ নম্বর জমিদারির আওতায় চলে আসে।

৫। ভাওয়াল বাজু ও তপ্পে রণভাওয়াল ঃ ভাওয়াল পূর্ব থেকেই গাজীদের অধিকারে ছিলো। ঈসা খাঁ কখোনও এ ভুখন্ডে হস্তক্ষেপ করেননি। গাজীগণ ঈসা খাঁর সবচেয়ে নিকটজন ছিলেন। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র রণভাওয়াল তাঁর বংশধরগণ আলেফশাহী পরগনার অন্তর্ভূক্ত করেছিলো। এদিকে দৌলত গাজী হজ্জব্রত পালনের জন্য পূণ্যভূমি মক্কা গমন করলে বিশ্বাসঘাতক নায়েব বলরাম রায় রাজস্ব বকেয়া দেখিয়ে মুর্শিদাবাদে জমিদারি নিলামে উঠিয়ে তাঁর নামে বন্দোবস্ত নিয়ে আসে। জমিদারি ফিরে পাবার জন্য দৌলত গাজীর পৌত্র ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুখ্যাত গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সাথে সাক্ষাত করেও সফল কাম হতে পারেনি। এ পরগণা ছিলো ৩১৮.০৩ বর্গমাইল।

৬। শেরপুর দশকাহনিয়া ঃ বৃহৎ মোমেনসাহী জেলার মধ্যে এ পরগণাটি ছিলো সুবৃহৎ পরগণা। ষোড়শ শতাব্দিতে ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে শেরপুর যেতে হলে গুদারার মাসুল দিতে হতো দশ কাহনকড়ি। তাই এ পরগণার নাম হয়েছিলো শেরপুর দশকাহনিয়া। এতেই বুঝা যায় ব্রহ্মপুত্র নদ সেসময় কতটুকু প্রশস্ত ছিলো। ভাওয়ালের ফজল গাজীর পুত্র শেরই-গাজী ছিলেন এই পরগণার প্রশাসক। শেরইগাজীর মৃত্যুর পর এ পরগণা রামনাথ নন্দীর হস্তগত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ পরগণার মালিক হন দাস বংশীয় জমিদারগণ। এর কিছুকাল পর মুক্তাগাছা ও কালীপুরের জমিদারগণ কিনে নেন এই পরগণা। যার সদর জমা ছিলো ২৪,৪৭৪/- তিন আনা ও পরিমাণ ৭৮৯.২৫ বর্গমাইল।

৭। সায়র জলকর ঃ

(ক) খালিয়াজুড়ি ঃ আইন-ই-আকবরী হতে জানাযায় এ পরগণাটি দু'ভাগে বিভক্ত। মসনদে আলার মৃত্যুর পর এটি মজলিশ বংশের হাতে চলে যায় ও পরে আস্তে আস্তে হোমবংশের অধিকারে আসে। এসময় মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব অনাদায়ে এ মহালটি খাসভুক্ত করেন এবং পরে হিন্দুমুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে জায়গীর দান করেন। বাংলা ১২০৪ সালে জমিদারগণ ঋণের দায়ে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ খাজা ওয়ালেস নামক এক আর্মেনিয়ান বনিকের কাছে ৫,০০০/- বিক্রি করেন। বাকী অর্ধেক নয়বছর মেয়াদী

www.pathagar.com

লিজ প্রদান করেন। লিজ প্রদানের কিছুদিন পর লিজদাতাগণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরনের মামলা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, জমিদারি রক্ষার জন্য মদন থানার কদমশ্রী গ্রামের আখতারজামান চৌধুরী ও শিবচরণ দত্তের নামে বেনামীয় কাওলা সম্পাদন করিয়ে নেন। এদিকে দায়েরকৃত মামলায় ওয়ালেসের পক্ষে ডিক্রি জারী ও মহালক্রোক করা হয়। মূল মালিকগণ এবারও দূরভিসন্ধির ফন্দি এটে ১২১৫ সনে মানিকগঞ্জের ধানকুড়ার জমিদার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণের নিকট বিক্রয় করে দেন। বাকী অংশ আখতারজামান আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত হন। তিনিও পরে কিশোরগঞ্জের নিকলী নিবাসী দামপাড়ার বজলুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। এদিকে মিঃ ওয়ালেসের মৃত্যুর পর তাঁর দু'কন্যা এক অংশ করোটিয়ার জমিদার সাদত আলী খাঁ পন্নির কাছে ২২,০০০/-টাকায় এবং অপর অংশ ৩২,০০০/-টাকায় বিক্রয় করেন ধানকুরার জমিদারগণের নিকট। যার পরিমাণ ফল ৪৩০.৬১ বর্গ মাইল।

৮। **জঙ্গনশাহী ঃ** স্বাধীন সুলতান হোসেনশাহের ভাই জঙ্গনউদ্দীন শাহের নামে এই পরগণা। পাঠান শাসনামলে মনোয়ার খাঁ এটি লাভ করেন ও পরে তাঁর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ দেলোয়ার খাঁ ইটনায় বসবাসকালীন ওই পরগণা শাসনকরতে থাকেন। মনোয়ার খাঁ অষ্টগ্রামের নূর হায়দারের নিকট বিক্রয় করেন ছয়আনার উপর অংশ ও বাকী অংশ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে রেভিন্যু বোর্ড এর অধীন চলে যায়। এই দু'অংশ নয় কোষা ও দশ কোষা নামে পরিচিত। বেশকিছুদিন পর এই জমিদারি রাজস্ব অনাদায়ে নিলামে ওঠে অষ্টগ্রামের কালীকাপ্রসাদ মুন্সী দশকোষা ও নয়কোষা ইটনার জমিদারির হস্তগত হয়। জলমহাল ছাড়া এই এ্যাস্টেটের বার্ষিক ভূমি রাজস্ব ছিলো ১২০০/-টাকা।

দীর্ঘ ২৫ বছর ১২০৩ থেকে ১২২৮ পর্যন্ত উল্লিখিত জমিদারির অধিকাংশ তালুক বিভিন্নজনের নিকট হস্তান্তরিতের পর সরকার ২৩,০০০/-টাকা মূল্যে পুনঃ ক্রয়করে নেন। এদিকে ১২২০ সালে কালীপ্রসাদ মুন্সী দশকোষা জমিদারি খাজা নিকোলাস মার্করের (ঢাকা) কাছে বিক্রয় করেন। একই তালুক পরে বিক্রি করেদেন নিকোলাস, খাজা আবদুল গনির নিকট আটআনা ও বাকী অংশ যথাক্রমে মুক্তাগাছার জমিদার সুর্যকান্ত আচার্য দুই আনা সতের গন্ডা দুই কড়া আমবাড়ীয়ার হেমচন্দ্র চৌধুরী পাঁচ আনা দু'গন্ডা দু'কড়া কিনেনেন। এপরগনার পরিমাণ ফল ২৪৬.৪৪ বর্গমাইল।

৯। **নসরত উজিয়াল ঃ** ফতেপুরের দেওয়ান নামে পরিচিত রোয়াইলবাড়ির জমিদার দেওয়ান ফতেহইয়ার খাঁ। ০৬.০১০ আনা হিস্যা নিয়ে ১২২৬ বাংলাসনে একরকম চরমদূর্দশায় পরেন অর্থ কষ্টের । ফলে ১৮০০খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই এই বৃহৎ পরগনা কুড়িটি অংশে বিভক্ত হয়ে পরে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করার মতোঃ নওয়াপাড়া, আধার মানিক, মুক্তাগাছা, কোরাটি, কৃষ্ণপুর, ভবানীপুর, আঠারবাড়ী, ধানকুরা ইত্যাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবোস্তের সময় এ পরগনার রাজস্ব ২০,০৮৬.০৬ আনা ও পরিমাণ ফল ১৯৪.১৬ বর্গমাইল ছিলো।

১০। **হাজরাদী ঃ** কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে রাজত্ব করতেন কোচবংশীয় রাজা নক্ষণহাজরা। তাই তাঁর নামেই এই হাজরাদী। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলাস্থাপনের সময়

www.pathagar.com

আসাল্য খাঁর বংশধরগণ ছয় আনার মালিক হন। পাঁচ আনা খোদাদাত খাঁ, ও বাকী অংশ খোদানওয়াজ খাঁ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এসকল জমিদারগণ তাঁদের অধীনস্থ এ্যাস্টেট রক্ষা করতে পারেনি। ফলে, জমিদারির ষোলআনাই ইস্তফা দেন। এগুলো সরকার পরবর্তীতে খাসখতিয়ানভুক্ত করে তালুকিস্বত্বে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। এর রাজস্ব বার্ষিক ৩৫২৯ দশমিক সাত আনা ধার্যছিলো। পরিমাণ ছিলো ৩২২.০৭ বর্গমাইল।

১১। **বরদাখাল ও গঙ্গামন্ডল ঃ** এ পরগণা দু'টি ঈশা খাঁর জমিদারিভুক্ত ছিলো। নিয়ন্ত্রিত হতো সোনারগাঁ থেকে। আগা সাদেক ছিলেন এদু'টো পরগণার মালিক। শুধু তাই নয়, তিনি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাটের নিকট থেকে পাইটকারা পরগনার মালিকানা স্বত্বও লাভ করেন। মুর্শিদকুলীর সময়ের রাজস্ব তালিকায় দেখানো হয়েছে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে আগাসাদেকের পুত্র মির্যাভেল বরদাখাল ও গঙ্গা মন্ডলের জমিদার ছিলেন। এদিকে সাদেকের অন্য এক আত্মীয় আবদুল হোসেন পাইটকারা পরগনার জমিদার ছিলেন। এ সময় এগুলোর রাজস্ব ধরা হয় ৯৪,৬৩৮ টাকা। আলোচিত জমিদারগণ ছিলেন অমিতব্যয়ি, অলস প্রকৃতির। ফলে রাজস্ব বাকীর কারণে পরগণার বেশীরভাগ অংশ হাতছাড়া হয়ে যায় ঢাকার নবাবদের হাতে। অবশিষ্ট তালুক নতুনভাবে সৃষ্টি হয় যার সংখ্যা ছিলো ৫২টি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে আগাসাদেক ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে কিছুই আর থাকলোনা তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

১২। **বলদখাল ও কুড়িখাই ঃ** এ দুটি পরগনা যথাক্রমে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরাজুড়ে বিস্তারিত। ময়মনসিংহ জেলায় যে পরগণা ছিলো সেটির পরিচিতি তপেকুড়িখাই। ঈসাখাঁ বংশের দেওয়ান আদম খাঁ ছিলেন এটির স্বত্বাধিকারী। তিনি বাজিতপুর শহর অন্তর্গত ভাগলপুরে স্থায়িনিবাস তৈরি করে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁরই পঞ্চমপুরুষ এওয়াজ মহম্মদের নামে স্বত্বলিপি দেখাযায়। পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নবাব কর্তৃক রাজস্ব অনাদায়ে এ্যাস্টেট বাজেয়াপ্ত হয়। একই বছর দেওয়ান গওছ খাঁ (গাউস খাঁ) কুড়িখাই পরগনার মালিক হন। এটি আবার ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান ইব্রাহিমের সময় নিলামে ওঠলে মুক্তাগাছার জমিদার ভবানীকিশোর আচার্য কিনে নেন। ভবানী কিশোর এই জমির অধিকারে গেলে ত্রিপুরার জমিদার (নুরনগর) রঘুনাথ রায়ের সংগে উলুকান্দির চরে (বর্তমান ভৈরব বাজার) ভীষণ দাঙ্গা বাঁধে। এই দাঙ্গায় উভয়পক্ষের এতলোক ক্ষয় হয়েছিলো যে, মেঘনা নদীর জলরক্তরঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলো। পরগণাটির বার্ষিক জমা ছিলো ১০৯১০/- পনের আনা।

১৩। **জাফরশাহী ঃ** মসনদে আলার মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরসুরীগণ কোন অবস্থাতেই তাঁদের পূর্বঅবস্থানে ফিরে যেতে বা সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেননি। এ পরগণার বেশীর ভাগ জায়গাই ছিলো বর্তমান রংপুর জেলায় অবস্থিত। রাজস্ব অনাদায়ের কারণে এ পরগনাটিও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন মির্জা মুহাম্মদ আলিবর্দি নাম ধারণ করে রাজ্য শাসন করছিলেন। তাঁর সিংহাসনে বসার পেছনে

www.pathagar.com

অবদান ছিলো শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের। তাই নবাব মুক্তাগাছা জমিদারির পাশাপাশি জাফরশাহী পরগনাও হস্তান্তর করেন এবং এর সাথে জমিদারি সনদও লাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য। এ পরগণার পরিমাণ ফল ছিলো ২৫৩.৬১ বর্গমাইল।

সতের শতক থেকে আঠারো শতক শুধুমাত্র বাঙলার নবাবী আমলেই জমিদারিগুলো হস্তান্তরিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলে বোধহয় ভুল হবে। কেননা এ সময়ে আমরা দেখতে পাই বাঙলায় সমুত্থিত মহাবিপ্লব সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ রাজনৈতিক তরঙ্গাভিঘাতে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলিত ও প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা যায় ঈশা খাঁ ও গাজীগণের বংশধরগণ দিবানিশি বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকতেন, কর নিজ নিজ জমিদারি ও প্রজাহিত কাজে তারা সময় ব্যয় করতেন না। নিয়োজিত হিন্দু কর্মচারীগণের কার্যাদির পর্যবেক্ষণ করার অবসরটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। যথাসময়ে বাদশাহী রাজস্ব পরিশোধে অক্ষমও ছিলেন। এ অক্ষমতার কারণে জমিদারগণকে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো ঢাকা অথবা মুর্শিদাবাদে। যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা রাজস্ব পরিশোধে অক্ষম থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এসকল জমিদারগণকে কারারুদ্ধ অবস্থায় থেকে নির্যাতন ভোগ করতে হতো। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, এ নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের জন্য অনেক জমিদার তাঁদের জমিদারি ইস্তফা দিয়েছেন, মুক্তির পথ বেছে নিয়েছেন নির্যাতনের হাত থেকে। এভাবেই জমিদারি হস্তান্তরিত হতে থাকে একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ, সৃষ্টি হলো আরো একটি নতুন ইতিহাস। বাঙ্গলার শাসন প্রণালীর নবযুগের সূত্রপাত, ইংরাজাধিপত্যের নতুন সংযোজন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলমের কাছ থেকে সাম্রাজ্য কেড়েনিলে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' হয় দেশের প্রকৃত মালিক বা প্রভু। এরপর ছ'বছর কাল ১৭৬৫-৭২ পর্যন্ত সমগ্র দেশছিলো এক অরাজক অবস্থানে। তখন ওয়ারেণ হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর। তিনি রেজা খানকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে মিডলটনকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলেন। এদিকে প্রাচীন জমিদারগণ নিরুপায়। কারণ পূর্বে তাঁরা যে কর বার্ষিক হারে প্রদান করতেন, তা বৃদ্ধি পেল। মিঃটন রাজস্ব বিভাগের প্রধান হয়েই পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হারে রাজস্ব পরিশোধ করতে হবে মর্মে ফরমান জারি করেন। ফলে রাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো। মিঃ হেস্টিংস চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করলেন। এটি "Committee of Circuit" নামে পরিচিত। রেজা খঁ রাজস্ব বৃদ্ধি করে 'অত্যাচারী' আখ্যা পেয়েছিলেন। এরপর মিডলটন অত্যাচারের মাত্র আরও বৃদ্ধি করলেন। এবার 'কমিটি অব সার্কুইট' মিডলটনকেও ছাড়িয়ে গেলেন ফলে যেসকল জমিদার রাজস্ব প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন, সেসকল জমিদারগণ টিকে থাকলো কোনক্রমে, আর বাকী অন্যেরা ঝরে পড়লো। দেশে সর্বত্রই নতুন নতুন জমিদার গজিয়ে ওঠলো। নতুন জমিদারগণ জমিদারি পেয়ে প্রজাসাধারণের অং শোষণে বাধ্য হলেন ইংরেজ প্রভুদের খুশী করাসহ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সজিবত আনয়নে। "কমিটি অব সার্কুইটের" ইজারাপ্রাপ্ত জমিদারগণ পুরাতন জমিদারগণে সংগে বিবাদে লিপ্ত হতেন। এ বিবাদ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতো যে, কো

www.pathagar.com

কোন জমিদার তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হতো আর এদিকে পরিত্যক্ত জমি পতিত অবস্থায় পরে থাকতেও দেখা যেতো। ইংরেজ কোম্পানি এ সকল বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁদের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ১৭৭৭-৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একসনা ইজারাবন্দোবস্ত্ম প্রথা চালু করা হলো। ফলে হেস্টিংসের ইজারাদারি ১৭৭২-৭৭ থিওরি চরমভাবে ব্যর্থ হয়। সে সম্পর্কে প্রাদেশিক কাউন্সিল তাদের নিজ নিজ অভিমত জানালে কাউন্সিলপ্রধান ফিলিপ ডাকরেস রিপোর্ট দেন যে "বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ মহাদুর্ভিক্ষের জের, ধাতব মুদ্রা পাচার, কৃষির প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য এবং নিলাম ইজারাদার কর্তৃক নির্মম শোষণ"।

যাই হোক কোম্পানি বিভিন্নভাবে গবেষণাও চালাতে থাকলো, সেগুলো আমরা উল্লেখ করতে পারিঃ বার্ষিকী জমিদারি বন্দোবস্ত, ১৭৮৪ পিটস ইন্ডিয়া এ্যাকট, রাজস্ব পরিকল্পনা, ১৭৮৫ চার্লস স্টুয়ার্ট, চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত নির্দেশনামা, ১৭৮৬-১৭৮৮ তে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদার জোতদার ভূইয়া সৃস্টি করে অর্থাৎ কালেক্টর পদবির কর্মকর্তা সৃষ্টি করে তাদের কাছ থেকে Report সংগ্রহ করা হলো। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বাংলায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় দশ'সালা বন্দোবস্ত, যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত্ম হিসেবে গন্য।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার সূচনাপর্বে এইবিদ্রোহ-দাবানল সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। ময়মনসিংহও উত্তপ্ত এবং প্রকম্পিত হয়েছিলো এই বিদ্রোহের কারণে। সন্ন্যাসী ও প্রাক্তন মোগল সৈন্যগণ বিদ্রোহী কৃষকদের দলে যোগ দিয়ে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত ও সম্পাদন করেন। বিহার ও বাংলাদেশের ফকির সন্ন্যাসীগণ ইংরেজ বেনিয়াদের শোষণ ও নির্যাতনে ক্ষুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধ ও রুখে দাড়াঁবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইংরেজ বেনিয়াদের সমুচিত জবাব ও শাস্তি দেওয়ার জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ রুদ্ররোষে ফেটে পড়েছিলো।

সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মীর কাসিমের মৃত্যুর পর ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহারের দেওয়ানী গ্রহণ করে চরম প্রজাশোষণ শুরু করে। তারা শোষণের নানা কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। ফলে, সর্বস্তরের মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ ও নির্যাতন নেমে আসে। শুধু ইংরেজ বেনিয়াদের অত্যাচার নির্যাতন নয়, ইংরেজদের নির্যাতনের সঙ্গে যোগ হয় দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের নির্যাতন। দেনার দায়ে মহাজনদের কাছে, জমিদারদের খাজনা না পাওয়ায় কৃষক ও কারিগরদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়। কৃষক ও কারিগরগণ সর্বস্বান্ত ও বাস্তুভিটাহীন হয়ে পড়ে। কঠোর জীবন সংগ্রামের

www.pathagar.com

মুখোমুখি কৃষক ও কারিগরগণ বাঁচার তাগিদে দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। ফলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষদের। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষগণ জমিদার ও মহাজনদের খাদ্যগুদাম ও সঞ্চিত অর্থভান্ডার লুট করতে থাকে। এতে করে, কৃষকদের সঙ্গে জমিদার, মহাজন ও ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব বাংলার ফকির সন্ন্যাসীগণ বিদেশী বেনিয়াদের শোষণ নির্যাতনের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশাল মোগল বাহিনীর বিধ্বস্ত একটা অংশ বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। জীবিকার কঠিন তাগিদে তারা নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও হীনলিপ্সায় লিপ্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সশস্ত্র হামলা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা দিনাতিপাত করছিল।

সময়ের প্রয়োজনে সন্ন্যাসী ও প্রাক্তন মোগল সৈন্যগণ বিদ্রোহী কৃষকদের দলে যোগ দেন। এভাবেই ভিত্তি গড়ে ওঠে সসস্ত্র সংগ্রামের। এই সংগ্রাম 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় এই সংগ্রাম দিনে দিনে ব্যাপ্তি লাভ করে। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ ঘনীভূত হতে থাকে। ইংরেজ শাসকগণ স্বাভাবিকভাবেই শংকিত হয়ে পড়ে এবং অনেক যুদ্ধে তারা পরাজিতও হয়। জান-মালের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কোনো কোনো জায়গায় রাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো ভেঙে যায়। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে পাটনা। পাটনার আশে-পাশের ইংরেজ কুঠিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বন্ধকরে দেয়া হয় ইংরেজ শাসকদের রাজস্ব আদায়। জমিদারগণও কুপোকাৎ হয়ে পড়ে। লুটপাট করা হয় তাদের ধন-সম্পদ। বারবার পরাজিত হতে থাকে ইংরেজবাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে পড়েন গভর্ণর লর্ড হেস্টিংস। কয়েকটি দুর্গও বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। এদিকে বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় বিদ্রোহীদের দু'টি ঘাঁটি স্থাপিত হলে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্যে আমরা দিনাজপুরের বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ দলের কথা বর্ণনা করতে পারি।

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ হাজার বিদ্রোহীর সমন্বয়ে একটি দুর্ধস্য সন্ন্যাসীদল গঠিত হলে ইংরেজ সৈন্যগণ প্রমাদ গুণে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ইংরেজ সৈন্যগণ। দিনাজপুর মহারাজার অনুরোধে বিশাল ইংরেজবাহিনী কামানও অস্ত্রসহ দিনাজপুরে প্রবেশ করে। বিদ্রোহীগণ খন্ড খন্ড দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অত্যাচারী জমিদারগণ ভীতসন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীগণ জমিদার-মহাজনদের ধন-সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন করতে থাকে। এ সময়ই ময়মনসিংহ জেলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে দিনাজপুর জেলার বিদ্রোহীদের একটি দল মিলিত হয়। ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়। দিনাজপুর ও বগুড়ার বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ময়মনসিংহের বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ এভাবেই আরও প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ এক পর্যায়ে বিপ্লবে রূপনেয়। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়। জমিদারী-মহাজনী লুণ্ঠন ব্যবস্থায় ময়মনসিংহ এমনিতেই ত্রাসের রাজত্বে পরিণত হয়। বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের পর্যায়ে রূপ নেয়। বিদ্রোহী টিপুশাহ পাগলের নেতৃত্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহে বিশাল ফকির বিদ্রোহ শুরু হয় এবং স্বঘোষিত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয় শেরপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোন্ কোন্ এলাকায়। এমনিতেই শেরপুরের জমিদারদের অত্যাচারে জনগণের প্রাণ ছিলো ওষ্ঠাগত। ফলে, টিপু পাগলের নেতত্বে ফকির বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। শেরপুরের জমিদার ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের ধনসম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠিত হতে থাকে। শেরপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের যে সব জায়গায় স্বশাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিলো, তা দু'বছর পর্যন্ত চালুছিলো। এ প্রসঙ্গে আমরা শেরপুরের সে সময়ের উচ্চ কোটি গোষ্ঠির পন্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণের রচনায় আলোচ্য অভিনব শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

'বকসু আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার কালেক্টর সরকার গুমানু সরকার'। ১৮২৫ সালের দিকে পন্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ এ মন্তব্য করেছিলো। এ মন্তব্য থেকে সে সময়ের অবস্থা নিঃসন্দেহে অনুমান করাযায়। এমনিতর পরিস্থিতিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের আইন-শৃঙ্খলা এবং শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শেরপুরের গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে যায়। বিশৃঙ্খল অবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার অনেক আগেই দমননীতি অনুসরণ করে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে কালীগঞ্জে (পুরাতন শেরপুর বাজার) ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট এবং বিদ্রোহীদের দমন ও ছত্রভঙ্গ করার জন্যে শেরপুরে সেনাছাউনী স্থাপন করেন। মিঃ ম্যাক্সওয়েল (মেকসুল) কালীগঞ্জে প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

কৃষকবিদ্রোহ তথা ময়মনসিংহে পাগলপন্থী ফকির বিদ্রোহের প্রধান নেতা টিপুশাহ পাগলকে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার করা হয়। সেসন আদালতে তাঁর বিচার হয়। বিচারে টিপুশাহ পাগলকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, ১২৫৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কারাগারে টিপুশাহ পাগলের মৃত্যু হয়।

গাজীপুর জেলার ভাওয়ালগড়ে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহীদের একটি শক্তিশালী আস্তানা গড়ে ওঠে। ফকির মজনুশাহ ছিলেন এই বিদ্রোহীবাহিনীর নেতা। এই আস্তানা থেকেই বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের অনেক জায়গায় ইংরেজ কুঠিগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অভিযান পরিচালিত হয়। বলাবাহুল্য, এঅভিযান ছিলো সাফল্যজনক। অভিযানে স্থানীয় জমিদারদের কাছারীগুলোও লুণ্ঠিত হয়। অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারদের নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়ের কাজটিও চলতে থাকে এসময়। বিদ্রোহীগণ কোনো অবস্থাতেই সাধারণ মানুষদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেনি। বরং, তাদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে। তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটিও সন্ন্যাসী-ফকিরগণ বিশেষভাবে নিশ্চিত করেন। ইংরেজ বণিকদের ও ইংরেজ সরকারের অনেক দেশীয় কর্মচারীদের সমর্থন লাভ করেন সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ।

তখন ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ। বগুড়ায় নিজস্ব ঘাঁটিতে বসে আছেন মজনুশাহ। এসময় খবর আসে যে, ইংরেজদের একটি বিশাল বাহিনী লটবহরসহ আসছে। মজনুশাহ

www.pathagar.com

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন। এজন্যে তিনি করতোয়া নদী পার হলেন। ময়মনসিংহ জেলার সীমানা ছাড়িয়ে হাজির হলেন ভাওয়ালগড়ের নিকটবর্তী। স্থাপন করলেন ঘাঁটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদল অতর্কিতে মজনুশাহের শিবিরের দিকে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সদলবলে মজনুশাহ ভাওয়াল জঙ্গলে পালিয়ে যান। ইংরেজবাহিনীও মজনুশাহর পিছনে ধাওয়া করে এবং জঙ্গলে প্রবেশ করে। এবারে মজনুবাহিনী ঘুরে ও রুখে দাঁড়ায়। ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে আবতীর্ণ হয় মজনুবাহিনী। এলড়াইয়ে অনেক ইংরেজসৈন্য মারা যায়। ইংরেজ সেনাপতি লেঃ রবার্টসন যুদ্ধে গুরুতর আহত হন এবং নিরুপায় হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। ইংরেজবাহিনী ও পিছু হটতে বাধ্য হয়। দিশেহারা ইংরেজবাহিনীর এই বেহাল দশা মজনুশাহ ও তাঁর দলবলকে দারুণভাবে উদ্দিপ্ত করে। তবে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মজনুশাহও দলবল নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে মজনুশাহ এক হাজার সৈন্যসহ বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ ও মধুপুর জঙ্গলে হাজির হন। মজনুশাহ মধুপুর গড় ও মধুপুরগড়ের নিকটবর্তী এলাকা ঘুরে এসে বিদ্রোহীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এরপর উত্তরাঞ্চল হয়ে উত্তর বাংলায় গমন করেন।

ময়মনসিংহ তথা ভাওয়ালগড় অঞ্চলে মজনুশাহ এসেছেন শুনে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস তাঁর সেনাপতি ও কালেক্টরকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন ঃ

"আমরা আবার জাফরশাহী পরগণায় (ময়মনসিংহ) মজনুর উপস্থিতির সংবাদ পাচ্ছি। আমরা প্রতিবছর এ লোকটার উৎপাত আর সহ্য করতে পারি না। শুনতে পাচ্ছি লোকটা নাকি ব্রহ্মপুত্রের উপর বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। আর প্রতিবছর কোম্পানীর জেলাগুলো পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দিচ্ছে। অথচ, কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারে না"। লর্ড হেস্টিংসের এধরণের মন্তব্য শুনে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মজনুশাহ বাহিনীর প্রতি তাঁর মনোভাব কতোটা বিরূপ ছিলো। ইংরেজদের কয়েকটি সেনাদল মজনুশাহকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে অকুস্থলে এসে হাজির হয়। কিন্তু, এর আগেই অর্থাৎ ইংরেজ সেনাদল ময়মনসিংহে এসে পৌঁছার আগেই মজনুশাহ তাঁর দলবল নিয়ে মালদহে পৌঁছেন।

ময়মনসিংহে যে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ হয়, তা ইংরেজ শাসক-শোষক ও জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, জনস্বার্থে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিলো এবং একপর্যায়ে তা বিপ্লবে রূপ নেয়। বাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলো, তেমনি ময়মনসিংহবাসীর স্বার্থেও সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিলো। ইংরেজ শাসক শোষক এবং জমিদার-মহাজনদের রুখে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বাংলার স্বাধিকার এবং স্বাধীনতার চেতনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ

আপাত দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও নিজের খেয়ালকে মূল্য দিতে গিয়ে মঙ্গলসিংহ তাঁর বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। মঙ্গলসিংহ পেশাগতভাবে ছিলেন একজন সিপাহী। পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত কারণে সৈনিক থেকে তাঁকে ডাকাত হতে হয়েছিলো এবং সৃষ্টি করতে হয়েছিলো ডাকাত দল। কিন্তু, তাঁর ডাকাত দল অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলো। বৃটিশ অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলসিংহ সৈনিক থেকে ডাকাত হয়েছিলেন। ইংরেজ বেনিয়াদের সমুচিত জবাব দেওয়া এবং তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার অদম্য ইচ্ছে থেকে সৈনিক থেকে ডাকাতের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিলো মঙ্গলসিংহকে। জমিদার মহাজন আর সুদখোরদের উচ্ছেদ করাই ছিলো তাঁর ব্রত। তিনি অত্যাচারী জমিদার তালুকদার মহাজন ও সুদখোরদের উচ্ছেদ করার জন্যে নিজের দলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন অনুভব করেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি রীতিমতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। জমিদার তালুকদার মহাজন আর সুদখোরদের সম্পদ তিনি নির্বিচারে লুণ্ঠন করতে থাকেন নিজের দলবল নিয়ে। অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের উৎখাত করার জন্যে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ ছিলো জনস্বার্থে, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী জনতার স্বার্থে। কাজেই এ বিদ্রোহ ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেহেতু ন্যায় সঙ্গত' সে বিবেচনায় মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহও ন্যায়সঙ্গত। এ বিদ্রোহ ব্যক্তিস্বার্থে নয়, জনস্বার্থেই নিবেদিত ছিলো। কাজেই মঙ্গলসিংহকে নিছক দস্যু বা ডাকাত হিসেবে মূল্যায়ন করলে তাঁকে খন্ডিত করা হবে। ইতিহাসের আলোকে আমরা অখন্ড মঙ্গলসিংহের দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করবো।

সৈনিকের তকমা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মঙ্গলসিংহ নিজের আস্তানা স্থাপন করেন গাজীপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের রণ ভাওয়াল অংশে। শুরু হলো এক লড়াকু, দ্রোহী ব্যক্তিত্বের ন্যায় ও সত্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তখন ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ। জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন, শুরু হয়ে গেলো মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ। জমিদার, তালুকদার, মহাজন আর সুদখোরগণ প্রমাদ গুণলেন। মঙ্গলসিংহ ও তাঁর দলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উল্লেখিত সামন্তপ্রভুগণ ইংরেজ সরকারের শরণাপন্ন হলেন এবং বদান্যতা প্রার্থনা করলেন। সরকারের নির্দেশে বরমী থানা পুলিশ মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে সেই সময়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেশ সক্রিয় ছিলেন এবং বর্মী থানা পুলিশকে মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে কড়া নির্দেশ দেন। পুলিশের প্রতিরোধের মুখে মঙ্গলসিংহ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশের সকল প্রতিরোধ ও তৎপরতা নষ্ট করে দিয়ে গোটা ভাওয়াল অঞ্চলে মঙ্গলসিংহ ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। সরকার, সরকারের প্রশাসক, সরকারের তাবেদার জমিদার শ্রেণী মঙ্গলসিংহের তৎপরতায় ভীতসন্ত্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে।

মঙ্গলসিংহের জন্যে একটি ব্যাপার আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। লুৎফুল্লা ছিলেন সেই সময়ের রণ ভাওয়ালের তালুকদার। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের অধিবাসী। তাঁর

www.pathagar.com

সঙ্গে ভাওয়ালের স্থানীয় ছোট তালুকদার ভৃগুরাম তালুকদারের সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ভৃগুরামকে সমুচিত শিক্ষা ও শায়েস্তা করার জন্যে লুৎফুল্লা মঙ্গলসিংহের সঙ্গে হাত মেলান, সন্ধি স্থাপন করেন এবং মঙ্গলসিংহকে সব দিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। লুৎফুল্লার সহযোগিতা মঙ্গলসিংহের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মঙ্গলসিংহের মনোবল অনেক বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে গোটা ভাওয়াল ছারখার করে ফেলেন মঙ্গলসিংহ। কেঁপে ওঠে ইংরেজ সরকার আর তাঁর তাবেদার অত্যাচারী জমিদার তালুকদারদের ভিত।

মঙ্গলসিংহের তৎপরতায় ইংরেজ সরকার উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে সরকার ম্যাজিস্ট্রেটকে কড়া নির্দেশ দেন। ভাওয়ালের জঙ্গলে বর্মি থানা পুলিশের সঙ্গে মঙ্গলসিংহের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। নিহত ও আহত হয় অনেক পুলিশ। পুলিশের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার সংবাদে আশে পাশের গ্রামের অনেক লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে ভাওয়াল অঞ্চল জনশূণ্য হয়ে যায়। মঙ্গলসিংহ সাহসী মানুষ হয়ে জ্বলে ওঠেন। বিত্তবান, মহাজনদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেন তিনি।

মঙ্গলসিংহের এই বিদ্রোহের খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার একদিকে উৎকণ্ঠিত অন্যদিকে রেগে আগুন হয়ে পরে। ম্যাজিস্ট্রেটকে আবারো কড়া নির্দেশ দেওয়া হয় মঙ্গলসিংহকে রুখতে। এক পর্যায়ে গফরগাঁও ও নাসিরাবাদ থানার পুলিশ যৌথভাবে মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে বারবার অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পুলিশের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নিরূপায় ও হতাশ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট 'ইরুইন' মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করতে বাধ্য হন। কিন্তু, এতেও কোনো কাজ হয় নি। মঙ্গলসিংহ থেকে যান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তিনি গ্রেফতার এড়িয়ে চলতে থাকেন। দিনে দিনে মঙ্গলসিংহ তাঁর দলের শক্তি বাড়াতে থাকেন। সংগঠিত হতে থাকেন প্রবলভাবে। সরকার চিন্তিত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। পুলিশ হয়ে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে পুলিশী অভিযান ভিন্ন রকম মোড় নেয়। তখন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ। গফরগাঁও থানার দারোগা মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্যে নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করেন। তিনি একটি বিরাট প্লাটোন সংগ্রহ করেন মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে। দারোগার প্লাটোন এসে একে একে যোগ দেয় নাসিরাবাদ থানার পাইক, বরকন্দাজ। পাশাপাশি, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে দারোগার সঙ্গে এসে যোগ দেয় রণ ভাওয়ালের সকল তালুকদার। তালুকদারদের সঙ্গে ছিলো তাঁদের নিজ নিজ লাঠিয়াল বাহিনী ও পাইক, বরকন্দাজ। অভিযানের শুরুতে পুলিশবাহিনী নিয়ে দারোগা হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে মঙ্গলসিংহকে আক্রমণ করেন। কিন্তু, তিনি সুবিধা করতে পারেননি। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মঙ্গলবাহিনীর দুর্দান্ত প্রতাপের কাছে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে পুলিশবাহিনী। মঙ্গল বাহিনীর গেরিলা আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং

www.pathagar.com

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পিছু হটে পালিয়ে যায়। দারোগা হাতী পৃষ্ঠে থেকে কোনো রকমে বেঁচে যান। নিজে রক্ষা পেলেও বিদ্রোহী বাহিনীর অস্ত্রাঘাতে হাতীর একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ভাবে পুলিশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

সরকারের পেটোয়াবাহিনী হওয়ার কারণে পুলিশবাহিনী এরপরও হাত গুটিয়ে নেয়নি। তালুকদারগণ তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে নিজস্ব বাহিনীসহ পুলিশবাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলসিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করে এবং মঙ্গলসিংহকে আক্রমণ করে। মঙ্গলবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো মাত্র ১শ'জন। এই ১শ'জন সদস্য নিয়ে দারোগার বিপুল সংখ্যক দক্ষপুলিশ ও বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মঙ্গলবাহিনী। এই সংঘর্ষেও বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বরকন্দাজ মারা যায়। অনেক আহত পুলিশও বরকন্দাজকে ফেলে রেখে দারোগা প্রাণভয়ে পিছু হটেন এবং পালিয়ে যান।

পুলিশের শোচনীয় পরাজয়ের খবর অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা পৌঁছে যায়। খবর পেয়ে ঢাকার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইরুনকে পুলিশ নিয়ে নিজে ভাওয়াল গমনের জন্যে নির্দেশ দেন। পুলিশ প্রহরায় ম্যাজিস্ট্রেট ইরুইন নাসিরাবাদ থেকে ভাওয়াল গমন করেন। মঙ্গলসিংহ এ খবর আগেভাগেই পেয়ে যান, এবং ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেন। এক পর্যায়ে মঙ্গলসিংহ তাঁর দল-বল নিয়ে নিকলী থানার 'বেতাল' অঞ্চলে পৌঁছেন। সেখানে তিনি ইংরেজ সরকারের সহায় সম্পদ এবং তালুকদারদের বাড়ি-ঘর, সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন করেন। যোগ হয় মঙ্গল বাহিনীর ত্রাসের নতুন মাত্রা। মঙ্গলবাহিনী বেতালে ইংরেজ কুটিয়াল মিঃ গ্লাস সাহেবের কুঠি লুণ্ঠন করে। গ্লাস সাহেব পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েন। তিনি মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতার করার জন্যে একশ'টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দেন।

এ দিকে মঙ্গলসিংহের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হন গোলজার সিংহ। তিনি ছিলেন মঙ্গলসিংহের বিশ্বস্ত্ম সহযোগীই কেবল নন, নেতাও। মঙ্গলসিংহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি ভাওয়ালে আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত্ম নেন। সেখানে থেকে তিনি মঙ্গলসিংহের ভাই ভৈরব সিংহের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন।

গ্লাস সাহেবের কুঠি লুণ্ঠিত হওয়ার পর সরকার কঠোর ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। বাস্ত্মব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট শিঃ ইরুইনের নির্দেশে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট 'মিস্টার হে' একদল সশস্ত্ররক্ষী নিয়ে নিকলী থানা এলাকা চষে বেড়ান। 'মিস্টার হে' এর নেতৃত্বে সশস্ত্র রক্ষীগণ মঙ্গলসিংহ ও তাঁর দলবলকে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এ সময় মঙ্গলসিংহ ও তাঁর বাহিনীর সদস্য সন্দেহে প্রায় ১শ'ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু, মঙ্গলসিংহ থেকে যান ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁর টিকিটিরও সন্ধান পায়নি পুলিশ।

www.pathagar.com

তখন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ। বছরের মাঝামাঝি সময়। মঙ্গলসিংহের সঙ্গে নিকলী থানার দারোগা ফকির সিংহের হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফকির সিংহ ভয়ে পালিয়ে যান। প্রাণরক্ষার তাগিদ থেকেই তিনি পালিয়ে গিয়ে ছিলেন। ফকির সিংহ পালিয়ে আসার ব্যাপারটি ম্যাজিস্ট্রেট ইরুইন এবং কুঠিয়াল গ্লাস সাহেবকে অবহিত করেন। এ ঘটনার কিছু দিন পর নতুন একটি ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। গ্লাস সাহেবের কুঠির নিকটবর্তী স্থানীয় তালুকদারের একজন চাকরের ঘরে মঙ্গলসিংহ ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মঙ্গলসিংহকে নিকলী থানার জমাদার গোলাপসিং বন্দি করেন। গোলাপসিং-এর এটি ছিলো অভূতপূর্ব সাফল্য। গোটা পুলিশ বিভাগ, এমন কি সরকার গোলাপসিং-এর এ সাফল্যের জয়ধ্বনি করতে থাকে। গোলাপসিং এ জন্যে পুরস্কৃত হন। মঙ্গলসিংহকে গ্রেফতারের পুরস্কার স্বরূপ গোলাপসিংকে দারোগা পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

মঙ্গলসিংহ-কে ধরার কিছু দিন পর পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। মঙ্গলসিংহ ধরা পরার পর কিন্তু তাঁর সহযোগীগণ থেমে থাকেননি। মঙ্গলসিংহের সহযোগী গোলজার সিং ভাওয়ালে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। নতুন করে সৃষ্টি হয় ত্রাস। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পুলিশের সঙ্গে মঙ্গল বাহিনীর কয়েক দফায় সংঘর্ষ ঘটে। এক পর্যায়ে গোলজার সিংহ ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গ্রেফতারকৃত মঙ্গলসিংহকে বিচারের মুখোমুখি করা হলে সেশন জজের আদালতে বিচারে মঙ্গলসিংহের যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয় এবং গোলজার সিংহকে দেওয়া হয় ৯ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

গোলজার সিংহ ধরা পড়ার পর তালুকদার লুৎফুল্লার নায়েব বর্মির অধিবাসী প্রেম সুকের সঙ্গে মঙ্গলসিংহের জড়িত থাকার কথা সরকার জেনে যায়।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্ক্রিনার প্রেমসুকের বর্মির বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়। ছারখার হয়ে যায় সবকিছু। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রেমসুক পালিয়ে যান এবং নাসিরাবাদে গিয়ে বস-বাস করতে থাকেন। মঙ্গলসিংহের সহযোগী আরো ক'জনকে বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়ঃ-

১। ফেদু ও আজমতঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস।
২। বংগু এবং হিংগুঃ প্রত্যেকের ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড।
৩। গিরিধারী সিংহ, গোপন পত্র ও অস্ত্রসহ ধরা পড়ায় ৬ বছরের সশ্রম করাদন্ড।
৪। মৌলভী আবদুল আলীঃ ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা।
৫। মির্জা, আসু, মিসু, মদন সেক, গুনা, নেওয়াজ, লুনা, রামজয়, মদন পোদ্দার মঙ্গল বাহিনীর সদস্য ছিল। তাদেরকে ও গ্রেফতার করা হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়।

মঙ্গলসিংহকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে মঙ্গলসিংহ যে ঘর থেকে ঘুমন্ত ধৃত ও গ্রেফতার হন, সে ঘরের স্বত্বাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট তালুকদারকেও শাস্তি দেওয়া হয়ে ছিলো। এমনকি মঙ্গলসিংহের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিলো, তাদেরকেও শাস্তি পেতে

www.pathagar.com

হয়েছিলো। উদাহরণ হিসেবে আমরা তাঁরামনি দেব্যা নামের এক মহিলার কথা মনে করতে পারি। এই মহিলা মঙ্গলসিংহের নিকট জমি ইজারা দেওয়ায় তাকে ইংরেজ সরকারের কোপানলে পড়তে হয়েছিলো।

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, নিরপরাধ, নিরীহ সহজ-সরল মানুষকে দুস্য, তস্করে পরিণত করার পিছনে করা দায়ী? ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকে শেষ মোগল শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অসংখ্য পরিব্রাজক বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে এসেছিলেন। এসব ভ্রমণকারী এদেশের নিরীহ, সহজ-সরল মানুষের প্রশংসা করে গেছেন। তাঁদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, নিরীহ সহজ-সরল মানুষ তস্কর কিংবা দুস্য ছিলোনা। পেটের দায়ে তারা দুস্যবৃত্তিও অবলম্বন করেনি। কিন্তু, সহজ-সরল মানুষ সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচারে, জমিদার, মহাজন, তালুকদারদের নিপীড়নে নির্যাতিত হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলো। এক পর্যায়ে তারা বিদ্রোহে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহকে সাধুবাদ না জানালে তাদের প্রতি অবিচারও করা হবে।

সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থের ঊনবিংশ শতাব্দীর ডাকাত ও ডাকাতি অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন-'যে দেশে শাসক গোষ্ঠী নিজেরাই অশ্রুতপূর্ব শোষণ উৎপীড়নের দ্বারা প্রজা সাধারণের সর্বস্ব কেড়ে নেয়, দেশের অন্নদাতা কৃষককে পথের ভিখারী করে তোলে এবং সমগ্র দেশকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের মধ্যে টেনে আনে, সে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে চুরি-ডাকাতির সহজ উপায় অবলম্বন ছাড়া অন্যকোন উপায় থাকে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ দেশের ডাকাত সম্প্রদায় ইংরেজ বেনিয়া শাসনেরই সৃষ্টি'।

আমাদের দেশের ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন, ৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ অভ্যুত্থান, ৭০' এর সাধারণ নির্বাচন, ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সহ সকল গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মঙ্গলসিংহের বিদ্রোহ অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। মঙ্গলসিংহ এক বীর, মুক্তিকামী মানুষের নাম। যুগে যুগে মুক্তিকামী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

হাতী খেদা বিদ্রোহ

আমাদের ইতিহাসে হাতী খেদা বিদ্রোহ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। হাতী খেদা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এলেই গারো পাহাড়ের প্রসঙ্গ এসে যায় স্বাভাবিকভাবেই। বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেষ উত্তর প্রান্তে গারো পাহাড়ের অবস্থান। এই পাহাড়ের নিচে সমতল ভূমিতে গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, হদি সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক লাখ উপজাতি বস-বাস করে। উপজাতিদের মধ্যে হাজংদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। হাজংরা মঙ্গোলিয় জাতির প্রাচীন বংশধর। তারা এক সময় দক্ষিণ এশিয়ার রোদ্দুর অঞ্চলে বস-বাস করতো। এক পর্যায়ে তাঁরা ব্রহ্মদেশ হয়ে আসামে বস-বাস করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে খাদ্য তথা জীবিকার প্রয়োজনে তারা সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের গারো পাহাড় অঞ্চলে পাড়ি জমায়।

হাজংগণ অন্য উপজাতিদের চেয়ে শক্তিশালী, দৃঢ় চেতনা সম্পন্ন, সাহসী, লড়াকু কিন্তু খোলামেলা মনের মানুষ। তারা যেমন সহজ-সরল, তেমনি বন্ধুবৎসল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁর জনৈক সেনাধ্যক্ষ সোমেশ্বর পাঠক এই হাজং উপজাতির সাহায্যে গারো পাহাড় ও এর সমতল ভূমিতে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'সুসং' জমিদারি নামে এই জমিদারি ইতিহাসে খ্যাত।

ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়-সুসং জমিদারির রাজা কিশোর হাতী ধরার জন্যে অনেক হাজং পরিবারকে দুর্গাপুর থানার পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সেসময়ে হাতীর ব্যবসা ছিলো লাভজনক। সুসং, শেরপুর, মধুপুর ও ভাওয়াল পরগণার জমিদারগণ দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকায় হাতী বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আলাপসিং, সুসং ও এর সংলগ্ন মধুপুর গড় এবং ভাওয়াল অঞ্চলে আসামের পার্বত্যাঞ্চল থেকে নেমে আসতো অসংখ্য বন্য হস্তী। এসব হস্তী স্বাধীনভাবে বিচরণ করতো। জমিদারগণ এসব উপজাতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাতেন এবং জোর জবরদস্তি করে তাদের হাতী ধরার কাজে নিয়োগ করা হতো।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলের দলিলপত্রে এই সমস্ত অঞ্চল সমূহে বন্য হস্তীর উপদ্রবে অনেক শস্যহানি ঘটার কথা উল্লেখিত আছে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে আলাপসিংহ, ভাওয়াল ও হাজরাদীর জমিদারগণ বন্য হস্তীর উপদ্রব থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য প্রতিকার চেয়ে ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন করেছিলেন। ইংরেজ সরকার হস্তীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে খেদা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু, খেদা স্থাপন ছিলো ব্যয়বহুল। বাধ্য হয়েই খেদা স্থাপন থেকে বিরত থাকে সরকার।

এরপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে খেদা আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুসংয়ের মহারাজা খেদা ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে খেদা করার ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং তা করেন সুসংয়ের মহারাজা। সরকারের নির্দেশ বলেই এটি করা হয়। সে খেদার চিহ্ন এবং স্থান এখনো মানুষের চোখে পড়ে। এদিকে, আনুমানিক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভাওয়ালের সালটিয়ার জমিদার ভোলা নাথ চাকলাদার ভাওয়ালের জঙ্গলে সর্বশেষ খেদা স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও ইংরেজ উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ ভাওয়াল জঙ্গলে খেদা স্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে হাতীর উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে খেদা স্থাপিত হয়েছিলো, সেই খেদা থেকেই হাতীখেদা বিদ্রোহের গোড়াপত্তন ঘটেছিলো। ইতিহাসের প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্তের অভাবে হাতীখেদা বিদ্রোহ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

খাজা ওসমান, সখিনা ও সোনাভান

বীরাঙ্গনা সখিনা ও সোনাভানকে নিয়ে কথার শেষ নেই। অনেক গল্প, অনেক কাহিনী, অনেক কিংবদন্তী এই সখিনা ও সোনাভানকে নিয়ে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি বলে রাখা ভালো, সেটি হচ্ছে গাজীপুরের সোনাভান ও ময়মনসিংহের সখিনা এক এবং অভিন্ন। যদিও বীরাঙ্গনা সখিনা ও সোনাভানকে নিয়ে আলাদা আলাদা কিচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু, ইতিহাসের সত্যকে রক্ষার প্রয়োজনে এবং ইতিহাসকে কল্প–কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে তালগোল না পাকিয়ে আমরা সোনাভান ও সখিনাকে এক হিসেবে বিবেচনা করবো। সোনাভান ও সখিনা কেন এক এবং কিভাবে সোনাভান সখিনা হয়ে গেলো তা জানার জন্যেই আমাদের ইতিহাসের ঝাঁপি খুলে বসতে হবে। পাশাপাশি, সোনাভান ও সখিনার জীবনের প্রেক্ষিত, উত্থান পর্ব এবং পরিণতি পর্ব নিয়ে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

সখিনা নামের সঙ্গে সোনাভানের নামকরণের মিল ও সাযুজ্য সখিনা–সোনাভান রহস্য উম্মোচনের অন্যতম ক্লু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ভাওয়ালের ফজলগাজী ও মসনদে আলা ঈশা খাঁর বংশলতিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সোনাভানের উপস্থিতি। এই সোনাভান ফজলগাজীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। পরবর্তীতে, স্থান পরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলশ্রুতিতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সোনাভানই সখিনা নাম ধরে সমাজে আবির্ভূত হন। অথচ, ইতিহাসে সোনাভানকে ফিরোজ খাঁর কন্যা বলে দিব্যি চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু, এর পিছনে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। ইতিহাসের সত্য হচ্ছে এই যে, ঈশা খাঁর বংশে ফিরোজ খাঁ কিংবা ওসমান খাঁ বলে কেউ নেই। ইতিহাস আর কল্পকাহিনী এক নয়। মুশকিল হচ্ছে এই যে, বাঙালি অতিমাত্রায় আবেগ প্রবণ এবং হুজুগে জাতি। আর এই সুযোগে ইতিহাসের জায়গা দখল করে কল্পকাহিনী আর কল্পকাহিনীর জায়গা দখল করে ইতিহাস। ইতিহাসের চলার পথ মসৃণ, বেগবান, সত্যনিষ্ঠ করার স্বার্থে উল্লেখিত সংকট সমূহ বিবেচনায় না আনলে ইতিহাসের জন্যে

www.pathagar.com

যেমন বিপদ হবে, তেমনি পাঠক বিভ্রান্ত হবে। সর্বোপরি, যে তথ্য-উপাত্ত হচ্ছে ইতিহাসের ব্যাকরণ, সে ব্যাকরণ পাঠ না করে ইতিহাস পাঠ করলে যে অনিয়ম এবং লেজেগোবরে অবস্থা সৃষ্টি হয়, সোনাভান-সখিনা প্রসঙ্গে সৃষ্ট জটিলতা আমাদের সেই পরিস্থিতিরই মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রথমেই আমরা সোনভান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাই। সোনাভানের কাহিনী আমাদের দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। এ কাহিনী পাঠকের মনে অনেক অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। আর কিচ্ছা-কাহিনীর নায়িকা হয়ে সোনভান রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অথচ, ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কথা বলতে পারছেন না। তিনি জনশ্রুতি, কিছু কিচ্ছা-কাহিনী ও পুথি সাহিত্যের নায়িকা হয়ে তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্রকে এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে ইতিহাসে তাঁর মূল্যবান অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অবদানকে হারাতে বসেছেন। সখিনা এসে সোনাভানকে খন্ডিত করলো। অখন্ড থাকতে পারলেন না সোনাভান।

যেহেতু পুঁথিসাহিত্যের আর কিচ্ছা-কাহিনীর বিষয় হয়ে গেছেন সোনাভান। সেহেতু সোনাভানের ঘটনা নিয়ে কিছু বলে নেওয়াই সঙ্গত হবে। সোনাভান বিবি নারী হলেও তিনি তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও বীরত্বের জন্যে বিখ্যাত। তাঁকে 'পালোয়ান বাদশাহ' হিসেবেই দেখা হয়। সোনাভান তাঁর জীবন-বিকাশ পর্বকাল থেকেই রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করলেন সকলের মনে। তিনি যেনো অপরাজেয়, একক, অতুলনীয়। এক পর্যায়ে এমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হলো যে, কোনো ব্যক্তি যদি একক ক্ষমতায় সোনাভানকে পরাজিত করতে পারেন, তাঁর সঙ্গেই বিয়ে হবে সোনাভানের। সব মিলিয়ে একটা জমজমাট অবস্থা। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো সে খবর। সুদূর মদিনা শহর থেকে টঙ্গী এলেন ঈমাম হাসান-হোসেনের সৎভাই মোহাম্মদ হানিফা পালোয়ান। যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি সোনাভানের সঙ্গে। প্রথম দিনের যুদ্ধেই ঘটে যায় অবিশ্বাস্য সব ঘটনা। সোনাভানের কাছে কুপোকাৎ হয়ে যান তিনি। নাস্তানাবুদ মোহাম্মদ হানিফা প্রমাদ গুণতে থাকলেন। যুদ্ধ শুরুর দিনেই সোনাভান যুদ্ধের এক পর্যায়ে মোহাম্মদ হানিফাকে মাথার উপর তুলে নিয়ে মদিনা শহরের কাছে কহর দরিয়ায় টিল ছুঁড়ে ফেলে দেন। যত কান্ড টঙ্গীতে। আবার বিস্মিত হবার পালা। মার খেয়ে দমে যাননি মোহাম্মদ হানিফা। ছয়মাস পরে নতুনভাবে এলেন আবার সোনাভানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। 'পরাজয়ে নাহি ডরে বীর'-এমন একটা ভাব তাঁর চোখ-মুখে। শক্তিতে সাহসে বলীয়ান হয়ে তিনি আবার এলেন টঙ্গীর মাটি কাঁপাতে। শুরু হলো নতুন করে যুদ্ধ। এভাবে তিনবার যুদ্ধ হয় সোনাভানের সঙ্গে মোহাম্মদ হানিফার। তিনবারই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন তিনি। বিধি বাম। মোহাম্মদ হানিফা হাল ছাড়লেন না তবু। 'Failure is the piller of success '-এই কথাটিকেই সত্য বলে প্রমান করলেন মোহাম্মদ হানিফা। মোহাম্মদ হানিফা অবশ্য তাঁর একক ও স্বাভাবিক শক্তিতে সোনাভানকে হার মানাতে পারেননি। তাঁর সহায় হলো হযরত বিবি ফাতেমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়েই তিনি

www.pathagar.com

সোনাভান বিবিকে পরাজিত করেন এবং বিয়ে করতে সক্ষম হন। পাঠকের অনুসন্ধিৎসার কথা মনে রেখে আমরা সোনাভানের পুঁথির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করতে পারি-

" আল্লাহ ২ বল ভাই নবীকর সার ।
নবীর কলেমা পড় হয়ে যাবে পার ॥
আল্লা ২ বল ভাই যত মোমিনগণ
মোহাম্মদ হানিফার কিছু শুন বিবরণ।
বার জঙ্গ করে মর্দ্দ কেতাবে খবর।
তের জঙ্গ লেখা যায় টঙ্গির শহর।
সোনাভান নামে বিবি বাদশাহ সে শহরে।
কুত্ততের হদ আল্লাহ দিয়েছে তাহারে।
একরোজ সোনাভান কহেন উজিরে।
এয়াছা কেহ আছে জোরে পাছারে আমারে।
উজির কহেন বিবি শুন সে খবর।
মোহাম্মদ হানিফা আছে আরব শহর"।

পুঁথি সাইজের মোট ২৮ পৃষ্ঠার সোনাভানের এই পুঁথির রচয়িতা হচ্ছেন ফকির মোহাম্মদ নামের একজন শায়ের বা কবি। পুঁথির শেষের দিকে কবি বলেন-

" আল্লাহ ২ বল ভাই যত মোমিনগণ।
তামাম হইল পুঁথি শুন সর্বজন।
১২২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে।
সোমবার বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে।
খতম হইল পুঁথি আর কিছু নাই।
আকবতে খায়ের করে দোয়া কর ভাই"।

পুঁথি লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলা ১২২৭ পুঁথিটি রচিত হয়েছে। তখন ইংরেজি ১৮২১ সাল। পুঁথি রচনার অনেক আগে থেকেই গাজীপুর অঞ্চলে সোনাভানের কিচ্ছার প্রচলন ছিলো ব্যাপকভাবে। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো, যে সোনাভান কিচ্ছা, কিংবদন্তী আর পুঁথি সাহিত্যের বীরাঙ্গনা নারী তিনি ছিলেন টঙ্গী শহরের বালু নদীর তীরের ধ্বংসাবশেষের মালিক। সোনাভান অধ্যায় নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে হলে আমাদের ইতিহাসে মোগল আমলকে সামনে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বার ভূইয়াদের উত্থান পর্বে ভাওয়ালের জমিদার ফজলগাজীর বংশ লতিকা পর্যালোচনা করলে আমরা পাই- ফজলগাজীর প্রথমা কন্যা ছিলেন সোনাভান। তিনি ১৫৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ফজলগাজীর দ্বিতীয় সন্তান বাহাদুরগাজী। ১৫৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন ফজলগাজীর তৃতীয় সন্তান শের-ই-গাজী এবং ১৫৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ফজল গাজীর কনিষ্ঠতম সন্তান সোনাগাজী।

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য একটি ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, উড়িষ্যার পাঠান জায়গীরদার কতলু খানের পুত্র খাজা ওসমান মোঘল বাহিনী কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে দলবলসহ ঈশা খাঁর আশ্রয় নেন। ঈশা খাঁ ওসমান লোহানীকে বোকাইনগর দূর্গের দায়িত্ব দিয়ে একখানা ছোটখাট জমিদারি পরিচালনার ফরমান জারী করেন। ওসমানের বোকাইনগর রাজ্য খুব বেশী এলাকা জুড়ে না থাকলেও তিনি বেশ কয়েকটি দূর্গ নির্মাণ করে তার এলাকাকে দুর্ভেদ্য করে রাখেন। ওসমান ছিলেন অত্যন্ত রণনিপুণ বীরযোদ্ধা এবং স্বাধীন চেতা ব্যক্তি। ঈশা খাঁ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে ভাওয়ালের স্বাধীনচেতা বন্ধুর কন্যা সোনাভানের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠালে ফজল গাজী এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিয়ে জামাতাকে উপঢৌকন হিসেবে ভাওয়ালের টঙ্গিসহ কয়েকটি মহাল দিয়ে একজন জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ওসমান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনানায়ক। তিনি তাঁর জমিদারির মধ্যে টঙ্গিকে সুরক্ষিত করে বসবাস করার জন্য একটি হাবেলী (প্রাসাদ) তৈরী করেন। টঙ্গি শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বালু নদী। আর পশ্চিম দিকে তুরাগ নদী। তিন দিক থেকে নদী দ্বারা সুরক্ষিত বলে সহসা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্খা ছিলো অপেক্ষাকৃত কম। ওসমান কয়েক বছর টঙ্গির প্রাসাদে বসবাস করেছিলেন। ইতঃমধ্যে মোগলদের বিরুদ্ধে ঈশা খাঁর পক্ষে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করায় ঈশা খাঁ ওসমানকে বোকাইনগরে জমিদারি পরিচালনার নির্দেশ দিলে ওসমান ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে টঙ্গির প্রাসাদ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন। ওসমান টঙ্গি থেকে বোকাইনগর একাকী অবশ্যই যাননি। তিনি অবশ্যই তার স্ত্রী সোনাভানকে নিয়ে গিয়েছিলেন বোকাইনগরে। এবং এটাই স্বাভাবিক বলে আমরা মনে করি। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈশা খাঁ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ফজল গাজীর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ ও ফজল গাজীর পুত্র বাহাদুর গাজী মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও বোকাইনগরের জমিদার ওসমান খাঁ মোগলদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। সুবাদার ইসলাম খাঁ ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এবং দিল্লি থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি সুজাত খানকে ইসলাম খানের সাহায্যের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। বোকাইনগরে মোগল বাহিনীর সঙ্গে ওসমান বাহিনীর বেশ ক'টি খন্ডযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ওসমান পেরে ওঠেননি, তিনি তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাতের আধাঁরে পালিয়ে ঘাটি গাড়েন সিলেটের লাউড় পাহাড়ের কোল ঘেষে উহর নামক স্থানে। এ অবস্থান থেকে ওসমান তার বাহিনীর জন্য রসদ, গোলা-বারুদ, সৈন্য যোগাড় করতে লাগলেন। এভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মোগলদের আক্রমণ করবেন, তাদের বিতাড়িত করতে হবে বাংলার মাটি থেকে। ইসলাম খানও বসে নেই তিনি সুজাত খানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালেন ওসমানের সাথে যুদ্ধ করতে। মুগল ও আফগান বাহিনী বর্তমান মৌলভী বাজার জেলার হাওড়ের নিকট দৌলম্বপুর (বর্তমান লম্বোদরপুর) নামক স্থানে ৩ মার্চ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দু'পক্ষই এ যুদ্ধকে মর্যাদার লড়াই মনে করে প্রাণপণ জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধরত অশ্বারোহী, পদাতিক, হাতিসহ সকল বাহিনী,

www.pathagar.com

কামান বন্দুক, তীর, বর্শা, তরবারী এমন ভাবে চলছে যেন মানুষ এবং হাতী ঘোড়ার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। দু'পক্ষই ক্লান্ত, মোগলরা আফগানদের পরাজিত করতে পারছেনা। আফগান যুদ্ধাগন অবাক হয়ে যায় মোগলদের অবস্থান দেখে। তারা হঠাৎ দেখে তাঁদের প্রিয় নেতা ঘোড়ার পিঠে নেই। হঠাৎ করে মোগলদের একটি তীর এসে ওসমানের বাম চোখের মধ্যদিয়ে মস্তিস্কে প্রবেশ করে। ওসমান ঘোড়ার পিঠে থেকেই বিদ্ধ তীরটি টেনে বের করেন ও রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু ওসমান বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না। তিনি ঘোড়ার পিঠেই মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আফগান যোদ্ধাগণ পালিয়ে গেলেন, পরাজয় বরণ করলো ওসমান বাহিনী, আত্মসমর্পণ করলেন ওসমানের ভাইসহ অন্যান্য অমাত্যগণ।

সোনাভান ও ওসমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পরই তাঁদের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে অনেক গাঁথা রচিত হতে থাকে। সোনাভানের পুঁথি রচিত হয় ওসমানের মৃত্যুর ২০৫ বছর পর অর্থাৎ ১৮২১ সালে। মুসলমানদেরকে পুঁথির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যেই পুঁথি রচিয়তা ঘটনার সঙ্গে এক করে নেন হানিফা নামক এক মুসলিম বীরকে। কিন্তু, ইসলামের ইতিহাসে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না।

টঙ্গী শহরে যে সোনাভানের বাড়ি ছিলো এ-সম্পর্কে ইতিহাস আমাদের সাক্ষ্য দেয়। টঙ্গী শহরে সোনাভানের বাড়িও তার অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ এবং গাজী পরিবারের বংশলতিকা পর্যালোচনা করে সোনাভান নামক এক বীর এবং গর্বিতা নারীর অস্তিত্ব ইতিহাসের আলোকেই স্বীকার করে নিতে হয়।

এবারে সখিনা প্রসঙ্গে আসা যাক। সখিনাকে পালাগানের সূত্র ধরে 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালার প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও এর পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত কিংবা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বলা হয়েছে যে, তিনি কিল্লাতাজপুর অধিপতির কন্যা। পালায় সখিনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে সৌন্দর্যে, বীরত্বে মহিমান্বিতা চরিত্র হিসেবে। পালায় বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী সখিনা স্বামীকে উদ্ধার করার জন্যে বেপোরোয়া হয়ে উঠেন। তিনি মোগল সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং প্রধান সেনানীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পালাগানে সখিনার আত্মত্যাগকেই প্রধান পুঁজি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জঙ্গল বাড়ির ঈশা খাঁর বংশধর ছিলেন দেওয়ান ফিরোজ খাঁ। কিল্লাতাজপুরের অধিপতি ছিলেন উমর খাঁ। তিনি ছিলেন মোগল অধিপতি। উমর খাঁর কন্যা হিসেবে সখিনাকে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এর পক্ষে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য নেই। এতেই বুঝা যায় যে, কি ধরণের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি নিয়ে সখিনা উপাখ্যান রচিত হয়েছে। সখিনা কাহিনী যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হয়েছে, তার বড় প্রমাণ হচ্ছে এই 'জঙ্গল বাড়ীর ঈশা খাঁর বংশধর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ ও কিল্লাতাজপুরাধিপতি মুঘল

www.pathagar.com

প্রতিনিধি উমর খাঁর কন্যা সখিনা তসবীর ওয়ালীর কাছে পরস্পরের ছবি দেখে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছদ্মবেশে ফিরোজ খাঁ কিল্লা তাজপুরে গিয়ে দিঘীর ঘাটে সখিনার অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন'এ বক্তব্য একেবারেই মনগড়া। ফিরোজ খাঁর প্রতি সখিনা গভীর ভাবে প্রণয়াক্ত ছিলেন বলেই ফিরোজ খাঁকে উদ্ধারের জন্যে তিনি অসম সাহসে ফিরোজ খাঁর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। বিজয় যখন সখিনার হাতের নাগালে, তখনই প্রতিপক্ষ বিজয় নিশান উড়িয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ছিলো। পরবর্তীতে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, জঙ্গলবাড়ীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ফিরোজ খাঁ সখিনাকে তালাক দেন। এ বক্তবের পক্ষেও ইতিহাসের সমর্থন নেই। তালাক নামা পেয়ে সখিনা অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে মূর্ছা যান এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মারা যান। ওসমানও শত্রুপক্ষের তীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা যান। বলাবাহুল্য, ওসমান এবং সখিনার বিয়োগান্তক পরিণতি সৃষ্টি করার জন্যেই পালাগানে ওসমান ও সখিনার বিয়োগান্তক পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে। ওসমান ও সখিনার প্রণয়, পরিণয়, তালাক এবং করুণ মৃত্যু রূপকথার মতোই আমাদের কাছে মনে হয়। এর পক্ষে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিকতার কোনো সমর্থন নেই। অথচ, সোনাভান প্রসঙ্গটি ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিকতা দ্বারা সমর্থিত। প্রকৃতপক্ষে, সখিনা বলে কেউ নেই। কেল্লাতাজপুরে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি সখিনা নন, সোনাভান।

www.pathagar.com

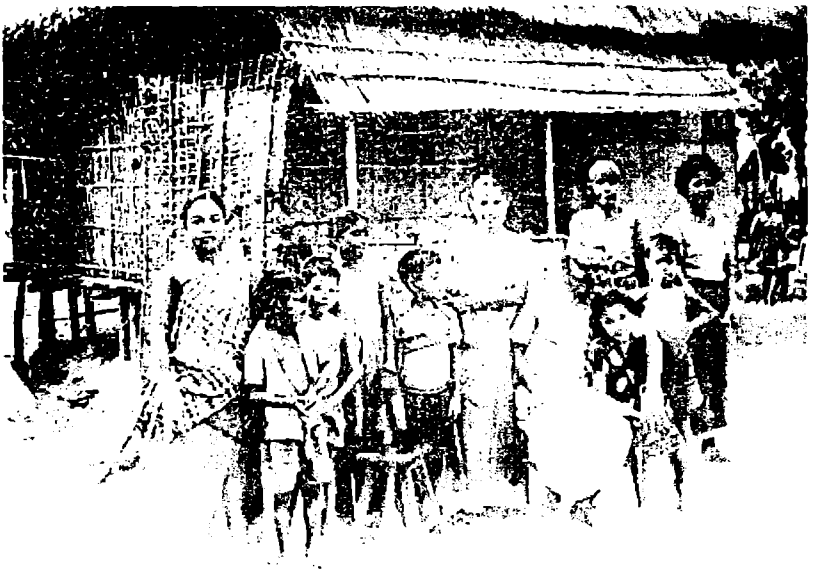

গারো

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের উপজাতি বস-বাস করে। উপজাতিদের বলা হয় আদিবাসী। আমরা যারা উপজাতি নই, তাদের অনেক আগে থেকেই এই ভূ-খন্ডে উপজাতিদের বস-বাস। এজন্যে, উপজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের বলা হয় আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে গারো উপজাতি শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনে-মানে, চিন্তা-চেতনায়, কর্মে, সম্পদে, সংস্কৃতিতে অনেক দূর অগ্রসর। গারোরা এখন যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে করে তাদের অবমূল্যায়ন করার কোন সুযোগ নেই। সব দিকেই তারা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে মূল্যবান অংশগ্রহণ। বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও বাঙালিদের সঙ্গে সমতল ভূমির মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পেশা, রাজনৈতিক-সামাজিক সচেতনতার ধারাবাহিকতায় অগ্রসর হচ্ছে গারো উপজাতি। পাশাপাশি তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকেও ভুলে যায়নি।

গারোদের নামকরণ গারো হয়েছে গারো পাহাড়ের নামকরণ অনুসারে। গারো সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে শ্রেণী বিভাজন। দুই শ্রেণীর গারোদের নামকরণ হচ্ছে আচ্ছিক ও লামদানী। আচ্ছিক ও লামদানী উভয়েই গারো সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত হলেও তাদের অবস্থানগত, চেতনাগত ও মজ্জাগত পার্থক্য রয়েছে। গারো পাহাড়ের ভেতরের দিকে যারা বস-বাস করে অর্থাৎ গহীন অরণ্যে যাদের বস-বাস, সেই সব গারোদের আচ্ছিক শ্রেণীর গারো নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, গারো পাহাড়ের পাদদেশে

www.pathagar.com

বস-বাস করে, তাদেরকে লামদানী শ্রেণীর গারো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লামদানী শ্রেণীর গারোরা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দী প্রভৃতি অঞ্চলে বস-বাস করে। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক গারো বস-বাস করে। গারো ভাষায় মানুষকে বলা হয় মান্দাই। আর একারণেই গারোরা মান্দাই নামেও অভিহিত হয়।

পাহাড়ী গারো ও সমতল ভূমির গারোদের জীবনাচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, পেশা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিশনারীদের কল্যাণ এবং আধুনিক জীবন চেতনার অনুরোধে গারো জীবন প্রবাহে ইতিবাচক ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সমতল ভূমির গারোরা ইতঃমধ্যেই অনেক দূরের পথে এগিয়ে গেছে। এখন আর তাদের পিছন ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। কিন্তু, তাই বলে পাহাড়ী গারোদের সঙ্গে সমতল ভূমির গারোদের যোগাযোগের সূত্র একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ, সমতল ভূমির গারোদের মধ্যে শেকড়ের টান এখনো রয়ে গেছে।

ময়মনসিংহের গারো সম্প্রদায় মেঘালয় অন্তর্ভুক্ত গারো পাহাড় ও তার পাদদেশের আদি বাসিন্দা। আগেই বলা হয়েছে যে, গারো সম্প্রদায়ের একটি অংশ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ী অঞ্চলে বস-বাস করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই জেলার সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল গারো পাহাড়ই ছিলো অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রধান বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্র।

F.A.SACHSE এর মন্তব্যের আলোকে বলতে পারি গারোরা সম্ভবত দানীপুরের কাছাকাছি কাছারীর পথে তিব্বত থেকে আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দে আসামে এসেছিলো। যুদ্ধে এই গারোরা অসমিয়াদের সঙ্গে পরাজিত হয়েছিলো। পরাজিত হওয়ার পর জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে তারা ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়িদিয়ে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করে। এখানে আসার পর স্বাভাবিক ভাবে পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাদের সংশ্রব কমেযেতে থাকে। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ময়মনসিংহের কোচদের সঙ্গে আসামের হিন্দু গারোদের তুলনায় এ জেলায় আগত গারোদের যোগাযোগ ভাল, সম্পর্ক উষ্ণ এবং হার্দিক। এর পিছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে, সেটি হচ্ছে কোচরাই ছিলো গারো অভিযানের আগে সমগ্র গারো পাহাড়ের একমাত্র বাসিন্দা। পাশাপাশি, এ কথাটিও বলে নিতে হয় যে, সম্ভবতঃ কোচেরা আসাম থেকে আগত প্রাচীন বোড়ো জাতির উত্তরসুরী।

গারোরা এই দেশের ভূমিপুত্র। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, ভারত উপমহাদেশের যারা অধিবাসী, তারা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এই দেশে এসেছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণও এ ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদদের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন আদিম জাতির ভাষা বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন। গারোদের আদি নিবাস যে আসাম ছিলো এপ্রসঙ্গে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্যার

www.pathagar.com

হার্বাট রিজলী মনে করেন যে, গারোদের আদি নিবাস আসামই ছিলো। নৃতাত্ত্বিক তথা চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আসামের খাসিয়া, নাগা ও মনিপুরিদের উত্তরাধিকারী। এছাড়াও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় রীতি-নীতির দিক বিশ্লেষণ করলে গারোদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। Doctor J.H. Hutton এসব কারণ বিবেচনায় এনেই গারোদের মঙ্গোলীয় বলে অভিহিত করেছেন।

বিরল শ্মশ্রু, অরোমশ, ভারী ভুরু, চ্যাপ্টা নাক, ফর্সা গায়ের রং ইত্যাদি মঙ্গলীয় মানবগোষ্ঠির লক্ষণ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো গারোদের মধ্যে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, লুসাই, মগ, কুকিদের মধ্যেও এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে Doctor R. Brown এর মন্তব্য সামনে আনা যায়। তিনি বলেছেন-" The facial and other charateristics of our tribe are as various amoungst the other hill clans. Occarsionally an almost purely Mougolian Caste of Countenance will be observed to be succeeded by one closely approaching the Aryan type."

গারোদের মধ্যে গোত্র বিভাগ বা গোষ্ঠি বিভাগ রয়েছে। আচ্ছিক গারোদের গোত্র বিভাগ করলে তিন শ্রেণীর গারো পাওয়া যায়। যথাঃ আয়, আবেং ও দোয়াল, লামদানী শ্রেণীর গোত্রবিভাজনে পাওয়া যায় তিন শ্রেণীর গারো। যথা-মমীন, মারাক সাংগমা। লামদানী শ্রেণীর গোত্রবিভাগকে কেউ কেউ আচ্ছিক শ্রেণীর গোত্রবিভাগের সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। 'Major A.playfair'-ও এ সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। আমাদের জন্য দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, আলোচ্য গোত্রগুলি কোন অর্থ বহন করে, তা বিভিন্ন ধরণের অনুসন্ধান চালিয়েও আমরা কিনারা খুঁজে পাইনি। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এসব টোটেম (মানবেতর জন্মবাদ) বিশ্বাসের আওতার মধ্যেই পরে।

গারো রীতি অনুযায়ী গোত্রবিয়ে নিষিদ্ধ এবং রীতি বিরুদ্ধ। সমাজের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী গ্রহণ করতে হলে গোত্রের বাইরে থেকে গ্রহণ করতে হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যে, অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মতো গারোরাও শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় পায়। অবশ্য সেখানে তাদের খেটে খেতে হয়। অসমীরা খাসীয়াদের মতো গারো সমাজও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এ প্রসঙ্গে আমরা খাসিয়াদের একটি প্রবাদের কথা মনে করতে পারি। প্রবাদটি হচ্ছে 'লং জেইদ না কা কিনথেই' অর্থাৎ মেয়েদের থেকেই মানবগোষ্ঠীর উৎপত্তি। আর তাই মায়ের সূত্রেই মানুষের বংশ পরিচয় হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে, বাবার সূত্র বংশ পরিচয় হওয়া কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। গারোদের ক্ষেত্রেও এটি পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য। খাঁটি মাতৃপ্রধান অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো গারো সম্প্রদায়েরও উত্তরাধিকার সূত্র হচ্ছে এই যে, মায়ের সহায় সম্পত্তি, সম্পদ মেয়েরা পায়। এই সম্পতিতে ছেলেদের বা

www.pathagar.com

পুরুষদের অধিকার থাকে না। আর তাই বিয়ের পর ছেলেরা বাবার বাড়ী ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে চলে আসে। শ্বশুর বাড়ীতে এসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি ছাড়া আর যে সব সহায় সম্পত্তি অর্জন করে, তার উপরও অধিকার বর্তায় স্ত্রীর। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর অবস্থানকে গারোদের আঞ্চলিক ভাষায় 'নোকরাম' বলা হয়ে থাকে।

গারোদের ধর্ম নিয়েও অনেক কথা। তাদের ধর্মকে ভূতপূজা বা প্রেতবাদ, জড়োপাসনা বলা হয়ে থাকে। তবে যে কথাটি এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সেটি হচ্ছে এই যে, 'Animism' বলতে যা বোঝানো হয়, তা হিন্দু সমাজে বহু গোত্রে ধর্মাচারণের সঙ্গে মিল দেখা যায়। হিন্দু সমাজে ভূতপূজক আছে, আছে নিরাকারবাদী। পন্ডিতগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে একেশ্বরবাদীদের অবস্থানও রয়েছে। তবে, গারোদের ঠিক হিন্দু বলে অভিহিত করার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে হাবার্ট রিজলীর মন্তব্য উদ্বৃত্ত করা যেতে পারে। তিনি বলেন- 'হিন্দু ধর্ম এবং জড়োপাসনার মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় মোটেও সম্ভব নয়। উপজাতীর লোকেরা (Tribal people) ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কাজেই ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে একজন উপজাতিকে হিন্দু বলা সমীচীন হবে, সে সমন্ধে প্রশ্নের অবকাশ আছে।' Doctor J.H. Hutton এ প্রসঙ্গে বলেনঃ উপজাতীয়দের মধ্যে অনেকগুলো ধর্ম পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ধর্ম খুঁজে বের করা যায় না। গারোদের ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীর উল্লেখে উপরের মন্ত ব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য।

গারোরা পুরাকাহিনীকে ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচনা করে। গারোরা ব্রহ্মপুত্র এবং তুরা পর্বতকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে অভ্যস্ত। গারো মেয়েরা বিয়ের আগে গৃহকর্ম ও যাবতীয় রন্ধনক্রিয়ায় বাবা-মা থেকে অনেক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এটি তাদের সমাজে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। গারোদের পূজা-পার্বন ও রীতি-নীতি হিন্দু ভাবাপন্ন। গারোদের পূজায়ও হিন্দুদের মতো ঠাকুর বা ধর্মযাজক থাকে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে 'দোয়ালগোই' সামাজিক মর্যাদায় উঁচু আসনের অধিকারী। দোয়ালগোত্র থেকেই কমল বা ধর্মযাজকগণ উদ্ভূত হয়ে থাকে।

গারোদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে অনেক আচার অনুষ্ঠান জড়িত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দু'টি পুজা-পার্বণের কথা বলা যেতে পারে। জীবহত্যা নৃত্যানুষ্ঠান গারোদের ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মদ্যপান করাও গারোদের ধর্ম-কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গারোদের অনেকেই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও গারোরা পূজা-পার্বণের আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে গিচি পং, আগাল মাকা, মিচিলতাতা, নবান্ন ইত্যাকার অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। ওয়াংলা পূজা গারোদের বেশ প্রিয়। এই পূজা গারোরা বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

ওয়াংলা পূজার উদ্দেশ্য দু'টি। একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ফসলকে কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা। অন্যটি হচ্ছে ব্যাধি-মহামারী ও রোগ-শোক থেকে নিজেদের মুক্ত করা । ওয়াংলা পূজা কালে বিশেষ এক অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করাহয়। এই অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে-আসংততা। এই আসংততাই আড়ালে থেকে গারোদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে বলে গারোদের বিশ্বাস। এই পূজার কিছু নিয়ম রয়েছে নিয়মগুলো হলোঃ প্রথমতঃ বাঁশ দিয়ে একটি ঘোড়ার মূর্তি তৈরি করা। মূর্তিটি তৈরি করে গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে রাখা হয়। তারপর পাঁঠা, বানর কিংবা ইঁদুর থেকে পছন্দসই যে কোনো একটি নিয়ে তার গলায় ধরা বেঁধে পুরোগ্রাম ঘুরিয়ে আনা হয়। শেষমেষ দা দিয়েই প্রাণিটিকে হত্যা করা হয়। তারপর বর্ণিত ঘোড়ার পাশে বাঁশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে দেয়াহয়। গারোরা মনে করে এই প্রাণিহত্যা দেখে রোগ মহামারী ভয়ে আর তাদের ধারেকাছে ভিড়বে না। গারোদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কিছু আলোচনারপর আপাততঃ আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাবো এবং বিষয়ের প্রয়োজনে আমরা আবার এ প্রসঙ্গে ফিরে আসবো।

গারোদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শুরুতেই বলেছি যে, গারোরা এসেছে আসাম থেকে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত ময়মনসিংহের গারোরা দক্ষিণ পশ্চিম চীন থেকে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আলি নওয়াজ মন্তব্য করেনঃ 'অসমা নামে একটি পালার উল্লেখ ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় পাওয়া যায়। পালাটি অন্য দু'একটি পালার মতো অপ্রকাশিত। একই নামে একটি ঐতিহ্যশীল পালাগান দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের 'এন্নান' প্রদেশের পাহাড় ও বিস্তীর্ণ জলাশয়ঘেরা দুর্গম অঞ্চল অধ্যুষিত বাদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রিয় 'শনি' উপজাতিদের 'ঈ' নামক উপশাখা থেকে সংগৃহিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নৈসর্গিক বৈচিত্র্য, জীবন জিজ্ঞাসা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঐ উপজাতীয় এলাকাটির পূর্ব ময়মনসিংহের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এবং সাম্প্রতিক কালেও ছিল। চীন পালা গান 'অসমা' তেও ময়মনসিংহ গীতিকার কোন কোন কাহিনী ও প্রেক্ষাপটের মিল পাওয়া যায়।

গারোদের সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আশু দত্ত বলেছেনঃ 'ইতিহাসবিদদের মতে গারো জাতির পূর্ব-পুরুষেরা তিব্বত থেকে ভূটানের পথে সঙ্কোশ নদী ও শাখা নদীর তীর বেয়ে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। এদের এক গোষ্ঠী পাহাড় অতিক্রম করে এ জেলার উত্তর প্রান্তে বাস করতে থাকে এবং পরবর্তী কালে একে একে হাজং, হদি, কোচ, ডালু, রাজবংশী প্রভৃতি উপজাতিরাও তাদের সাথে মিশে যায়।' গারোদের অধিবাস ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'Julius Marak' তার 'Goro customary laws and practices' গ্রন্থে বলেছেন-'Garos live in the hills and plains of the district alike, besides all parts of north-east India going as far as west Bangal including Bangladesh in the west. A good number of non-Garos too live in the Garo Hills district. The customs, culture and socio-

www.pathagar.com

economic conditions of other people have had their impact on the Garos particularly in the areas outside the district. Alarge nember of Garos have embraced Christianity. But on the whole, they have adhered to their cusdtomary laws, although the christians among them do not practice polygamy and the religious rites and practices of the non-christian Garos'.

Julius Marak গারোদের ৯টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে- (1) The Chisak (2) The Matchi (3) The Matabeng or Matiangche (4) The Ambeng (5) The dula or Matchi-Dual (6) The Along (7) The Gara-Ganching (8) The chibol (9) The Rung (10) The Megam (11) The A'wes or Akawes, (12) The koch ir kotchu or kochus. [The Garo customary laws and practices. Julius Marak, page-2,3]

'Chisak' গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব অংশে বস-বাস করে। তাদের অধিবাস সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে। তারা সুমেশ্বরী নদীর উত্তর তীরে বস-বাস করে। তারা খাসিয়া পাহাড় এবং সুমেশ্বরী নদীর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে বস-বাস করে।

'Matchi' গারোরা গারো পাহাড়ের মধ্য অংশে বস-বাস করে।

'Matabeng' গারোরা তুরা পাহাড়ের কাছাকাছি থাকে। যা নেত্রকোণা জেলার উত্তর দিকে অবস্থিত।

'Ambeng' গারোরা গারো পাহাড়ের পশ্চিম অংশের বাসিন্দা। অবশ্য তাদের কেউ কেউ গারো পাহাড়ের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বস-বাস করে। তারা গারো সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

'Dual এবং মাচি ডুয়েল' গারোরা সুমেশ্বরী নদীর উত্তর-পূর্ব অংশে সীমান্ত জুড়ে অবস্থান করে।

'Along' গারোরা গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বস-বাস করে। তারা সুমেশ্বরীর বুকে বস-বাস করে। স্বাধীনতা পূর্ব কালেই তারা ময়মনসিংহের অন্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে গড়ে তোলে তাদের অধিবাস। এসময় তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সুযোগ পেয়ে যায়।

'Gara-Ganching' গারোরা গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে বস-বাস করে। তারা বোগী নদীর কাছাকাছি বস-বাস করে।

'Megam' গারোরা পশ্চিম খাসিয়া পাহাড়ী জেলার সীমান্তে অধিবাস গড়ে তুলেছে।

'A'wes' গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বস-বাস করে। সমতল ভূমি কামরূপ এবং গোয়াল পাড়ার প্রান্ত জুড়ে তাদের অবস্থান।

'Koch' গারোরা গারো পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জিনারী নদীর প্রান্ত জুড়ে বস-বাস করে।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে যে, গারো পাহাড়ে বস-বাস করে বলে এবং গারো পাহাড়ের নাম অনুসারেই গারোদের গারো নামকরণ হয়েছে। তবে গারোদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জরুরী। গারোরা অষ্ট্রো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলেই তাদের সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার। এ প্রসঙ্গে নিশীথ রঞ্জন রায় বলেনঃ "ভৌগলিক পরিবেশের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সিন্ধু এবং গঙ্গা-যমুনার তটভুমি জুড়ে যেমন গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ সভ্যতার ধারা, তেমনি স্বকীয়তার উজ্জ্বল একটি বিশেষ সংস্কৃতির ধারা পুষ্টি লাভ করেছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। আর্য-পূর্ব যে সব জাতি, উপজাতি, কৌম, বর্ণ, নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল পূর্ব-ভারতের একটি বিরাট জনসমাজ, তাদের সঙ্গে আর্যাবর্ত এবং মধ্যদেশের অধিবাসীদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের যতো মিল তার চেয়ে কোন কোন বিষয়ে হয়তো বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যাবে ময়মনসিংহের সীমান্তের চতুষ্পার্শে অবস্থিত জনপদবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে"।

এই অঞ্চলটি কোনক্রমেই স্বল্পপরিসর বলে চিহ্নিত হতে পারে না। এর বিস্তৃতি আসামের উত্তরাঞ্চল থেকে বাংলার পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ সেই বিস্তৃত অঞ্চল যার অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র, সুবর্ণসিঁড়ি, তিস্তা, করতোয়া, দিবং, লোহিত, পদ্মা ও মেঘনার সুস্পষ্ট জলধারা। কিছু পার্বত্য কিছু সমতলবাসীবহুল, কিছু কৌম অধ্যুষিত, কিছু আদিবাসী প্রধান এই জনপদটিকে ঘিরে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ভৌগলিক পরিমন্ডল। এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাকে সঙ্গত কারণেই অভিহিত করা যেতে পারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা সভ্যতারূপে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, বর্ণ কৌম জাতীয় ভাষার মধ্যে যত অবাধ সংমিশ্রণ ঘটেছিল, গতি-প্রকৃতির দিক থেকে তা ভারতের অপরাপর স্বাঙ্গীকরণের মাত্রার চাইতে হয়তো বেশী।

Julius Marak তার 'Garo customary laws and practices' গ্রন্থে গারোদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ 'The origin of the name of 'Garo' has been a subject of controversy. Different views are expressed on the meaning of the word 'Garo'. The tribe it self is known to outsider as 'Garo' but the Garos call them selves 'A.chik', or 'Mande'.

Many writers have tried to trace the origin of the word 'Garo' without any satisfactory results. Major playfair says received their appellation of 'GARA' and that the name was extended to all the inhabiants of the hills, and that in time it become Corrupted from 'Gara to Garo' Again, he says that the Garos never use the name except in conversation with a foreigner, but always the name except

www.pathagar.com

in conversation with a foreigner, but always call themselves A'chik (hill man) Mande (the man), or A'chik Mande. There fore, he thinks that the word 'GARO' is merely a corrupt from of one of the sub-tribes. It is of course, true that there is a sub-tribe among the Garos. By the name of Gara-Ganching, who settled down in the south of the Garo Hill district. [Garo customary laws and practices Julius Marak, page:4,5]

গারোরা দেব-দেবীর পূজা করে। দেবীর মধ্যে তাতারা রাবুগাদের ভক্তই বেশী তারা। গারোরা তাতারা বাবুগা'র পূজাই বেশী করে। তাদের বিশ্বাস এই তাতারা বাবুগা'র কারণেই, এমনকি তার আদেশে নস্তু নুপান্তু এবং মাচি পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। গারোদের প্রচলিত সমাজে সালজং (সূর্যদেব), ছোদ্দুম (চন্দ্র), গোয়েরা (বজ্র), নোরোচিত কিমরী বোক্রী (বৃষ্টি), নোরিংগ্রো নোজিংজু (তারকারাজি), মেন (মাটি বা পৃথিবী), চোরাবুদি (শস্যদেবতা), আছিমা দিংগছিমা (ছোদ্দুম বা চন্দ্রের মা), মিসিয়াগ্রাং সোলজাং সংগ গিটাংগ (ধানের তত্ত্বাবধায়ক), কালকেম (গোয়েরা বা বজ্রের ভাই) প্রভৃতির বেশ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

গারোরা বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে দেব-দেবীর পূজা করে থাকে ঘটা করে। তারা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীকেও দেবতাজ্ঞান করে পূজা করে। এসব পূজা-পার্বনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সম্পৃক্ত নানা সংস্কার। গারো সমাজে সংস্কারমূলক 'দুরাসুংগা সংদুমুঙ্গ দাকগ্রীকা' (ব্রহ্মপুত্র ও তুরা পর্বতের লড়াই) নামক পুরাকাহিনীটি বিশেষভাবে প্রচলিত। আমরা এ কাহিনী সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো।

ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, ধর্মের সঙ্গে পুরোকাহিনীর সংযোগ নতুন নয়। গারো সমাজেও পুরোকাহিনীকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পুরোকাহিনীর মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, বিয়ের আগে গারো মেয়েরা গৃহকর্ম ও যাবতীয় রন্ধন ক্রিয়ায় পারদর্শী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাবা-মার ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্বীকার করে নিতে হয়।

গারোদের পূজা-পার্বন ও রীতিপদ্ধতি অনেকক্ষেত্রেই হিন্দুভাবাপন্ন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মতো ঠাকুর বা ধর্মযাজক আছেন। গারোরা ঠাকুরকে 'কমল' নামে অভিহিত করে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, গারোদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এসব গোত্রের মধ্যে দোয়ালগোত্রই সামাজিক মর্যাদায় উঁচু স্থানের অধিকারী ছিলেন।

গারোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অপরিহার্যভাবে নৃত্যানুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক ভাবে মদ্যপান অন্তর্ভুক্ত থাকে। গারোদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি নিয়ম চালু রয়েছে। ধর্মদ্রোহীর জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে কঠিন শাস্তি। ধর্মীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে গারোরা বেশ সচেষ্ট থাকে। এ প্রসঙ্গে Julius Marak তার 'Goro

www.pathagar.com

customary laws and practices' গ্রন্থে বলেছেন-'Any person who breaks the religious laws, traditions and practices will be inviting the anger of the gods wich shall have to be propitiated. Every religious ceremony must be performed without fail. In all such ceremonies, i.e. the wangala and the Ganna, etc, it is the duty of every chra-pante and the Mahari to contribute towards their expenses.' [page No. 51]

গারোদের পুজার সঙ্গেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা ওয়াংলা পূজার দৃষ্টান্ত সামনে আনতে পারি। ওয়াংলা পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য তথা ফসলাদিকে কীট-পতঙ্গের আক্রমবণ থেকে রক্ষা করার জন্যে কৃপা প্রার্থনা করা। তাছাড়া গারোরা মনে করেন যে, মানুষ যদি ওয়াংলা পূজা করে, তারাও রোগ-ব্যাধি মহামারী থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর তাই স্বাভাবিক কারণেই ওয়াংলা পূজার সময় অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করা হয়ে থাকে। এই অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে-আসংতাতা। গারোদের মধ্যে যারা আসংতাতা শক্তির প্রতি বেশী নিবেদিত, তারা জীবনে বেশী উন্নতি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে যে, গারোরা মনে করতো যে, প্রাণিহত্যা দর্শনে কোনো রোগ-মহামারী ভয়ে মানুষের কাছে আসতে পারে না।

গারোদের মধ্যে প্রস্তরপূজা বা প্রস্তর-উত্তোলন পূজা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, লৌকিকতা বা ধর্মাচারের পেছনে অবশ্যই দার্শনিক ভিত্তি কাজ করে। জনৈক পাশ্চাত্য পন্ডিত তাই মন্তব্য করেছেন-'Erecting of stone is a religous belief in almost all hill tribes.'-আদিম সমাজের মানুষের ধারণা ছিলো মৃতব্যক্তির আত্মা-বস্তু (soul matter) পাথরেই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি কোন উপায়ে ধরে রাখা যায়, তাহলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কোনো ভাবেই শিথিল হবে না। এই বিশ্বাস থেকেই গারোরা প্রস্তর-পূজা করে থাকে। তারা এ-ও মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আশ্রয় দানের জন্যেই প্রাচীন কাল থেকে সমাধির উপর পাথর স্থাপন করা হয়ে থাকে। তারা এ-ও মনে করে যে, আত্মা-পাথর ক্রমে আত্মা-মূর্তির (soul figure) রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা জানি যে, গারোরা পূর্ব পুরুষের পূজা করে থাকে। এই পুজা পাথর পুজারই নামান্তর। এ ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তির প্রতি এক ধরণের সংস্কার কাজ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূর্বপুরুষ পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হচ্ছে উর্বরাবাদ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়-'Fertility' গারোরা মনে করে যে, মৃতের আত্মা-বস্তুর পূজা করলে মাটির উর্বরতা বেড়ে যায় বলে স্বাভাবিকভাবেই শস্য উৎপাদান ক্ষমতাও বেড়ে যায়। এই রীতি গারো ছাড়াও অন্য আদিবাসী বা উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্যমান। এসব উপজাতির মধ্যে রয়েছে- সাঁওতাল, খাসীয়া, ওঁরাও প্রভৃতি। গারোরা হত্যাকারী শক্তি লাভের অধিকারী হয়। ইংরেজিতে বলা যায়-'Killed enters the killer' এজন্যই গারোরা জীববলি করে থাকে। এই জীববলি গুলো হলো পাঠাবলি, খরগোশবলি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

গারোদের ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনীটি চমকপ্রদ। তাদের বিশ্বাস-আদিতে চারদিকে পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ভূমির কোনো চিহ্ন কিংবা রেখা ছিলো না। চারদিকে ছিলো কেবল অন্ধকার। তারপর নুপান্তকে ভব্বান বালি মুষ্টিবদ্ধ করে পানির নিচে নিক্ষেপ করে বললেনঃ নিচে থেকে মাটি নিয়ে এসো।

গারোরা পুনঃজন্মে বিশ্বাসী। হিন্দুরাও তাই। গারোদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনী গারোরা তাদের চেতনায় ধারণ করে। তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীর সঙ্গে মধ্যভারতের গড় উপজাতীয়দের সৃষ্টিতত্ত্ব কাহিনীর অধিক সামঞ্জস্য রয়েছে। গারোরা বিশ্বাস করে যে, অসৎকর্ম করলে তার আত্মা মানুষ হিসেবে আর জন্মলাভ করতে পারবে না। তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে পশু-পাখি বা জীব-জন্তু রূপে।

গারোদের আহার্য এবং পানীয়ও অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মতোই। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, শূকর ইত্যাদি খায় গারোরা। কিন্তু, ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসারে গারোরা বিড়াল খায় না। গারোদের প্রিয় খাবার হচ্ছে খরগোশের গোশত। গারোদের অপরিহার্য পানীয়ের মধ্যে রয়েছে মদ। এই মদ তারা নিজেরাই তৈরি করে। অঞ্চলিক ভাষায় এই মদকে 'পচাই' বলা হয়।

গারোদের ভাষা মৌখিক। এর কোনো লিখিত রূপ নেই। গারোদের ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এর একটি হচ্ছে-মান্দি কুচিক (সকল মানুষের ভাষা), আন্যটি হচ্ছে আচিক কুচিক (পাহাড়ীদের ভাষা)। ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড় সংলগ্ন এলাকার গারোদের মধ্যে আচিক ভাষার প্রচলনই বেশী দেখা যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

গারো লোক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নৃত্যগীত। সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই নৃত্যগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে। গারোদের ওয়াংলা পূজা অনুষ্ঠানে যে সব নৃত্যগীতের উৎসব চলে, তা সত্যিই হৃদয় গ্রাহী।

গারোদের মধ্যে প্রেমমূলক গীতি পরিবেশনের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। প্রণয় গীতিগুলো সাধারণত ভাবী দম্পতির মুখেই গীত হয়ে থাকে অরণ্য অভ্যন্তরে পরস্পরের মিলনের মুহূর্তে। এসব গানে পরস্পরের আত্মনিবেদনের চিত্রটিই ফুটে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে-

১। 'দো দা গিতা বিদালিং অম্ব,
রাউ গিতা পিনারেং ডংব।'
এর বাংলা অর্থ হচ্ছে-
'তুমি দেখতে যেন নিটোল ভেকী-মুরগীর মতো,
অথবা তুমি একটি সুন্দর আকৃতির কচি লাউ।'

২। 'কোচিল মন্ডল বিবালিন ডৎগ সংবা।
মিক্‌গিল ওয়াত্‌রে রিজাকিন্ রাজ্যে সাংবা।'

www.pathagar.com

বাংলা অর্থ-
'তোমার ঠোঁট দু'টি যেন মন্ডল বৃক্ষের ফুল;
তোমার চোখের মণি যেন কচি বাঁশের পাতার মত নীলাভ।'

৩। 'সুকমে কিমকারোং মিতিং অম্‌সংবা
জাপিং গাম্বারী বিকগিং ডংগসংবা'
বাংলা অর্থ-
'তোমার বুক ছোট ডেফলের মত সুন্দর;
তোমার উরুদেশ গাম্বারী বৃক্ষের গুঁড়ির মত শাদা-মসৃণ।'

গারোরা জুম চাষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাহাড়ী জাতি মাত্রই জুম চাষের উপর অনেকটা নির্ভর করে। মাঠের কাজ কেবলমাত্র পুরুষেরাই করে না, গারো মেয়ে-পুরুষ সকলেই মাঠে কাজ করে। যাদুতন্ত্রের প্রভাব গারো সমাজে বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। গারোরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যে, আত্মাবস্তু কমে গেলে রোগ, মৃত্যু ফসলের কমতি, অনাবৃষ্টি, সন্তান না হওয়া কিংবা সন্তান হয়েই সাথে সাথে মারা যাওয়ার মতো ঘটনা দেখা দেয়। আর তাই যেখানে আত্মা-বস্তুর অভাব সেখানে মন্ত্র খাটিয়ে আত্মাবস্তুর আবির্ভাব ঘটানো যাদুর কাজ।

গারোদের গার্হস্থ্য জীবনও আমাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যমন্ডিত। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী এবং যাদুতন্ত্রীই প্রকারান্তরে গারোদের চিকিৎসক বা ডাক্তার। রোগ নিরাময়ের জন্যে তারা মন্ত্রতন্ত্র ও গাছগাছড়ার শিকড়পাতা ব্যবহার করে। গারোদের নিত্যদিনের জীবন ও পোশাক-পরিচ্ছদ একেবারেই সাদামাটা। মেয়েরা কাপড় পরিধান করে ব্লাউজ ও লুঙ্গির মতো করে টুকরো করে।

গারোদের আবাসিক গৃহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসীদের মতো মাচাং পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়। গারোদের ঘরগুলো নির্মিত হয় সমতল ভূমির বাঙালিদের মতোই। গারোরা সাধারণতঃ ছন দিয়ে তৈরি ঘর নির্মাণ করে। অবশ্য যারা সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাসম্পন্ন তাদের বাড়িতে চারচালা টিনের ঘরও দেখা যায়। কয়েকটি ঘর নিয়ে গঠিত আবাসিক ভূমিকে বলা হয় গারো বাড়ি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাড়ি শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ। দেখা গেছে অবস্থাসম্পন্ন গারোদের বাড়িতে তিন-চারটি বাসগৃহতো থাকেই, এছাড়া বাংলাঘর (বৈঠক খানা), ধানের গোলা, গোহাল ঘর ও দেখা যায়।

Rev: WILLIAM CAREY AND OTHERS প্রণীত 'THE GARO JUNGLE BOOK' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে-'GARO houses, Called changys, are bamboo structures, from thirty to one hundred and fifty feet long, and from twenty to forty feet broad. Each house is built out from the cliff rearwards, and supported on piles. The fronts are flush

www.pathagar.com

with the ground, or raiscd cresf of a feet above it, perhaps a line of the mon the crest of a ridge, or a cluster crowning some concial hill. The walls and the floor are of bamboos, cut open and woven as mats. It many houses a Veranda runs along the side, and there is always a platform or porch at the back and. Through a trap-door in the flooring all manner of fifth is thrown down to the scavenging fowls and hogs below. The house porch is of ten used for pounding rice, the mortar being a hollowed stump of hard wood, the pestile a thick pole. Front verandas are often piled up with skulls of stags, boars, leopards and other ghastly relice.' [page-14]

আকৃতিগত দিক থেকে গারোরা সাধারণতঃ বেঁটে হয়। তারা খুব পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী। স্ত্রীলোকদের পোশাকের ব্যাপারে আগেই আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে বলা যায় যে, গারো মেয়েরা সাধারণতঃ শাড়ির বদলে বাড়িতে বোনা নীল ও লাল রঙের ছোট সায়াপরে পুরুষরা সাধারণতঃ নেংটি পরে এবং শরীরের বেশীর ভাগই অনাবৃত থাকে।

গারোরা এক সময় আসামের অধিবাসী ছিলো। আর তাই গারোদের ভাষার মধ্যে বাংলা ও আসামী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্রভাষাই গারোদের গোষ্ঠীগত ভাষা হয়ে গেছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে দ্বিভাষিতাও দেখা যায়। বাংলা ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তারা গোষ্ঠীগত ভাষা ব্যবহার করে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাংলা সংখ্যা ও শব্দের সাথে গারো ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি সংখ্যার উচ্চারণ ও কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় শব্দের উল্লেখ করলাম ১- সা, ২- গ্নি, ৩- গিতাম, ৪- ব্রি, ৫- বোংগা, ৬- ম্নি, ৭- ছোক, ৮- চিকুংগ, ৯-চেত। মোরগ-দোবিপা, মুরগী-দোবিমা, গাভী-ম্যাচুবিমা, ষাঁড়-ম্যাচুবিপা, পিতামহ-সাচু, মাতামহী-আম্বি, মানুষ-মান্দি ও মেসা, স্ত্রীলোক-নেচিক ইত্যাদি।

গারোদের ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গারোদের লিখিত কোনো ভাষা নেই। স্কুল-কলেজ লেখা-পড়া করে তারা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিখতে এবং পড়তে পারে। এ প্রসঙ্গে Rev: WILLIAM CAREY AND OTHERS প্রণীত 'THE GARO JUNGLE BOOK'-গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে-'For a people with none educated, with no written language, with no knowledge of expressing thought save by word of mouth, how could a mission be efficient without reducing their language to written form, and teaching at last some of them toread, and putting in to their hands the word of God in their own tongue? Hence from Remakes first school at Drama to the present, school work has received much of the missionaries attention and has been one of their most effeciefnt

www.pathagar.com

agencis for upbuliding soul and for the up building of christion characters.' [page –240]

আমরা আগেই বলেছি যে, গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মা থেকে মেয়েতে বর্তায়। উত্তরাধিকারিনীও মনোনীত হয় মায়ের মনোনীত কোনো এক মেয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট কন্যা উত্তরাধিকারিনী মনোনীত হয়। উত্তরাধিকারিনী কন্যাকে নোকনা নামে ডাকা হয়। সমতল ভূমির গারোরা অবশ্য সকল মেয়ের মধ্যে অংশ সমানভাবে ভাগ করে দেয়ার পক্ষপাতী। যেখানে নোকনা মনোনীত থাকে, সেখানে অন্য মেয়েরা অংশ পায়। নোকনার স্বামীকে বলা হয় নক্রম। বিয়ের পর নক্রম স্ত্রীর বাড়িতে চলে যায়। পুরুষের স্বোপার্জিত সম্পত্তির মালিকানাও স্ত্রীর উপর বর্তায়।

এ প্রসঙ্গে Julius Marak তার 'Goro customary laws and practices' গ্রন্থে বলেছেন-'The property of the Garo family being the proper of the wife, the husband of the house cannot sell or mortgage it without the consent of his wife and her chra. Before selling any movable or immovable property the chra and mahari must be consulted first. It any property is sold or mortgage mortgaged or selling os invalid.' [page –156]

মৃত্যুর পর গারোদের মৃতদেহের সামনে অনেক ধরণের খাদ্যসামগ্রী উৎসর্গ করা হয়। এক্ষেত্রে, খাসীয়াদের সঙ্গে গারোদের মিল রয়েছে। কারণ, গারো এবং খাসীয়া উভয় উপজাতিই আসাম থেকে আগত। গারোরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর আত্মা মংগ্রো সংগ্রাম (আত্মার বাসস্থান) নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। গারোরা মনে করে উৎসর্গীকৃত খাদ্য দ্রব্য মিসাং মিসাল চারম নামক স্থানে জমা থাকে এবং আত্মা তা গ্রহণ করে। তার পর পাপ-পুণ্যের বিচার হয়।

গারোদের মৃত দেহ পোড়ানো হয়। মৃত্যুর পরের দিন রাতে সাধারণতঃ এই মৃতদেহ পোড়ানোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। চিতা সাজানো হয় গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে। চিতাকে বলা হয় 'গাচি'। শবদাহ করা হয় এই গাচিতেই। শবদাহের সময় ইংরেজী Y-এর মতো যূপকাঠে একটি পাঁঠা মতান্তরে ষাঁড় হত্যা করা হয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, পশুটির আত্মা মৃতব্যক্তির আত্মাকে পরবর্তী জীবনে সকল ধরণের সহযোগিতা করবে। এক সময় মানব হত্যার প্রচলন ছিলো। বর্তমানে এই প্রথা লোপ পেয়েছে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গারোরা মাঠে কাজ করে। তারা কৃষিকাজের পাশাপাশি কাঠ কেটে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কাঠ পুড়িয়ে তারা কয়লাও তৈরি করে। পরবর্তীতে, সেই কয়লা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। বাজার সওদা এবং পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান ভাবে কাজ করে। জীবন যাপনে

www.pathagar.com

গারো মেয়েরা খুবই সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। সন্তান পালনে তারা খুবই ধৈর্যের পরিচয় দেয়। পিঠে সন্তান বেঁধে গারো মেয়েরা মাঠে কাজ করে এবং গহীন আরণ্যে গিয়ে কাঠ কাটে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গারোরা দেব-দেবী বলে মনে করে এবং তাদের সেভাবে সম্মান করে।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে গারো মেয়েরা শোক-গীত পরিবেশন করে থাকে। এই শোকগীতি শোকাবহ স্মৃতি বহন করে-

১। 'বোয়াবসি তে রাখচা আপনি অং রিবিকুপী
মৃক্তামতি ছোজাক্ছা দুমকো ওয়াংগা।'
['ছোট একটা কুঠারের আঘাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।
ছোট একটা ছুরির ঘায়ে আমার সোনার ময়না শেষ হয়েছে।'

২। 'বোলং রাকিপা গিতা অপারা
বোলসাল দানিপা গিতা দু'মারা।'
['রাকির পিতা বোলং এর মত তুমিছিলে, হে আমার বাবা।
দানির পিতা বোলসালের মত তুমি ছিলে, যে আমার ময়না।']

৩। 'আপনি অং রিকিকু মিতেনি পীকু ক্লাজাজুক,
দো মনি অং কামবেকু কাত ছিনি ওয়াং গাকু হাইজাজুক।'
['বাবামণি, কখন দেবতা এসে তোমাকে নিয়ে গেলো কিছুই বুঝতে পারিনি।'
সোনামণি, কখন আমার বুক থেকে একটি পাতা ঝরে পড়লো কিছুই বুঝতে পারিনি।']

গারোদের আদি নাম কি এ নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেন। 'গারো' শব্দের অর্থ নিয়ে সকলে একমত পোষণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে Julius Marak তাঁর 'Garo customary laws and practices' গ্রন্থে বলেছেনঃ 'The origin of the name of 'Garo' has been a subject of controversy. Different views are expressed on the meaning the word 'Garo'. The tribe itself known to out siders as 'Garo'. But the Garos call themselves 'A.chik', or 'Mande'.

Many writers have tried to trace the origin of the word 'Garo' with out any satisfactory results. Major playfair says that the Garo or Ganching sub-tribe first received their appellation of 'GARA' and that the name was exttended to all the inhabiants of the hills, and that in time it become Corrupted from 'Gara to Garo' Again, he says that the Garos never use the name except in conversation with a foreigner, but always call themselves A'chik (hill man) Mande (the

www.pathagar.com

man), or A'chik Mande. There fore, he thinks that the word 'GARO' is merely a corrupt from of one of the sub-tribes. It is of course, true that there is a sub-tribe among the Goros. By the name of Gara-Ganching, who settled down in the south of the Garo Hill district. [page:4,5]

আগেই বলা হয়েছে যে, গারোরা যাদুতন্ত্র বিশ্বাস করে। গারো সামাজে এই যাদুতন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। গারোরা যাদুতন্ত্রকে শক্তি হিসেবেই বিবেচনা করে এবং তারা মনে করে যে, অপশক্তিকে জয় করাই শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। যখন বৃষ্টি নামে, তখন তারা মনে করে যে, কৈলাশ মন্ডলের শক্তির কারণেই বৃষ্টি নেমেছে। এই শক্তি বলে মরা গাছে ফল ধরতে পারে, বন্ধ্যা রমণীরা সন্তান পেতে পারে।

ময়মনসিংহ জেলায় গারোরা সংখ্যায় একেবারে কম নয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলায় উপজাতিভুক্ত মানুষের সংখ্যা হচ্ছে ৮৩ হাজার। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ছিলো গারো (খ্রিস্টান গারোসহ)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এ সংখ্যা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। গারোরা শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতিতে ইতঃমধ্যেই অনেক বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে গারো মেয়েরা

www.pathagar.com

হাজং

ময়মনসিংহ জেলায় পাহাড়ী অধিবাসীর সংখ্যা একেবারে কম নয়। গারো পাহাড়ে গারোদের পাশাপাশি হাজংদের অধিবাস। এ জেলার গারো পাহাড় ঘেঁষে থাকা সমতল ভূমি বিরিশিরি, হালুয়াঘাট, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দী, নেত্রকোণা জেলার সুসংদূর্গাপুর কলমাকান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে হাজং-রা বাস করে। গারোদের মতো হাজং-রা ও বহিরাগত।

বৈচিত্রময় বনভূমিতে বস-বাসকারী এই হাজংরা জীবন-জাপনেও বৈচিত্র্যসন্ধানী। হাজংরা গারোদেরই একটি শাখাগোষ্ঠী। গারোদের জীবন-যাপনের সঙ্গে হাজংদের জীবন-যাপনের অনেকটাই মিল লক্ষ্য করা যায়।

নৃতত্ত্ববিদ Coloenl E.T. Dalton মনে করেন 'হাজংরা আসামের আদিম অধিবাসী এবং কাছারী নামক বৃহত্তর জাতির শাখাভূক্ত'। হাজংরা যে গারো নামক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির অন্তর্ভুক্ত সে কথাও তিনি বলেছেন। এ প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ Rev: Sidney Endle & Coloenl E.T. Dalton -এর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, হাজংরা কোচ জাতির শাখাভূক্ত।

www.pathagar.com

হাজংদের জীবন আচরণে বেশ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তারা পূজা-পার্বণেও অভ্যস্ত। একটা সময় ছিলো যখন হাজংরা পূজা-পার্বণে ও বিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ ব্যবহার করতো না। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হাজং ভাষায় যিনি 'অধিকারী' নামে পরিচিত, তাঁর নির্দেশেই উল্লেখিত কর্মকান্ড সম্পাদিত হতো। কিন্তু, সে অবস্থা এখন আর নেই। বর্তমানে পূজা-পার্বণসহ যাবতীয় অনুষ্টানে ব্রাহ্মণ বা ঠাকুরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হাজংরা হিন্দুদের মতোই সিজু (ফনি মনসা) বৃক্ষকে অনেক পবিত্র বলে মনে করে।

১৯২১ খ্রিঃ ময়মনসিংহে হাজং এর সংখ্যা ছিলো ২৩১২১ জন, ১৯৩১ খ্রিঃ এর সংখ্যা ছিলো ১৯৬২৩ জন। অন্যান্য কোমদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে হাজংরা ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পত্যন্তব্যাপী ঐক্যবদ্ধভাবে বস-বাস করে। হাজংদের উৎস এবং উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। লোকশ্রুতি আছে যে, হাজংরা আসামের গৌহাটির অন্তর্গত হাজো অঞ্চল থেকে এসেছ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোচ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নামও হাজো। 'জীবন-সংগ্রাম' গ্রন্থে মণি সিংহ বলেছেনঃ 'হাজং, গারো, ডালু, কোচ, রাজবংশী যারা গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাস করতো, তাদের মধ্যে হাজং উপজাতীয়রাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ।' (পৃষ্ঠা-২০)

জানা যায় যে, ১৯৯০ খ্রিঃ জমিদারগণ হাজং উপজাতীয় নেতাদের ডেকে আনেন। তাদের মধ্যে চার জন বিশিষ্ট হাজং নেতাও ছিলেন। এই চার জনের মধ্যে গোরা চাঁদ ছিলেন সবার সেরা। তিনি যৎসামান্য লেখা-পড়াও জানতেন। জমিদারগণ হাজংদের কাছে জমির খাজনা চাইলেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু পাহাড় নেই, হাতি খেদা নেই, সেহেতু জমির খাজনা না দিলে জমিদারী অচল হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাজংরা ছিলেন জমিদারভক্ত। তাঁরা জমিদারদের ভগবানের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। হাজংরা যে জমিদারদের কতোটা বাধ্য, তা গোরাচাঁদ হাজং-এর মন্তব্য থেকেই জানা যায়। গোরাচাঁদ বলেছিলেনঃ 'ধর্মাবতার আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা জঙ্গল কেটে সাফ করে জমি চাষাবাদের উপযুক্ত করেছেন, কত লোক বাঘের কবলে ও সাপের কামড়ে প্রাণ দিয়েছে, জংলী দুরন্ত মহিষের সাথে সংগ্রাম করে জমি আবাদযোগ্য করেছে। হাতি খেদায় আমরা লোক দিয়েছি, সেখানেও লোক মারা পড়েছে। আমরা গরীব আমরা খাজনা দিতে অপারগ। হুজুর সুবিবেচনা করে খাজনা মাফ করে দেন"। এ উক্তি থেকে হাজংদের দিন যাপনের গ্লানি এবং জীবন সংগ্রাম, সম্পর্কে জানতে পারা যায়। জমিদারগণ খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে হাজংদের অনেক বুঝালেন। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলোনা। হাজংদের এক কথা কোনো মতে তারা বেঁচে বর্তে আছে সামান্য জমি-জমা চাষ করে। এ অবস্থায় তাদের খাজনা দেয়া সম্ভব নয়। সে সামর্থ্যও তাদের নেই। গোরাচাঁদ খাজনা প্রসঙ্গে বললেনঃ 'আমরা ডাকে-হাঁকে আপনাদের কাছে আছি। আমরা অনুগত আছি। জমিদারগণ ভাবলেন যে, হাজংরা জমিদার দের ভগবানের অংশ বলে মনে করে। অথচ, তারা খাজনা দিতে চাচ্ছে না। এক বিচিত্র এবং অভিনব ব্যপার। এ পরিস্থিতিকে বিদ্রোহের পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর তাই জমিদারগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাজংদের ডান্ডা

www.pathagar.com

মেরে ঠান্ডা করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। জমিদারগণ এই মর্মে কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাজংদের কাছ থেকে খাজনা পাওয়ার স্বীকৃতি যেকোনো ভাবেই হোক আদায় করতে হবে। এরই সূত্র ধরে হাজং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই হাজং বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গৌরবময় কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস। হাজং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হাজংরাই ছিলো নেতা, হাজংরাই ছিলো আন্দোলনকারী।

Rowney মনে করেন হাজংরা কাছারীদেরই একটি শাখা। এই দুটি শাখার একটি হচ্ছে পর্বতীয়া বা পর্বতবাসী। অন্যটি হচ্ছে হাজাই বা সমতলবাসী। এই হাজাই থেকে হাজং শাখার উৎপত্তি। Rowney-এর সঙ্গে কর্ণেল ডাল্টনও একমত পোষণ করেন।

হাজংদের ভাষা পূর্ববঙ্গীয় বাংলার একটি অপভ্রংশ। আচার্য গ্রীয়ার্সনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য-'Acrorupt frpm of Bengali used by the Hajang tribe.' ১৮৮১ খ্রিঃ আসাম Census report এ আসামের ৩৬৪৯ হাজং এর মধ্যে ৫৮১ জন হাজংভাষী। ১৯৮১ খ্রিঃ রিপোর্টে হাজং ভাষা কে বোডোগোষ্ঠীভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিন্তু, ঐ বছরেই প্রকাশিত গ্রীয়ার্সনের ভাষা জরিপে স্বতন্ত্র হাজং ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। হাজংদের বিয়ের ব্যপারে নিকট আত্মীয়ছাড়া অন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। অবশ্য J.K.Bose হাজংদের মধ্যে কামলিগাঁও, কালিগাঁও, কেন্দাগাঁও, মুঞ্জুরগাঁও, নামক নিকনী বা Clan- এর কথা বলেছেন।

১৮৯১ খ্রিঃ Assam Census Report -এর Tanov গারো পাহাড়ের রাজ বংশীয়দের পরেই হাজংদের সবচেয়ে হিন্দু ভাবাপন্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গৃহ এবং গৃহস্থলীর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে হাজংরা বিশেষ ভাবে এগিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রেও হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ঠ মিল লক্ষ্য করা যায়। জন এলিয়ট হাজংদের প্রসঙ্গে মন্ত ব্য করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই বলেছেন যে, "At the foot of the hill reside a caste of people called Hijins; their customs nearly resmble the garrows; in religious matters they partake more of the Hindus, as they will not kill a cow; Their habitatious are built like the houses of the rayots in general, but are better made, enclosed with a courty ard, kept rewarkably neat and clean, the railing made of bamboo split, flatted and Joined together, the streets of their villages equal the neatness of their houses."

Major A. Playfair তাঁর বিখ্যাত –'The Garo' গ্রন্থে হাজংদের সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেবল তা-ই নয়, স্যার রিজলীর 'The casted and Tribes of Bengal' গ্রন্থে হাজং সম্প্রদায় সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য নেই।

হাজংরা নিজেদের সনাতন হিন্দুপন্থি বলে দাবি করে। কেবল তা-ই নয়, তারা নিজেদের ক্ষত্রীয় বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে। Dr. Verrier Elwin এর মন্তব্যটি এ

www.pathagar.com

প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে "বড়ই আক্ষেপ এবং শোচনীয় ব্যাপার যে আদিবাসী সমাজ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত একটি জাত হবার জন্যে খুবই আগ্রহশীল। কেননা তাদের ধারণা-এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং নিজেরা উন্নত বলে পরিচিত হবে"।

হাজংরা আগের মতো আর পিছিয়ে নেই। তাদের অনেকেই এখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজংদের ঝোঁকও হিন্দু ধর্মের প্রতি বেশ প্রবল। হাজংরা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও পূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় রীতি-নীতির ক্ষেত্রে উচ্চতর হিন্দুদের সঙ্গে তাদের বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হাজংরা হিন্দু হলেও তাদের মধ্যে অনেক প্রাচীন আচার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। আর তাই তাদের আদিম অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে তাদের বলা হয় "Primitive"।

হাজং-দের মধ্যে দুটি গোত্র বা গোষ্ঠী রয়েছে। একটি হচ্ছে বায়্যাবছড়ি, অন্যটি হচ্ছে পরমার্থী। সামাজিক মর্যাদায় পরমার্থীরা উপরে। কেউ কেউ তাদের হিন্দু সমাজভুক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন। গরু ও শূকরের গোশত তারা খায় না এবং মদ পান করে না। অন্যদিকে, বায়্যাবছড়ি শ্রেণীর হাজংদের শ্যাক্ত শ্রেণীর হিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য এই দুই গোষ্ঠীতে বিয়ের ব্যাপারে কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

হিন্দুদের সব দেব-দেবীই হাজংদের পূজা-পার্বণে অধিষ্ঠিত। শিব ও দূর্গা তাদের কাছে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আগে তারা ঋগ্বেদের ঋষিদের প্রধান দেবতা বলে স্বীকার করতো। সামাজিক রীতি-নীতি পালনের ক্ষেত্রে হাজংরা গারোদেরই অনুসরণ করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাহাড়ী অন্য আদিবাসীদের মতো হাজংরাও সংস্কারমুক্ত নয়। বছর শেষে ব্রহ্মপুত্র নদকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করার রীতি হাজং সমাজেও লক্ষ্য করা যায়। ফি বছর আমরা তাই লক্ষ্য করি অগণিত হাজং মানব-মানবী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানের প্রয়োজনে সমবেত হয় এবং স্নান সমাপন করে পুণ্যলাভে উদ্যোগী হয়। হাজংগণ এই স্নানকে বেশ পুণ্যের কাজ বলে মনে করে থাকে।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে ঋষি ও চরিপাক পরিবর্তিত হয়ে হাজংদের শিব ও দুর্গায় পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। হাজংরা পূজা-পার্বণের সময় সিজু (ফনিমনসা) বৃক্ষ পবিত্র বলেই জ্ঞান করে। পূজা-পার্বণের কোনো কাজই সিজুবৃক্ষ ছাড়া শেষ হয় না।বিশ্বসৃষ্টির রহস্য-উদঘাটনে ঋগ্বেদের প্রাচীন ঋষি যা অনুভব করেছিলেন, হাজংরাও তাই বিশ্বাস করে থাকে। হাজংরা মনে করে বিশ্বসৃষ্টির শুরুতে সবকিছুই ছিলো অন্ধকারে আবৃত। সব কিছু জলমগ্নও ছিলো। কোনো কিছুই চিহ্নিত ছিলো না। হাজংরা মনে করে অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সর্বব্যাপী (ঈশ্বর) ছিলেন আচ্ছন্ন। তপস্যার মাধ্যমে সেই এক বস্তু জন্মেছিল।

www.pathagar.com

হাজংদের মধ্যে বেশ কিছু পুরাকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ঝড়, মহামারী বজ্রপাত প্রভৃতির বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই পুরাকাহিনীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাকাহিনীগুলোকে আমরা বলতে পারি সংস্কারবদ্ধ ধারণার সমষ্টি। আগেই বলা হয়েছে যে, হাজংরা বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। হাজংদের বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যাপারে অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে একটি কাহিনী হচ্ছে এরকমঃ পুরাকালে কোন হাজং নাকি দীর্ঘকেশ, বিস্রস্ত দাড়ি-গোঁফ এবং নোংরা অবস্থায় তাদের প্রধান দেবতা ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো। ঋষি এতে রাগান্বিত হলেন এবং তাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবার জন্যে আদেশ করলেন। তাছাড়া আরও বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে যেন কেই অপরিষ্কার আবস্থায় তাঁর কাছে না যায়।

হাজংদের বিয়ের রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও গারোদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। বিয়ের আগে যদি কোনো নারী অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়, তাহলে ব্যভিচারীকে বিয়ে করতে বাধ্য করানো হয়। হাজং সমাজের নিয়ম অনুযায়ী সেই ব্যভিচারীকে কিছু টাকা মেয়েকে জরিমানা দিতে হয়। এধরণের বিয়েকে হাজং সমাজে দাইমারা বিয়ে বলে অভিহিত করা হয়। বিয়ে সাধারণতঃ বাবা-মা এবং অভিভাবকের মতানুসারেই ঠিক করা হয়ে থাকে। অবশ্য পরমার্থী হাজংদের বিয়ের নিয়মও হাজং সামজে নেই। গারোদের মধ্যে যে ঠ্যাংধরা বিয়ের প্রচলন রয়েছে, তা-ও হাজং সমাজে নেই। হাজংরা দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী-ও রাখতে পারে। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হলে হাজংরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে।

বিয়ে বিচ্ছেদের প্রথাও হাজং সমাজে রয়েছে, রয়েছে তালাক প্রথাও। অবশ্য গর্ভবতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার বিধান নেই। হাজংদের তালাক দেয়ার ব্যাপারটি ও বেশ অভিনব। তালাক প্রার্থী স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের অধিকারীদের নির্দিষ্ট একটি স্থানে ডেকে আনে। তাদের সামনেই তালাক প্রার্থী স্বামী-স্ত্রী কিছু পান টুকরো টুকরো অবস্থায় এক জায়গায় স্থাপন করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পূর্বাভাষ ঘোষিত হয়। তারপর সবার সামনে তারা পরস্পর পরস্পরকে মা-বাবা সম্বোধন করে। এভাবেই সম্পন্ন হয়ে যায় বিবাহ বিচ্ছেদ।

হাজং সমাজে বিধবা বিবাহের রীতিও রয়েছে। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত রয়েছে। শর্তটি হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই মৃত স্বামীর ছোট কিংবা বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিধবার বিয়ে হতে পারে না। অবশ্য হাজংদের মধ্যে পরমার্থী গোত্রের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই বললেই চলে। হাজংদের বিয়েতে মন্ত্র পাঠ করার নিয়ম নেই। হাজংদের বিয়ের অনুষ্ঠানও বেশ কৌতুহল উদ্দীপক ও রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করে। বিয়ে হয় বরের বাড়িতে। বিয়ের দিনে সেই বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে চতুষ্কোণ করে চার পাশে যত্ন করে পোঁতা হয় কলাগাছ। তারপর সেখানে ষোলটি মোমবাতি, কারো মতে মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। এর পাশেই থাকে পানিভর্তি ষোলটি মাটির পাত্র। সেই চতুষ্কোণ স্থানে বর-কনে আবেগতাড়িত হয়ে ও রোমাঞ্চ নিয়ে আবস্থান করে।

www.pathagar.com

সবার আগে কনে বরের চারপাশ সাতবার প্রদিক্ষণ করে। তাঁরপর পূর্ব দিকে মুখ করে কনে দাঁড়িয়ে যায় বরের ঠিক বামপাশে। গ্রামের অধিকারীরা তখন মাটির পাত্র থেকে পানি তুলে এনে নব দম্পতির গায়ে ছিটিয়ে দেয়। এর পর ঘোষণা করা হয় যে, বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আগেই বলা হয়ছে যে, গারোরা মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু, হাজংরা মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই ছেলেরা সমান হারে পায়। গারোদের মতো হাজংদের পরিবারে মেয়েদের প্রধান্য নেই। বিয়ের সময় মেয়েদেরকে যৌতুক রূপে অনেক কিছু দিতে হয়। সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। গারোদের মতো হাজংরাও জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। হাজংদের মধ্যে হালকর্ষণের রীতি প্রচলিত। হাজং মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাঠ কেটে অর্থ উপার্জন করে। পুরুষদের চেয়ে হাজং মেয়েরা একতা বদ্ধ থাকতে ভালোবাসে।

গারোদের তুলনায় হাজংরা বেশ গোঁড়া। বাইরের লোকদের সঙ্গে তাদের খুব একটা মিশতে দেখা যায়না। হাজংরা নিজেদের সম্পর্কে বেশ সচেতন। এই সচেতনতা মেয়েদের ব্যাপারেই বেশী প্রযোজ্য। নিজেদের ধর্ম-কৃষ্টি ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রতিপালনে তাঁরা বেশ তৎপর। Coloenl E.T. Dalton এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে সামনে আনা যায়। তিনি বলেছিলেনঃ 'They have shown themselves more conservative of race, pnrity and ancient custom'।

পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ব্যাপারে হাজংরা খুবই সাধারণ। সাধারণতঃ পুরুষেরা ধুতি পরিধান করে। মেয়েরা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান এমন এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে নেয় এবং অনেকটা গামছার মতো কাপড় দিয়ে বুক বেঁধে তার উপর ব্লাউজ ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, গারো মেয়েরা কেবলমাত্র ব্লাউজ পরে, বুকে বাঁধার জন্যে কাপড় ব্যবহার করে না। আর তাই গারো ও হাজং মেয়েদের পৃথক করা খুবই সহজ।

হাজংরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরি করে। আমারা জানি যে, কার্পাস চাষের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। হাজংরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে এই কার্পাস বিদেশেও রফতানি করতে পারে। শুধুমাত্র লবণ ছাড়া আর কোনো কিছুই হাজংরা বাইরে থেকে ক্রয় করে না। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তারা নিজেরাই উৎপন্ন করে থাকে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রাপ্ত বয়স্ক সব পুরুষ হাজংই পৈতা ব্যবহার করে থাকে। পৈতা গ্রহণ প্রাপ্তবয়স্ক হাজংদের জন্যে বাধ্যতামূলক। পৈতা গ্রহণের সময় অনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়ে থাকে।

হাজংরা এমনিতে সহজ-সরল হলেও যুদ্ধ বিগ্রহে তারা অভ্যস্ত। পাহাড়ী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হাজংরাই বেশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী। এজন্যে হাজংদের মধ্যে শিক্ষার হারও বেশি।

www.pathagar.com

হাজংরা বেশ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে অনেক ঘটনা-কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রাজপুত্র রঘুনাথকে ঈশা খাঁ রাজপ্রসাদ আক্রমণ করে নিয়ে যায়। তখন রঘুনাথের বয়স ছিলো পাঁচ বছর। ঈশা খাঁ রঘুনাথকে বন্দি করে নিয়ে নিজ রাজধানী জঙ্গল বাড়িতে রাখে। রঘুনাথ ছিলো কোচ রাজপুত্র এবং অসংখ্য গারো-হাজং ছিলো তাদের প্রজা। অসংখ্য গারো-হাজং রঘুনাথকে উদ্ধার করার জন্যে নানা ধরণের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জঙ্গলবাড়ি পৌঁছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জঙ্গলবাড়ি রাজপ্রসাদটি ছিলো প্রাচীরঘেরা। সেই প্রাচীর অতিক্রম করে আক্রমন করা সহজসাধ্য নয়। গারো-হাজংদের দলের নেতা হুকুম করলেন ঃ

'তিন কোশ দু'রাত আছ ধনাইয়ের ঢালা।
গাঙ্গিনা আর তার মধ্যে ক্যাটা আন নালা ॥'

গারো-হাজংরা তিন ক্রোশ দূরবর্তী ধনাই নদী থেকে খাল কেটে এনে তার প্রাচীরের সাথে যোগ করলেন এবং অতর্কিতে ঈশা খাঁর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে রাজা রঘুনাথকে উদ্ধার করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ঈশা খাঁর ঘাটে পানসী বা ভাওয়াল্যা বাঁধা থাকতো। রঘুনাথকে পানসী বা ভাওয়াল্যায় উঠিয়ে তারা চম্পট দিয়ে ছিলো। এ প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বলা হয়েছিলো, সেগুলো হচ্ছে-

'ভাওয়াল্যায় উঠিয়া তবে দাঁড় মাইল টান।
শূণ্যে উড়ে কেমন যেমন পবন সমান ॥
তিন দিনের পথ যায় পলকেতে বাইয়া।
ঈশা খাঁ লাগাল পায় আর কেমন করিয়া ॥

এই কাহিনীর মাধ্যমে হাজং-গারোদের অভূতপূর্ব বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সাহসের ক্ষেত্রে হাজং মেয়েরা ও কম যায় না। বাঘ, জংলা হাতি, মহিষ, গয়াল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে তাদের, গহীন অরণ্যে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে-

'সাজিল কামিনী ফুল কানে দুলে কন্নফুল,
মারে তীর হুমকা বাঘের গায়েরে।
রেবতী আর চন্দ্রকলা, এক হাতে ধনু ছিলা
আর এক হাতে বাইছা তুলে বাণরে ॥
সত্যভামা আগু হইয়া রণেতে চলিল ধাইয়া
হাতে লইয়া ধনু আর বাণরে ॥

হাজংরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। শিবকেই তারা প্রধান দেবতা বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। হাজংদের বহু আচার-অনুষ্ঠান শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বললেও বেশি বলা হবে না। হাজং সমাজে বহু গীতিগানেরও প্রচলন দেখা যায় শিবকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য যে, শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই হয়তো এই সব গান গাওয়া হতো।

www.pathagar.com

হাজংরা কার্তিকব্রত পালন করতো। কার্তিক মাসে এক প্রকারের ব্রত গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে হাজং সমাজে। এই গানে মেয়েদেরই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। হাজং সমাজেও নৃত্যগীতের প্রচলন রয়েছে। গারোদের মতো দলবদ্ধ হয়েই তারা এই নৃত্যগীত পরিবেশন করে থাকে।

গারোদের মতো পূর্ব-পুরুষ পূজা কিংবা প্রস্তর পূজা হাজং সমাজে নেই। তবে জাদু মন্ত্রের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। যারা যাদুতন্ত্র পরিবেশ করে থাকে, তারা হাজং সমাজে বেশ সম্মান লাভ করে থাকে। হাজংরা বিশ্বাস করে যে, যাদুতন্ত্রের প্রভাবে রোগশোক, মহামারী, ভূত- প্রেত, ডাইন-ডাইনী মানুষের জন্যে ক্ষতিকর কিছু করতে পারে না। যাদুতন্ত্রের প্রভাবে বন্য হিস্র জন্তু ও তাদের বন্য আচরণ ভুলে যায়। বাঘ তার হিংস্রতা ভুলে গিয়ে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে, কথা বলে এমন বিশ্বাসও হাজংদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

Hodgson নওগাঁ জেলার হাজারী কোছারীদের সঙ্গে হাজংদের পার্থক্য খুঁজে পাননা। উভয় সম্প্রদায়কে তিনি একই সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞান করেন। J.K.Bose হাজংদের একটি গারো মাচং হিসেবেই অভিহিত করতে অভ্যস্ত। গারো ভাষায় হাজং হচ্ছে=হা=মাটি, জং=পোকা। সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায় মাটি পোকা। কৃষিকাজে হাজংদের দক্ষতা ও নৈপূণ্যতা বিবেচনা করে হাজংদেরতো মাটিপোকা বলাই যায় নাকি? এটিকে নিছক ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। হাজংদের নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য থাকলেও হাজংরা যে কাছারীদের অংশ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এন্ডেল মনে করেন কাছারী শব্দ হাজো (মানে পাহাড়-পর্বত) থেকেই নিষ্পন্ন হয়েছে হাজং শব্দটি। তাঁর ধারণা এই কাছারীরা সপ্তদশ শতকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পিছু হটে গোয়ালপাড়া অঞ্চল থেকে প্রথমে গারো পাহাড়ে এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটের প্রত্যন্ত সমভূমিতে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, নিকট আত্মীয় ছাড়া হাজংদের বৈবাহিক ব্যাপারে খুব একটা বিধি-নিষেধ নেই। স্বাভাবিক কারণেই হাজংদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক না হলেও কন্যাপণের প্রথা অতীত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন হাজংরা কাছারী হাজাইদেরই জাতি। এ প্রসঙ্গে Waddel-ও একমত পোষণ করেন। Waddel-হাজংদের কাছারী সম্প্রদায়ভূক্ত জাতি বলে চিহ্নিত করে মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরসুরী বলেই বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রে 'Maternal stage of family'-এর সাক্ষ্য ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, হাজংরা প্রতি বছর একবার সমবেতভাবে ব্রহ্মপুত্র স্নান করাকে খুবই পুন্যজ্ঞান করে এবং তা করেও থাকে। হাজংরা মনে করেন এই স্নানে পরশুরামের মাতৃহত্যাজনিত পাপক্ষয় হয়েছিল। তাই এই স্নানে তাদের কাছে পাপ বিমোচনের উপযুক্ত পন্থা হিসেবে বিবেচ্য।

হাজংদের মধ্যেও অন্তর্বিবাহ (Endogamy) ও বহির্বিবাহ (Exogamy) সমাজের উভয়গোত্রেই এক সময় প্রচলিত ছিলো বলে জানা যায়। আমরা আগেই

www.pathagar.com

বলেছি যে, বায়্যাবছড়ি ও পরমার্থীগোত্রের মধ্যে বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না। পাশাপাশি একই গোত্রে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো বিধি নিষেধ নেই। বর্তমানে অবশ্য এ রীতির কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা য়ায়।

হাজংরা পুনজন্মে বিশ্বাস করে। শিশু জন্ম গ্রহণ করলে তারা মনে করে যে তাদেরই মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মা নতুন দেহে জন্ম গ্রহণ করেছে। এবারে হাজংদের মৃতদেহ সৎকার প্রসঙ্গে আসা যাক। হাজংদের মৃতদেহ পোড়ানো হয়। অবশ্য কলেরা কিংবা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ কখনও কখনও কবরস্থও করে হাজংরা। সাধারণভাবে গ্রামের কাছাকাছি কোনো শ্মশান ঘাটে চিতা সাজিয়ে হাজংদের সবদেহ দাহ করা হয়। বিশেষ এক পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। এই পদ্ধতি হচ্ছে পুরুষদের মাথা উত্তর দিকে স্থাপন করে মুখ উপরের দিকে আর অনুরূপভাবে মেয়েদের মুখ নিচের দিকে রাখা হয়। কেউ মারা যাবার দশদিন বা একমাস পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

হাজংদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে খ্রিস্টান মিশনারীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং কার্যকরি পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। গরিব হাজংরা আর্থিক কারণেই মূলতঃ ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে আগ্রহী। হাজংদের অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে স্বচ্ছল জীবন-যাপন করছে। হাজংদের ভাষা নিয়ে অনেক কথা আছে। ডক্টর গ্রীয়ারসন হাজং ভাষাকে টিবেট-বর্মন ভাষা বলেছেন। কিন্তু সত্যিকারের তথ্য হচ্ছে এই যে, হাজং ভাষায় বাংলা ও অহমীয়া (আসামী) ভাষার সংমিশ্রণ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও কাছারী ভাষার অনেক শব্দ হাজংভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ উপজাতীয় ভাষাই বাংলা ভাষার অজস্র শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে এবং তা করেছে অনিবার্য ভাবেই। এ প্রসঙ্গে আমরা চাকমা ভাষাকে সামনে আনতে পারি। অবশ্য চাকমা ভাষায় বাংলা শব্দ বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এদিকে আবার স্বাভাবিক ভাবেই গারো ভাষার সঙ্গে হাজং ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহের অনেক উপজাতীয়গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে হাজং ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। এসব উপজাতীয় ভাষা সমুহের মধ্যে হাদি,দালুই, বানাই ভাষার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গারো ভাষার সঙ্গে হাজং ভাষার মিল একেবারেই সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষার সঙ্গে হাজং ভাষার সাদৃশ্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে নিচের উদ্বৃত্তাংশটুকুই যথেষ্ট। অনুধাবনের সুবিধার্থে আমরা প্রথমে বাংলা ভাষার উদ্বৃত্তাংশটুকুই পরিবেশ করছি, পরে হাজং ভাষার উপস্থাপন করা হবে।

এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। তার ছোট ছেলে বাপকে বললোঃ "সম্পত্তির যতটুকু আমি পাবো, তা আমাকে দিয়ে দাও"। বাপ তাদের অংশ ভাগ করে দিলেন। কয়েকদিন পরেই ছোট ছেলে চলেগেলো বিদেশে। আর সেখানে গিয়ে সে উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ তথা কুকর্ম করে সঙ্গে নেয়া নগদ টাকা-পয়সা সবই উড়িয়ে দিলো। টাকা-পয়সা শেষ হয়ে যাবার পরই সে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তারপর আর তার কষ্ট দেখার কেউ রইলো না।

www.pathagar.com

সে তখন সেই দেশের একজনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সে লোকটি তাকে মাঠে শূকর চড়ানোর কাজ দিলো। সে শূকর যে তোষ খায়, সে তুষ খেয়েই জীবন ধারণ করতে চাইলো, কিন্তু এটিও তাকে করতে দিলো না তার আশ্রয় দাতা। সে মনে মনে বললঃ আমার বাপের কাছে কত বেতনভোগী কর্মচারী খাদ্য-দ্রব্য পেয়ে থাকে আর আমি পেটের ক্ষুধায় ভূগছি। বলতে গেলে আমার মরে যাবার মতো অবস্থা। আমি এখন আমার বাপের কাছে যাবো। তাঁর কাছে গিয়ে বলবোঃ 'বাবা' আমি তোমার কাছে পাপ করেছি, ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি। আমি এখন তোমার ছেলে বলার যোগ্য নই। আমাকে তোমার বেতন ভোগী চাকর করে রাখো।

পরে সে নিজের বাপের কাছে চলো গেলো। বাপ দূরে থাকতেই ছেলেকে দেখে পাগলের মত গিয়ে ছেলের গলা ধরে চুমো খেলেন। ছেলে বাপকে বললোঃ 'বাবা আমি তোমার কাছে পাপ করে ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি। আমি এখন তোমার ছেলে গণ্য নই'।

পিতা তখন নিজের চাকর ও দাসীগুলোকে তাড়াতাড়ি ভাল কাপড় এনে তাকে পরিয়ে দিতে বললেন। তার হাতে আংটি ও পায়ে জুতা পরতে বললেন। আরও বললেনঃ 'আমরা খেয়ে দেয়ে আনন্দ উৎসব করবো। কারণ আমার এই ছেলেটি মরে গিয়ে জীবিত হয়েছে, হারাবার পর ফিরে এসেছে'। পিতা তখন উৎসবের আয়োজন করলো। বড়ছেলে মাঠে কাজ করছিল। ফিরে এসে ঘরে পা ফেলতেই নৃত্য ও গান বাজনা শুনতে পেলো। সে তখন একজন চাকরকে বাইরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলোঃ 'এসব কি?'।

চাকরটি বললোঃ 'তোমার ছোট ভাই ফিরে এসেছে আর তোমার বাবা-খুব খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে। এখন আর তাঁর কোন রোগব্যাধি চিন্তা নেই'। তখন সে রাগ করলো এবং সেখানে যেতে চাইলো না। অতঃপর সে বাপের কাছে গিয়ে বললো ঃ 'আমি এতদিন তোমাকে খাওয়ালাম-দাওয়ালাম আর তোমার কোনো আদেশও অমান্য করলাম না, আর তুমি আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দিলে না, আর যে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ করে এসেছে, তার জন্য এত খাওয়ার আয়োজন করেছো?' তখন পিতা বললেনঃ 'আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি আর আমার যা কিছু সবইত তোমার। এই ভাই মরে গিয়ে জীবিত হয়েছে, হারিয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসেছে।

হাজং ভাষায়ঃ "একজন মানলগ দুইনা পোলা থাকিবার। তানি অলাক হুট পালারা রাপরাগে কয় যে বাবা। মর বকরা আমার যে মর পাব ওদা মগেদি। তানি আয় উমাগে ভাগ করিয়া দিলে। কয়েকদিন থাকিয়াই হুট পালারা বিদ্দেশ ষালে আর উদানি হে আয় রাখার করিয়া ধুম ধাম কৈরা যা কিছু নগদ-ফপগদ টাকা পয়সা থাকিবা বেবাক উড়িয়া ফেলাল। আয় উংকানি খরচ-পরচ করিয়াই ঐ দেশনি ভারে আকাল পাড়িয়া ষালে। তারপর অলাক কষ্ট কাই দেখে তনি অয় যাইয়া ঐ দেশনি একজন মান ঠাই ভর

www.pathagar.com

করিলো। ঐ মান্তা আগে নিজের বন্দভায় হুয়র চারাবাকা পাঠিয়ে দিলে; পাছে হুয়রে যে তুষা রায় উদা খাইয়া অয় কোন মতে পেট ভরাবাক চাবায়। কিন্তু, তাও আগে কেউই না দিলে। মনে মনে কয় আর ঘুনি যে মলাক বাপ ঠাঁই কত বেতনভুগী চাকর বেশ-বেশ খাওন পাইয়া থাকে আর ময় ইদানী পেটের ভকে মরে। ময় উঠিয়া আপনার বাপ ঠাই যাবো, আর আগে কবো বাব; ময় তর সাইক্ষ্য ঈশ্বর ঠাঁই কত পাপ করছে, ময় আর তালাক পোলা বিকেলে গইণ্যই না হয়, মগে তালাক একরা বেতনভোগী চাকর নেহে নারেক। পাছে আয় উঠিয়া আপনার বাপ ঠাই যালে। তাতে অয় রাখার দুরথাকিবাতে অলাক বাপরা আগে দেখিলে লার আগলা ছাগলাকে পালারাগে দেখিয়ে হা-হুতাশকে যাইয়া পালারাগ গালা ধরিয়া চুমা খালে। পলারা আগে কয় বাবা। ময় ঈশ্বর ঠাই তার সাইক্ষ্য কত পাপ করেছে, ময় আর তালাক পলা বিলেই গইন্যা না হয়। তানি বাপরা আপনার চাকর আর দাসী গিলেকে কোলে শীঘ্র ভালো কাপুড় আনিয়া এগে পিনিয়া দি"।

এলাক হাতনী আর আংঠি জেঙ্গনি জুতা পিনিয়া দি, আর হামরা খাইয়া দাইয়া সুখ করঙ্গ। কেনেনা মলাক এই পলারা মার যাবার জিঙ্গিয়াছে, হারায়া যাবার তানি পাছে। তানি উমরা কত সুখ করলো। আর অলাক ডাঙ্গর পালারা ক্ষেত্রনি থাকিবার। অয় আহিয়া ঘর পাক পাং বেলা নিত্য ও বাইজ বাজনা হুনিল। তানি অয় একজন ঢাকরগে বারানি ডাকিয়া হুদ করিলো ইগিলা কি? অয় আগে কোলে তলাক ভাই আহিছে আর এর বাপ খাওনের জুগার করছে। অয় রাখার দিন তন রুগ বেগ নাই করিয়া পাছে বেদেন। ধরিলে চা অত বছর ধরিয়া ময় তগে খাওয়ালে দাওয়ালে আর লাগিলে। তানি ময় বাপরাগে কবাক ধরিলে চা অতি বছর ধরিয়া ময় তগে খাওয়ালে দাওয়ালে আর লাগিলে। তানি অয় বাপরাগে কবাক ধরিলে চা অতি বছর ধরিয়া ময় তগে খাওয়ালে দাওয়ালে আর তালাক হুকুম কোনো দিনো নাই ফেলালে তাও তয় মগে কোনো একরা হাগল ছাওয়াও না দিলে যে মলাক ভাই বন্ধু লইয়া আনন্দ করো। কিন্তু, তলাক এই পলারা যে বেপদা গিলিলাগ লগে তলাক ধন দৌলত খাইয়া ফেলোঝে, অয় যখন আহিলে তখন তয় লগন আছে আর মলাক যা হয় হ্যালইত তলাক। তানি কয় আগে কয় বাবা। তয় হগল বেরাই মর লগন আছে আর মলাক যা হয় হগলইত তলাক। তবে যে আনন্দ হুলাস করন ভালাই হছে। কেনোনা তলাক এই ভাইরা মরিয়াও নাই মরে হারায় যাবার তানি পাছে।

হাজংদের মধ্যে দ্বিভাষিকতার লক্ষণ দেখা যায়। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তাঁরা গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলে। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। আবার বাড়িতে গিয়েই গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলে তারা। হাজংদের নিজস্ব লিখিত কোনো বর্ণমালা নেই।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারী অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলার হাজংদের সংখ্যা ছিলো ৩৫ হাজার। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আদম শুমারী মতে হাজংদের পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়নি। আদম শুমারীতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ ময়মনসিংহে উপজাতীয়দের সংখ্যা ১৫,৩২৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭, ৪৯৩ জন এবং মহিলা ৭,৮৩৬ জন।

www.pathagar.com

কোচ

ময়মনসিংহ জেলার যে সব উপজাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে কোচদের সংখ্যা নগণ্য। কোচদের উৎস অনুসন্ধান করলে আমাদের হান্টারের কাছে ফিরে যেতে হয়। হান্টারের মন্তব্য অনুযায়ী কোচ, রাজবংশী ও পালিয়া একই নরগোষ্ঠী থেকে এসেছে। তাদের নাক প্রশস্ত, মুখমন্ডল চ্যাপ্টা এবং তাঁরা উচুঁ চোয়ালের হাড় বিশিষ্ট। হান্টারের মতামত অনুযায়ী কোচরা বন্য পার্বত্য উপজাতি। তবে কোচরা যে মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর কোনো শাখা বা উপশাখা থেকে এসেছে, সে বিষয়ে কোনো মত পার্থক্য নেই। নৃবিজ্ঞানী, জাতিবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কোচরা মঙ্গোলয়েড জন ধারার মানুষ।

কোচরা দেখতে খর্বাকৃতির। তাদের দৈহিক গঠন নাতিদীর্ঘ বললেই সঠিক বলা হয়। মাংস বহুল, স্থুল ধরণের মানুষ মাথার খুলি দীর্ঘাকৃতির, তাদের গায়ের রং ঘন

www.pathagar.com

শ্যামলা থেকে কালো। নাক অনেকটা ছোট চাপা, নাসাপ্রান্ত প্রসারিত, মুখমন্ডল চ্যাপ্টা, চুল ক্ষেত্র বিশেষ সোজা বা কোঁকড়ানো। চিবুক একেবারেই ছোট। কোন ক্ষেত্রে নেই-ই বলা চলে। গায়ের লোম কম।

আমরা জানি যে, পালবংশের রাজা দেবপালের (৮১৫-৮৫০) সময় হিমালয় পর্বতের উপত্যকাবাসী কম্বোজ নামক পরাক্রান্ত এক জাতি এক সময় গৌড় আক্রমণ করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিগণ কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে মনে করেন যে, কোচ ও মেচ কম্বোজ জাতির বংশধর। এ প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতের আলোকে দেখা যায় যে, কম্বোজ শব্দটি বিকৃত হয়ে বা পরিবর্তিত রূপ লাভ করে কমোচ এবং এক পর্যায়ে কওচ বা 'কোচ'-এ পরিনতি পেয়েছে। V.A. Smith Early এর 'History of India' গ্রন্থের আলোকে বলা যায় যে, তিব্বত নিয়ে কিংবদন্তী আছে। এই কিংবদন্তী নেপালে প্রচলিত। কিংবদন্তী অনুসারে তিব্বতই পরবর্তীতে নামান্তরিত হয়ে কম্বোজ নাম ধারণ করেছে। এই তথ্যের আলোকে তাই বলা যায় যে, কোচরা তিব্বত এবং এর সন্নিহিত কোনো এলাকা থেকে এদেশে এসেছে। মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবাকাতে নাসারি' একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিলো। এ সময় ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং উত্তরবঙ্গে কোচদের বেশ প্রধান্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রবাদ আছে যে, কোচরা আগে ভুটানের বথ হাচু বা বথ পাহাড়ের আধিবাসী ছিলো। ভুটিয়াদের সাথে এক পর্যায়ে কোচদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কোচরা পরাজিত হয়। পরাজিত হওয়ার পর কোচরা আসামের কোকরাঝারের পূর্ব দিকে বউ কুমারী পাহাড়ে পাড়ি জমায় এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। এক পর্যায়ে সেখানে তারা রাজ্যও স্থাপন করে। কোচরা নগর দিলো কোচদের রাজধানী। কোচ ছাড়াও বর্তমানে রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও নিজেদের কোচ বলে দাবি করে। কোচরা আট সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে-হারিগইয়া, দশাগাইয়া, কোচরা, ওয়ানা, বানাই, মরাগন, তান্তিকিয়া, সতপরি, সংকর। কোচদের পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। কোচদের ভাষা অবশ্য অসমীয়া প্রভাবমুক্ত। 'The Encyclopaedia of Bengal, Bhear and orissa' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে-'কোচরা ভারতের অতি প্রাচীন জাতি। মেচ-কাছারিদের সাথে ভাষার সাদৃশ্য আছে'।

কোচ নামের উৎপত্তি নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। এ নিয়ে প্রবাদ কিংবদন্তীরও শেষ নেই। কারো কারো মতে পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর কোচে (ক্রোড়ে)) আশ্রয় নিয়েছিলো। আর এভাবেই হয়েছে কোচ নামের উৎপত্তি। কেউ কেউ মনে করেন ক্ষত্রিয় জাতির সংকোচ অবস্থা থেকে কোচশব্দের উদ্ভব। বিশ্বকোচ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোচ। কারো কারো মতে- শঙ্কোশ নদীর তীরবর্তী বলে কোশ বা কোষ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোচ। কোচ শব্দের উৎপত্তি দেখানো যায় এভাবে-জাতিকৌমুদী ও যোগিনীতন্ত্র মতে কুবাচ (মন্দভাষী) শব্দ থেকে। কোষদেশের নাম যোগিনীতন্ত্রে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ভাবেই কোচরা বিনয়ী। স্বভাবে নম্র এবং জীবন-যাপনে সৎ। কোচদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত। কোচরা বিভিন্ন পেশায় এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। সহজ-সরল জীবন-যাপন করে তারা। তবে তারা বেশ পরিশ্রমী (ঈশ্বর এবং দেব-দেবী সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা নেই। প্রেতপূজা বলতে গেলে তাদের ধর্ম। কোচদের প্রধান দেবতার নাম ঋষি এবং তাঁর পত্নীর নাম জাগো। কোচরা লংঠায় রায় নামে শিল দেবতার পূজা করে। লংঠায় রায়রা ছিলেন সাতভাই। তাঁদের নাম হচ্ছে-কালোরা, ডিরকা, মিরকা, কান্তাবুড়া, বলোরা, সোনারায়, মহবুড়া, রাউতি। লংঠায় বায়েরা হচ্ছেন সাতবোন-আকালি, সাকালি, সাউতি, সনকা, মেনতা, রউতি, রূপারায়। তাঁরা সকলেই উপাস্য। কোচরা পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বৈশাখ মাসে নিকিল পূজা করে। কোচরা প্রথমেই ঋষি দেবতাকে ভোগ দেয়। এর পর তাঁরা অন্য দেবতার পূজা করে। পূজার স্থান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। যত্ন সহকারে লেপা হয় সেই স্থান। দেয়া হয় ধুপ-ধুনা। দেবতাদের কলা দিয়ে ভোগ দিতে হয়। কোচদের উল্লেখযোগ্য পূজা হচ্ছে-হুকুম দেও। পূজায় দেবতার উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগিও উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির জন্যে যে পূজা করা হয়, সেই পূজা হচ্ছে-হুকুম দেও। মেয়েরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। পূজাতে কলা গাছের প্রয়োজন অনিবার্য। কোচরা পোষনা (মাঘ বিহু) কালিগাসা (কলি বিহু) পালন করে থাকে। এ সময়ে বাদ্যবাজনা চলে এবং নাচ-গান হয়। বর্তমানে কোচরা দূর্গা, সরস্বতি, কালী, মনসা, বিষহরি ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করে।

কোচদের বিয়ে শাদীর ব্যাপারটি বেশ অভিনব। বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে কথা বলেন অভিভাবকগণ। কোচদের বিয়েতে নকল যুদ্ধের আয়োজন অনিবার্য। যুদ্ধ যদিও শক্তিপরীক্ষার ব্যাপার, তবুও বিয়েতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষই ইচ্ছে করে পরাজয় স্বীকার করে। বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করতে হয় কন্যাপক্ষকেই। কন্যাপক্ষ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মুরুব্বীদের সামনে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে। সবাই যখন বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তখন বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে কাপড় ও শাখাসিন্দুর প্রদান করে। বর-কনে উভয়কেই এসব জিনিস স্পর্শ করে শপথ ও প্রতিজ্ঞা করতে হয়। এরপরই হুজী (গুরুজন) বিয়ে সম্পাদন করে। বিয়ের রীতি অনুযায়ী বরকে কন্যাপক্ষের বাড়িতে অবস্থান করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্যকরা যায়। সেক্ষেত্রে, কনে বরের বাড়িতে অবস্থান ও বস-বাস করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিয়েতে পণপ্রথারও প্রচলন রয়েছে।

কোচদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বর-কনে ইচ্ছে মতো বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। বিধবা বিবাহও কোচ সমাজে প্রচলিত রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর নতুন বিয়েতে কোনো বাধা নেই কোচ সমাজে। আগেই বলা হয়েছে যে, কোচরা মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন পালন করে। সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারও কোচ সমাজে প্রচলিত।

www.pathagar.com

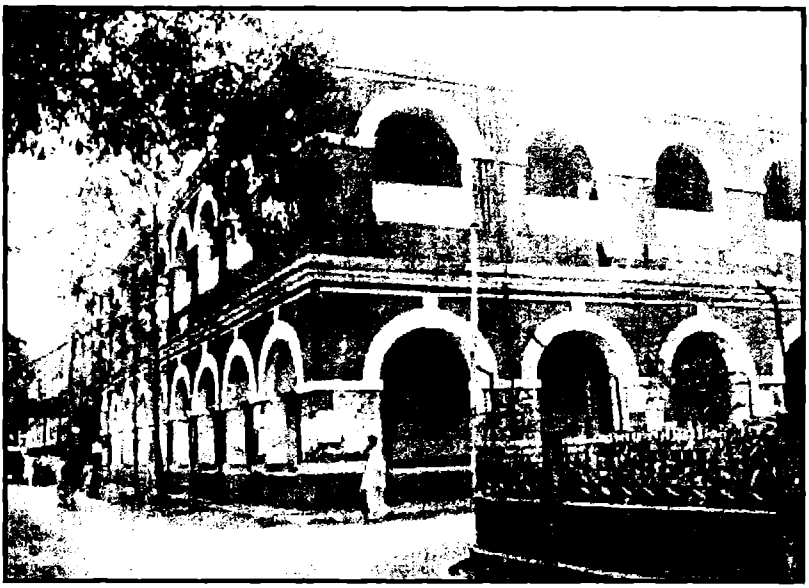

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ময়মনসিংহ নামের প্রেক্ষাপট

নামে কি বা আসে যায়? অনেক বেশি প্রচলিত একটি কথা। একটি জনপদের নামকরণের সঙ্গে সেই জনপদের ভৌগোলিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট জড়িত। ময়মনসিংহ নামকরণের পিছনে ও এটি সত্য। 'ময়মনসিংহ' নামকরণটি নানা বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে। এই নামকরণের সঙ্গে ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিকটি বিশেষভাবে জড়িত।

প্রাচীন ইতিহাস ইতিবৃত্ত, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির দেশ ময়মনসিংহ-বৃটিশ আমলে সেকালের বৃহত্তম জেলা শহর যুগে যুগে ময়মনসিংহের ভৌগোলিক আবহ, জনসমাজ, সাহিত্য বিশেষ করে আবহমান লোকসংস্কৃতি, নানা প্রাচীন নিদর্শন যুদ্ধবিগ্রহ, লোকশ্রুতি, লোকপুরাণ-ইত্যাদি দেশী বিদেশিদেরকে মুগ্ধ করেছে। এখানকার নদনদীর জলপ্রবাহ, সোনালি আকাশ, রূপোলি বাতাস, সুদৃশ্য প্রান্তর ভূমি, নব নব ঋতুর নীল চিত্র চিরদিনের শ্যামলিমা দেশবাসিকে আকৃষ্ট করেছে।

এখানকার বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক আবহ, জনসমাজ, পাহাড় পর্বত বিচিত্র নদ নদীসহ খাল বিল, ঝিল হাওর-এসবেই ময়মনসিংহ ভূখন্ডের অপরূপ বৈশিষ্ট্য সূচিত

www.pathagar.com

করেছে সে অতি প্রাচীনকাল থেকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা জমিদার, দেশী বিদেশী শাসক প্রাচীন ময়মনসিংহকে শাসন করেছে, এই পটভূমিতেই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এ অঞ্চলের বিভিন্ন নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহ নামকরণের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও মধ্যযুগ থেকে লক্ষ্য করা গেছে। অনেক লেখকের অনেক মত, মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বে আধুনিক ময়মনসিংহ জেলা শহরের উদ্ভব সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র ধরে এ ভূখন্ডের নামকরণের ইতিকথা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

এই সব ইতিহাসের উৎস থেকে আমরা আলোচনার সূত্রপাতে সংক্ষিপ্ত মতবাদগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। উল্লেখ্য যে অতি প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই জানা যায় না। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বিভিন্ন রাজত্বে অর্থাৎ মধ্যযুগের মুসলিম শাসন থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এই নামকরনের সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এক সময় এই জেলা ময়মনসিংহ শুধু বাংলাদেশের নয়, উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা ছিলো। আজ সেই বিরাট জেলা ছ'টি জেলায় রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীনতার পর বর্তমান রূপ ও আকার ধারণ করছে। ময়মনসিংহ জেলা নিয়েই কথা বলছি। সেই অতীতের ইতিহাস বা ফেলে আসা দিনগুলোর নানা কথা, উপকথা, ইতিকাহিনী স্মরণ করলে আজও আমরা আবেগ প্লাবিত, অনুভূতিতে প্রবল হয়ে উঠি। যথার্থ ইতিহাস সাহিত্য নয় সত্য, তবে সাহিত্যের ভাষা শিল্প ছাড়া ইতিহাসও লেখা হয় না। ইতিহাসও আমাদেরকে সাহিত্যরসের মতই সুদূরের পথে নিয়ে যেতে পারে।

মধ্যযুগে এই জেলার নামছিল নাছিরাবাদ। তারও আগের ইতিকথা, এ অঞ্চলটি মোমেনশাহী নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ গবেষক জ্যারেট সাহেব ফার্সি ভাষায় আইন-ই-আকবরী অনুবাদ করার সময় মোমেনশাহী কথাটি ইংরেজিতে মোমেনসিংহ লিখে ফেলেন। ঐ আমল থেকেই এই পরগণার নাম তিনরকম বানানে লিখা হতো ময়মনসিংহ, মোমেনসিংহ, মৈমনসিং এ রূপে। প্রাচীনকালে মোমেনশাহী নাম চালু থাকলেও এক সময় এই পরগণার নাম হয় নসরতশাহী। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেনশাহ তার পুত্র সৈয়দ নাসির উদ্দিন নসরত শাহর জন্য ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য গঠন করেছিলেন। ফলে নসরত শাহ তাঁর নামও জুড়ে দিলেন। সেই থেকে এ রাজ্যের প্রধান শহর বা রাজধানী শাহজাদা নসরত শাহর নামানুসারে নশরতশাহী বা নাসিরাবাদ নামের সৃষ্টি। নাসিরাবাদ নামের অনেক গুলো প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে জেলা শহরে, নাসিরাবাদ ডিগ্রি কলেজ, নাসিরাবাদ হাইস্কুল, নাসিরাবাদ মাদ্রাসা ইত্যাদি। আজ বলা যায় ঐ নাসিরাবাদ থেকেই ময়মনসিংহ জেলা শহরের পত্তন। এরপরও আমাদের একটু পেছনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনেকরি। মোগল আমলে মোমেনশাহ নামে একজন সাধক ছিলেন। তাঁর নামেই মধ্যযুগে অঞ্চলটির নাম হয় মোমেনশাহী। তবে রাজা জমিদারদের এই ভূখন্ড-ব্রহ্মপুত্রের শহর ময়মনসিংহ নামটি যথেষ্ট পুরাতন। প্রাচীনকালে মৈনসিং নামে একজন রাজা বাস করতেন বলে জানা যায়। অনেকের মতে ঐ নাম থেকেই পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ নামের উৎপত্তি হতে পারে। এ বিষয়ে নানা

www.pathagar.com

মুনির নানামত। মধ্যযুগে এই অঞ্চল সরকার বাজুহা, রেনেল সাহেবের মানচিত্রে মৈমনসিংহ, তাই সিংহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, আর ময় শব্দের অর্থ সমগ্র। মোমেনশাহের আমলে সরকার বাজুহা নামে চলছিলো। তখন ময়মনসিংহ বিশাল এক ভূখন্ড। আবার বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলটি ভাটি বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিলো।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন "ময়মনসিংহ নামটি ঐতিহ্যবাহী। ইংরেজ আমলে জেলা শহর পত্তনের যুগে ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখায় ঐ বিকৃত মাইমেনসিংহ কথাটি ওঠে আসে। এতকাল ধরে ইংরেজদের ব্যবহৃত এই নামই চালু রয়েগেছে। অন্যনাম এখন আর ব্যবহার হয় না। তবে অনেকক্ষেত্রে আজও মোমেনশাহী কথাটি লেখা দেখা যায়। মুসলিম যুগের উৎস হিসেবে নাসিরাবাদ, নামটিও আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোথাও উল্লেখ করা হচ্ছে না"।

পন্ডিতগণের ধারণা পাঁচ হাজার বছর আগে এ দেশে নিগ্রোবটু জাতির বাস ছিলো। এদের পশুপালনসহ কৃষি কাজের কোন ধারণাই ছিলো না। শিকার আর ফলমুল খেয়েই ওরা ক্ষুধা তাড়াতো। বাঙালী সভ্যতার ঊষালগ্নের আগেই এই নিগ্রোবটু জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিলো এই ভূখন্ড। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আসাম উপত্যকা পার হয়ে আমাদের সমতল ভুমে প্রবেশ করে অস্ট্রিকরা। ওরা প্রবেশ করেই নিগ্রোবটুদের স্থান দখল করে নেয়। শুরুতেই অস্ট্রিক জাতি বসবাস করতো নদী তীরস্থ জায়গায়। তারা গড়ে তোলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা। এর পর ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে। ওরা বাঙালীর ধান, ভাত, মাছ, লাঙ্গল সব কিছু কেড়ে নেয়। ঝাড়ফুঁক, সাপের বিষ নামানো, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, কড়ি, গন্ডা, পণ ইত্যাদির ব্যবহার এই অস্ট্রিক গোষ্ঠির দান। এ জাতি নৃতত্ত্বের ভাষায় প্রোট্রো অস্ট্রেলয়েড বা আদি অস্ত্রাল বা ভেডিড নামে পরিচিত। প্রাক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠি সারা বাংলা জুড়ে থাকলেও সাঁওতাল, কোরা, মুন্ডা শরব, গারো, পাংখো ইত্যাদি জনজাতির দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশি লক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ধরা পড়েছে সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানবের সাথে অস্ট্রিকদের রক্তগ্রুপের অনেক মিল রয়েছে। দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহের আদিবাসীদের মধ্যে অস্ট্রিক নৃগোষ্ঠির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই নৃগোষ্ঠির মানুষ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। নৃতাত্ত্বিক এই বৈশিষ্ট্য ময়মনসিংহের গুরুত্বকে দিয়েছে ভিন্নতর মাত্রা। নৃতাত্ত্বিক ঐশ্বর্যমন্ডিত বৈশিষ্ট্যের জন্যে ময়মনসিংহ তাই সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

ইন্দো-মঙ্গোলীয় চীন-তিব্বত-বর্মীর লোকেরা তিব্বতে বসবাস করার সময় ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা অতিক্রম করে উত্তর পূর্বভারতে পাট ও কাপড়ের ব্যবসা করতো। নিজেদের তারা পরিচয় দিতো তি-বদ বা বোদ (Bodo) নামে। এই তি-বদ বা বদ থেকেই ইন্দো-মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠির একটি শাখার নাম বডো বা বোদো বা বড়ো। এরা ক্রমশ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর জনপদে তাদের অধিপত্য বিস্তার করে এবং একসময় সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পরে। "The Encyclopaedia of Bengal, Behar and Orissa "

www.pathagar.com

গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

'A third type, which in some respects intermediate between the two (Aryan and Dravidian) is found along the Northern and Eastern borders of Bengal. Its physical characteristics resemble Mongoloid.....All along the Eastern and Northern frontier of Bengal, we meet with a fringe of compact tribes of the short-headed type, who are beyond question Mongolian'.

মঙ্গোল নরগোষ্ঠীর শাখা বড়ো জনজাতি প্রাচীনকালে আর্য আগমনের পূর্বে গড়ে তুলেছিলো এক বিশাল রাজ্য। বর্তমান আসামের পূর্বসীমা থেকে বাংলাদেশ ভূখন্ডের করতোয়া নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত ছিল এই রাজ্যের বিস্তৃতি। পরবর্তী যুগে ইন্দো-মঙ্গোলীয় কিরাতজনের (কালিকাপুরাণ, অমরকোষ, যোগিনীতন্ত্র গ্রন্থে এরা ম্লেচ্ছ জাতি নামে পরিচিত) অন্যতম শাখা অহমদের সাথে এদের মিলন ঘটেছিলো। বড়ো অহমদের মিশ্রণে গড়ে ওঠা নৃগোষ্ঠির বিশাল ভূখন্ড কামরূপ রাজ্য। কামরূপের চারটি পীঠ বা ভাগ ছিলো-কামপীঠ, রত্নপীঠ, মনিপীঠ ও যোনীপীঠ। ইতিহাসবিদগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে কামরূপরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। রাজার নাম ছিলো নরক অসুর। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করেছিলেন। নরকের পুত্র ভগদত্ত কুরূপান্ডব যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন এবং অর্জুনের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন এবং কিরাতরা বিতাড়িত হয়েছিলেন। (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৮৩৮-১৮৬৮ সংকলিত "কামরূপ-শাসনাবলী")।

বড়ো ভাষা ভোট-চীনীয় বা তিব্বত-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। তিব্বত, নেপাল, আসাম ও উত্তরবঙ্গের প্রভাব রয়েছে এই ভাষার মধ্যে। তবে প্রান্ত উত্তরবঙ্গে এ ভাষার প্রভাব বেশ প্রবল। বড়ো ভাষায় বঙ্গ শব্দের অর্থ প্রশস্ত এবং লা বা লাও শব্দের অর্থ দীর্ঘ। সুতরাং অনেকের মতে বাংলা শব্দ প্রশস্ত এবং দীর্ঘ সমতলভূমি হিসেবে বড়ো ভাষা থেকে আগত। অবশ্য অস্ট্রিক ভাষাতেও বঙ্গ শব্দ রয়েছে। একইভাবে বড়ো ভাষায় ময় বা মায় শব্দে ধান বুঝায় এবং মৌনসিংহ বা মৌম্‌সিন শব্দে বুঝায় প্রচুর। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহ শব্দে সেই স্থানকে বুঝায় যেখানে প্রচুর ধান পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ এই নামকরণটি সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সত্যিকার অর্থেই তার সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ সমালোচকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়। 'A beautiful name is better than a lot of wealth' ময়মনসিংহ নামকরণটি তাই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট, হৃদয়কে দ্রবীভূত এবং সত্তাকে নিবিষ্ট করে। ময়মনসিংহ নামকরণের পিছনে যে ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে, সে সত্যটি আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

www.pathagar.com

জেলা স্থাপন ও সাধারণ প্রশাসন

ময়মনসিংহের সাধারণ-প্রশাসন একরৈখিক ছিলো না। নানা পথ ধরে ময়মনসিংহের সাধারণ-প্রশাসন অগ্রসর হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। সোজা কথায় এই দেওয়ানীকে রাজস্ব প্রশাসন হিসেবে অভিহিত করা যায়। সে সময় ময়মনসিংহ জেলা ছিলো অখন্ড। অর্থাৎ ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল নিয়ে গঠিত ছিলো। এই ছয়টি জেলা একই নিয়াবতের অন্তর্ভুক্ত ও আওতাধীন ছিলো। তখন ত্রিপুরা জেলা (বর্তমান কুমিল্লা) এবং ভুলুয়া (বর্তমান নোয়াখালী জেলা) ময়মনসিংহ জেলার অর্ন্তভূক্ত ছিলো। ত্রিপুরা ও নোয়াখালী ময়মনসিংহ থেকে পৃথক হয় ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে । মোঃ রেজা খান মুর্শিদাবাদের দেওয়ান এবং জশরত খান ঢাকার নায়েবে আজিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুরোনো প্রশাসনিক বিন্যাস ছিলো পাঁচ বছর মেয়াদী। ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ারে এ জেলার প্রশাসনিক এলাকার যে রদবদল হয়েছিলো তা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এফ.এ.সাকসি. কর্তৃক সংকলিত অংশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সংকলিত অংশ থেকেই জানা যায় যে, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এইচ, বারোজের অধীনে ময়মনসিংহ জেলার জন্যে আলাদা একটি কালেক্টরেট সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন এ জেলার প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো ঢাকা থেকে।

আগেই বলা হয়েছে যে, পুরোনো প্রশাসনিক বিন্যাস ছিলো পাঁচ বছর মেয়াদী। এখানে একটি কথা বলে নেয়া ভালো যে, বোর্ড অব রেভিন্যু ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে Superintendent পদ সৃষ্টি করে। এ পর্যায়ে ঢাকা বিভাগে পোস্টিং দেওয়া হয় রেজাখানের জায়গায় মিঃ মিডেলটনকে। মিঃ টন স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি সর্বোচ্চ জমিদারি ডাককারীদের অনুকুলে মহালগুলো লিজ দিয়ে ছিলেন। এদিকে লিজ প্রাপ্ত জমিদারগণ আবার সাব লিজ দিতে থাকলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। টন সাহেবের স্বাধীনতা এক পর্যায়ে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়। কোম্পানি যে পরিমান রাজস্ব বেঁধে দিয়েছিলো, সে পরিমাণ রাজস্বও আদায় করা গেলো না। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচনের জন্যে এদিকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কালেক্টরেটের সংখ্যা ৩৫ থেকে ২৩ এ কমিয়ে আনা হয়। উল্লেখ্য জন শোর বোর্ড অব রেভিন্যুর পক্ষে একটি রিপোর্ট দিয়ে ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে জন শোরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নেন। প্রস্তাব অনুসারে কালেক্টরগণ রাজস্ব আয়ের কমিশন নেয়ার ক্ষমতা পেয়ে যান। এই নতুন ব্যবস্থার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা একত্রিকরণ এবং দেওয়ানী মামলা বিচারের ক্ষমতাও কালেক্টরের উপর প্রদান করা। জন শোরের উল্লেখিত প্রস্তাব অনুসারে, সে সময়ে কালেক্টর রংটনের অধীনে ময়মনসিংহ ও ভুলুয়াকে একত্রিত করা হয়। তখন এ জেলার সীমানা ছিলো পশ্চিম দিকে বড়বাজুর সদর সিরাজগঞ্জ থেকে পূর্ব দিকে সিলেট এবং উত্তরে গারো পাহাড় থেকে দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলার প্রস্তাবিত থানাগুলির তালিকায় দেখা যায় যে, বড়বাজু, কাগমারী, জাফরশাহী, পুখুরিয়া এবং আলাপসিংহ সব সময়ই ময়মনসিংহের এবং সাবেক টাঙ্গাইল মহকুমাধীন আটিয়া পরগণা ঢাকার অংশ ছিলো।১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা জেলার সরাইল, হরিপুর, বেজরা এবং দাউদপুর পরগণাসমূহ একে একে যুক্ত হয়ে যায় ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে।

ইতঃ মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটলে একের পর এক ডাকাতি হতে থাকলে বোর্ড অব রেভিন্যু এ জেলাকে ভাগ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি কালেক্টরের দপ্তর ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ জেলার কেন্দ্রস্থলে সরিয়ে আনার পক্ষেও গভর্ণর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করেন। আর সেই সুপারিশের প্রেক্ষিতে ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ভুলুয়াকে ময়মনসিংহ থেকে পৃথক করা হয়। মিঃ রটনের পর মিঃ স্টিফেন বায়ার্ড ময়মনসিংহ কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকা থেকে অস্থায়ীভাবে বেগুনবাড়ীতে জেলা সদর দফতর স্থানান্তরিত করেদিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে জেলার সদর দফতর ময়মনসিংহে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে পাবনা থেকে সিরাজগঞ্জ থানাকে পৃথক করা হয়। সিরাজগঞ্জকে ময়মনসিংহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের সঙ্গে পাবনা যুক্ত করা হয়। পাশাপাশি দেওয়ানগঞ্জ পৃথক হয়ে যায় বগুড়া থেকে। ঢাকা থেকে আটিয়াকে পৃথক করে ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিরাজগঞ্জের আয়তন ৩০৬ বর্গমাইল, আটিয়ার আয়তন ২৩১ বর্গমাইল এবং দেওয়ানগঞ্জের আয়তন ২৬২ বর্গমাইল। উল্লেখিত এলাকাসমূহ ময়মনসিংহের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় জেলার আয়তন অনেকটা সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এ জেলার সীমানা বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় স্বাভাবিক ভাবেই। কর্নেল ম্যাকডোনাল্ড ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১ অক্টোবর তারিখে ১২১ নম্বর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জেলার সীমানা চিহ্নিত করার কাজটি সম্পন্ন করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম পাশে অবস্থিত যমুনার মূল প্রবাহকে বগুড়া, রংপুর ও পাবনা জেলার মধ্যবর্তী সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রংপুর এবং গোয়ালপাড়া (আসাম) একই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এলাকার বাইরে ছিলো গারো পাহাড় এলাকা। গোয়ালপাড়া এবং ময়মনসিংহের জমিদারগণ এ এলাকায় জমিদারি রেট অনুসারে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করতে থাকেন। জরিপকারীগণ রাজস্ব জরিপের সময় বেশ কিছু টিলাসহ গারো পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর সকল সমতল ভূমি ময়মনসিংহ জেলার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেন।

জামালপুর মহকুমা গঠিত হয় ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে। সিরাজগঞ্জ, হাজীপুর, পিঙ্গনা এবং শেরপুর থানা নিয়ে গঠন করা হয় জামালপুর মহকুমা। কিশোরগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। জামালপুর মহকুমার আয়তন ময়মনসিংহ জেলার আয়তনের দুই পঞ্চমাংশ। স্বাভাবিক ভাবেই কাজ বেড়ে যায় এই মহকুমায়। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও

www.pathagar.com

প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সে সময়ের সরকার ময়মনসিংহ জেলায় পাঁচটি মহকুমা গঠনের অনুমোদন দেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে টমাস পেকেনহাম যখন কালেক্টর ছিলেন, তখনই এ জেলার থানা সমূহ গঠন করা হয়।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় ১২টি এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ১৪টি থানা গঠন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে থানা সমূহের নাম ও এলাকা পরিবর্তন করতে দেখা যায়। যেমন ফতেহপুর নামকরণ করা হয় কেন্দুয়ার পরিবর্তে, পিঙ্গনার নামকরণ করা হয় গোপালপুরের পরিবর্তে এবং নিকলি নামকরণ করা হয় কিশোরগঞ্জের পরিবর্তে।

ময়মনসিংহ জেলার বিভক্তিকরণ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা এবং সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে বৃহৎ ময়মনসিংহ জেলাকে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ জেলাকে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত ও বিভাজন করা হয়। ময়মনসিংহ জেলা সদরের স্থান নির্বাচন সম্পর্কেও কথাটি বিশেষভাবে সত্য। 'The Encyclopedia of Bengal, Behar and orissa'-গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-'The Sanyasi outbreak necesstated a better Administrative organisation for the district. Mymensingh was made a separate Collectorate in 1786 but Dacca remained the head quarters. In 1787 the Board of revenue ordered the Collector of Bhulua to come and take Charage of Mymensingh, Mr, Wroughton set up this new district established by Mr, Bayard, the collector at the present site near the Village shehora, in September 1791.'

ময়মনসিংহ জেলা আয়তন ও জনসংখ্যায় অনেক বড়। সঙ্গতকারণেই এ জেলাকে বিভাজনের প্রস্তাবও করা হয় বিভিন্ন মহল থেকে বেশ ক'বার। কিন্তু, এই বিভাজনের প্রস্তাবসমূহ সকলক্ষেতেই বিজ্ঞান সম্মত, যৌক্তিক এবং বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল ছিলো না। জামালপুর ও টাঙ্গাইলকে নিয়ে এবং জামালপুরকে সদর দফতর করে একটি পৃথক জেলা সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব করেন সে সময়ের বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ প্রস্তাব দেন। তাঁর এই প্রস্তাব নিয়ে পরীক্ষা চলে। এক পর্যায়ে ময়মনসিংহকে জেলার সদর দফতর করে দু'টি জেলা গঠনের জন্যে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। টাঙ্গাইলকে জেলা সদর করে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইল ও জামালপুর নিয়ে একটি জেলা গঠনের খসড়া তৈরি করা হয়। কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি। প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বজায় রাখার ব্যাপারটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জেলাসমূহের পুনগঠনের লক্ষ্যে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। টাঙ্গাইল জেলার কাজ শুরু হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে থেকে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী গ্রহণের পর রাজস্ব (হুজুরী) এবং নিজামত অথবা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তাই পালন করেন। এদিকে, ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের নিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন নবাবের মুসলমান কর্মকর্তাগণ। রাজস্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো ঢাকায় একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রাদেশিক কাউন্সিল কাজ করে। এর পর জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় প্রতিটি জেলার কালেক্টরের উপর। ময়মনসিংহ জেলার জন্যে একজন জেলা জজ নিয়োগ করা হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। এ জেলার জন্যে প্রথম পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে। জানা যায় যে, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় দু'জন মুন্সিফ নিয়োগ করা হয়। বাজিতপুর, শেরপুর, সোনাকান্দা (ফুলপুর), নেত্রকোনা, শম্ভুগঞ্জ, আটিয়া এবং নিকলিতে মুন্সেফ নিয়োগ করা হয় একজন করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় ১৮ জন মুন্সেফ, দু'থেকে তিনজন অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জজ, চারজন সাব-অর্ডিনেট জজ নিয়োজিত ছিলেন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের মধ্যে টাঙ্গাইল সবার আগে মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হয়। তারপর জামালপুর মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত করার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার সকল মহকুমাই জেলায় উন্নীত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯-২-৮৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এস.আর.ও. ৭১ এল/৮৪/এম.ই.আর. (জেএ-১১)-২৪৬/৮৩-৯৭-এর মাধ্যমে জামালপুর থেকে শেরপুরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে, জামালপুর ও শেরপুর জেলার সৃষ্টি হয়। একই বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এস.আর.ও. ৩০এল/৮৪/এম.ই.আর.(জেএ-১১)-২৬৪/৮৩-৩৯ এর মাধ্যমে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলায় উন্নীত হয়। এভাবে দেশের এককালের বৃহত্তম জেলা ছয়টুকরো হয়ে যায়।

জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরও। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন তিনজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক (স্থানীয় সরকার) সহ বেশ ক'জন সহকারী কমিশনারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের পদবী ছিলো ডি. এম. বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সাধারণ প্রশাসন, রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যাস্ত।

জেলা প্রশাসনের অধঃস্তন প্রশাসন হচ্ছে উপজেলা প্রশাসন। এই প্রশাসনের প্রধান হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সহ অন্য কর্মকর্তাগণ। উল্লেখ্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসকের সমান পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং তিনি ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জেলা প্রশাসনেরও অংশ।

জেলা সৃষ্টির পর থেকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে কালেক্টর, ডি.এম. জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাঁদের নাম নিচে সন্নিবেশিত হলো। পাশাপাশি, জেলাপ্রশাসনকে গতিশীল করার জন্যে অন্য যে সব কর্মকর্তা বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলার কালেক্টরবৃন্দ (১৭৮৭-২০০৫)
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল (১৭৮৭-১৮৮৫)

নাম	পদবী	কার্যকাল
মিঃ ডব্লিউ. রটন	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১/৫-১৭৮৭-১৭৮৯
মিঃ স্টিফেন. বেয়ার্ড		১৭৯০ - ১৭৯৩
মিঃ এ. টাফটন	কালেক্টর	১৭৯৩ - ১৭৯৬
মিঃ লী. গ্রোস		১৭৯৬ - ১৮০৬
মিঃ জে. ল.		১৮০৬ - ১৮০৮
মিঃ ডি. বার্জ		১৮০৮ - ১৮০৯
মিঃ সি. থ্যাকার		১৮১০ -
মিঃ আর. মিটফোর্ড		১৮১১ - ১৮১৩
মিঃ থমাস. পাকেনহাম		১৮১৪ - ১৮১৭
মিঃ জেমস. ফ্রেজার		১৮১৭ - ১৮১৮
মিঃ এ. অগিলভি		১৮১৮ - ১৮১৯
মিঃ ডেভিড. স্কট		১৮১৯ - ১৮২০
মিঃ টি. ওয়াট		১৮২১ - ১৮২২
মিঃ ডব্লিউ. এইচ. বেইলি		১৮২৩ - ১৮২৩
মিঃ ডব্লিউ. পিটার		১৮২৩ -
মিঃ পি. লিন্ডসে		১৮২৪ - ১৮২৫
মিঃ জি. টি. কলিন্স		১৮২৫ - ১৮৩০
মিঃ সি. ব্যারী		১৮৩০ - ১৮৩০
মিঃ আর. ওয়াকার		১৮৩০ - ১৮৩৪
মিঃ ক্যারাথারস	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১৮৩৫ - ১৮৩৭
মিঃ ডি. প্রিঙ্গিল		১৮৩৭ - ১৮৩৭
মিঃ ই.ভি. ইরুইন	কালেক্টর	১৮৩৭ - ১৮৩৯
মিঃ জে.এম.হে		১৮৩৯ - ১৮৩৯
মিঃ এফ.স্কিপউইথ		১৮৩৯ - ১৮৪০
মিঃ হেনরি. এথারটন		১৮৪০ - ১৮৪০
মিঃ জে. আলেকজান্ডার		১৮৪০ - ১৮৪১
মিঃ এইচ. এথারটন		১৮৪১ -১৮৪১
মিঃ আর. এম. স্কিনার		১৮৪১ -১৮৪৪
মিঃ এইচ. ব্যারেসফোর্ড		১৮৪৫ -

www.pathagar.com

মিঃ জি. বি. উইলকিন্স		১৮৪৯ -
মিঃএইচ.বি.বেরেসফোর্ড ও এ. এবারক্রম্বি	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১৮৫০ -
মিঃ আর. স্টুয়ার্ট. ও মিঃ এ গ্রোট		১৮৫১ -
মিঃ আর. স্টুয়ার্ট. মিঃ আর. সি. রাইকস ও মিঃ এফ.বি. ক্যাম্প	কালেক্টর	১৮৫২ -
মিঃএফ.বি.ক্যাম্প ও মিঃআর. আলেকজান্ডার		১৮৫৩ - ১৮৫৪
মিঃই.এফ.রেডক্লীফ ও মিঃ বি.বি.এইচ.কুপার		১৮৫৫ -
মিঃ বি. এইছ. কুপার		১৮৫৬ -

বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যঃ

নাম	পদবী	কার্যকাল
মিঃ ভি.এইছ. স্কেলচ; মিঃ এইছ.জে. রেনল্ডস ও মিঃ ই. লেন্স	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১৮৫৭ -
মিঃ সি.ই. লেন্স; মিঃ সি.এইচ. ক্যাম্পবেল ও মিঃ ভি. এইচ. স্কেলচ		১৮৫৮ -
মিঃ সি.এইছ. ক্যাম্পবেল মিঃ টি. বি. ম্যাকলিয়র ও মিঃ জে.ওয়ার্ড	কালেক্টর	১৮৫৯ -
মিঃ জে.ওয়ার্ড ও মিঃ এ.এবার. ক্রম্বি		১৮৬০ -
মিঃ এ.ব্যার. ক্রম্বি মিঃ এইচ. বেভারিজ ও মিঃ এ.স্মিথ		১৮৬১ -
মিঃ এ.স্মিথ মিঃ এফ.বি.সিমসন; মিঃ ডব্লিউ. এইচ.হেলডারসন ও মিঃ এইচ.কেম্বেল		১৮৬২ -
মিঃ এ.স্মিথ মিঃ ডব্লিউ.এইচ. হেনডারসন ও মিঃ এ.টি. ম্যাকলিন		১৮৬৩ -
মিঃ এ.টি.ম্যাকলিন মিঃ ডব্লিউ.এইচ. হেলডারসন ও মিঃ সি. ডি. ফিল্ড		১৮৬৪ -
মিঃ ডব্লিউ.এইচ. হেন্ডারসন		১৮৬৫ -
মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস ও মিঃ	কালেক্টর	১৮৬৬ -

www.pathagar.com

এইট.বি. লফোর্ড	ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	
মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস		১৮৬৭ -
মিঃ জে.সি. প্রাইস; মিঃ এন.এস. আলেকজান্ডার ও মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস	কালেক্টর	১৮৬৮ -
মিঃ আর. পর্চ; এন.এস. আলেকজান্ডার; জে ও কিনলি ও এইচ.জে. রেনল্ডস		১৮৬৯ -
মিঃ জে ও কিনলি;এ.পি ম্যাকডোনাল ও মিঃ জি. গ্রাহাম		১৮৭০ -
মিঃ জি. গ্রাহাম; মিঃ আর.এইচ. পসি ও মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস		১৮৭১ -
মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস		১৮৭২ -
মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস ও মিঃ আর.এইচ. পসি		১৮৭৩ -
মিঃ আর.এইচ. পসি ও মিঃ এইচ.জে. রেনল্ডস		১৮৭৪ -
মিঃ আর.এইচ. পসি ও মিঃ এইচ.সি. সাদারল্যান্ড	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১৮৭৫ - ১৮৭৬
মিঃ আর.এইচ. পসি; মিঃ জে.প্লেট; জে.এ ব্রেটবারী ও মিঃ সি. এইচ. সাদারল্যান্ড		১৮৭৭ -
মিঃ আর.এইচ. পসি	কালেক্টর	১৮৭৮ -
মিঃ এন.এস. আলেকজান্ডার ও মিঃ আর.এইচ. পসি		১৮৭৯ -
মিঃ এন.এস. আলেকজান্ডার	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৮০ -
মিঃ জে.সি. প্রাইস; আর.এইচ. গ্রিভস ও সি. এফ.মেগ্রেট		১৮৮১ -
ামঃ আর.এইচ. গ্রিভস; মিঃ আর.এস. ওয়ালার; মিঃ আলেকজান্ডার ডব্লিউ; এইচ. এফ.গান ও মিঃ এইচ. সেভেজ	ও জজ কালেক্টর	১৮৮২ -
মিঃ আর.এস. ওয়ালার ও মিঃ জি. ই. মিনিস্ট		১৮৮৩ -

www.pathagar.com

মিঃ আর.এস. ওয়ালার ও মিঃ ই.জি. গ্লেজিয়ার		১৮৮৪ -
মিঃ ই.জি. গ্লেজিয়ার ও মিঃ এইচ. সেভেজ	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৮৫ -
মিঃ ই.জি. গ্লেজিয়ার		১৮৮৫-১০-০৪-১৮৮৬
মিঃ সি.আর. মেরেডিন	ও কালেক্টর	১১-০৩-৮৬ - ১১-১১-৮৬
মিঃ ই.জি. গ্লেজিয়া		১২-১১-৮৬ - ০৩-১০-৮৭
মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত		০৪-১০-৮৭ - ২২-০৩-৮৯
মিঃ এইচ.এফ.জে.টি. মেগুয়ার		২৩-০৩-৮৯ - ২৭-০৫-৮৯
মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত		২৫-০৫-৮৯ - ০৮-০৪-৯০
মিঃ বরদা চরণ মিত্র		০৯-০৪-৯০ - ১৫-০৪-৯০
মিঃ আর.আর. পোপ		১৬-০৪-৯০ - ২৩-০৬-৯০
মিঃ আশুতোস গুপ্ত		২৪-০৬-৯০ - ২০-০২-৯১
মিঃ এইচ.এ.ডি. ফিলিপস		২১-০২-৯১ - ১৯-০৭-৯২
মিঃ এল.পালিত		২০-০৭-৯২ - ০৪-০৯-৯২
মিঃ এইচ.এ.ডি. ফিলিপস		০৫-০৯-৯২ - ০১-০৩-৯৩
মিঃ এ. আরল	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট	০২-০৩-৯৩ - ০৪-০৪-৯৩
মিঃ সি.এ. রেডিসি		০৫-০৪-৯৪ - ০৪-০৬-৯৪
মিঃ এ. আরল	ও কালেক্টর	০৫-০৬-৯৪ - ০৯-০৮-৯৫
মিঃ জে.ই. ফিলিমোর		১০-০৮-৯৫ - ০৫-

www.pathagar.com

		১০-৯৫
মিঃ এ. আরল		০৬-১০-৯৫ - ০৭-০২-৯৬
মিঃ ই.বি. হেরিস		০৮-০২-৯৬ - ২০-০৪-৯৮
মিঃ এফ.আর. রো		২১-০৪-৯৮-০৫-০৪-১৯০০
মিঃ এম. বোনহাম কার্টার		০৬-০৪-০০- ০৩-০৫-১৯০১
মিঃ জে.এ. ইজিকেল		০৪-০৫-০১ - ০৭-০৮-০১
মিঃ এম. বোনহাম কার্টার		০৮-০৮-০১ - ০৪-১১-০২
মিঃ এইচ.টি. সেমন		০৫-১১-০২ - ১৫-০১-০৩
মিঃ জে.এ. ব্লেকউড		১৬-০১-০৩ - ২৩-০৪-০৩
মিঃ ডব্লিউ. বি. টমসন	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট	২৪-০৪-০৩ - ০৯-০৩-০৫
মিঃ মন্মথ কৃষ্ণ দেব		১০-০৩-০৫ - ০৯-০৪০৫
মিঃ ডব্লিউ. বি. টমসন	ও কালেক্টর	২৪-০৪-০৫ - ১২-১১-০৫
মিঃ এল.এ. ক্লার্ক		১৩-১১-১৯০৫ -
মিঃ জে.এ. ব্লেকউড	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১৭-০৮-১৯০৮ -
মিঃ জি.ই. লেমবার্ণ		১৫-০৭-১৯১০-
মিঃ এফ.সি. ফ্রেন্স	কালেক্টর	০৯-১০-১৯১২-
মিঃ সি.এ. রেডিস		০৭-১১-১৯১২-
মিঃ ডব্লিউ. বি. থমসন		০৫-০১-১৯১৩-
মিঃ জে. ল্যাংগ		০১-০৯-১৯১৪-
মিঃ জে. এ. উডহেড		১১-১২-১৯১৬-
মিঃ ডব্লিউ.এস. হককিন্স	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	------
মিঃ জে. আর. সি. ফ্রেন্স		২৮-০৪-১৯২৩-

www.pathagar.com

মিঃ জে. আর. ব্লেইয়ার	কালেক্টর	০৯-০৩-১৯২৩-
মিঃ গুরু সদয় দত্ত		১৬-১০-১৯২৯
মিঃ হ্যারাল্ড. গ্রাহাম		২০-১০-১৯৩০-
মিঃ টি.এম.দত্ত		০৪-০৪-১৯৩৩-
মিঃ কে.জি.মোর্শেদ		১৪-০১-১৯৩৬-
মিঃ জে.বি. কিন্ডার্সলে		২০-০৪-১৯৩৭-
মিঃ এ.এম. সি.ডি. ক্লার্ক		১০-০৮-১৯৪১-
মিঃ এ. হাগস	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ	১১-০৮-৪১ - ০৭-০১-৪২
মিঃ এস. ব্যানার্জী		০১-০২-৪২ - ০৬-১১-৪২
মিঃ ই.জি.ক্রীক	কালেক্টর	১৫-১১-৪২ - ২৪-১০-৪৪
মিঃ টি. বি. স্কট		২৫-১০-৪৪ - ১৫-০৪-৪৫
মিঃ টি.আই. এম. নুরুন্নবী চৌধুরী		১৬-০৪-৪৫ - ২০-১০-৪৬
মিঃ আর. ডব্লিউ.বাসটিন		২১-১২-৪৬ - ১৪-০৮-৪৭

পাকিস্তান শাসনামল (১৯৪৭-১৯৭১)ঃ

নাম	পদবী	কার্যকাল
জনাব আলী আসগর	কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও	১৭-০৮-১৯৪৭-২১-০৪-১৯৫০
জনাব এ. মজিদ		০৫-০৭-৫০ - ০৭-০৩-৫১
জনাব এম.এ. মজিদ	কালেক্টর	০৮-০৪-৫১ - ০৫-০৪-৫৪
জনাব ডি.কে. পাওয়ার		১৫-০৬-৫৪ - ০৪-০৪-৫৫
জনাব এস.এইচ. কোরেশী		১৩-০৮-৫৫ - ২৪-০১-৫৬
জনাব এস. করিম		০১-০৪-৫৬ - ২৫-১০-৫৭
জনাব কিউ. এস. রহমান		২৫-১০-৫৭ - ২৬-০৮-৫৮
জনাব এ.কে. এম. মুসা		২৬-০৮-৫৮ - ০৬-০৫-৬০
জনাব এস. এম. এ. কাজলী	ডেপুটি কমিশনার	০৬-০৫-৬০ - ১৪-০৭-৬১
জনাব কে. এম. এস. রহমান		১০-০১-৬২ - ২৩-০১-৬৪
জনাব পি. এ. নাজির		২৩-০১-৬৪ - ০৬-০১-৬৬
জনাব এম.এ. আনিসুজ্জামান		০৬-০১-৬৬ - ৩০-০৬-৬৭

www.pathagar.com

জনাব খোরশেদ আলম		১২-০৭-৬৭ - ১৫-০৮-৬৮
জনাব এম. মোকাম্মেল হক	ডেপুটি কমিশনার	১৫-০৮-৬৮ - ০৪-০৮-৬৯
জনাব এস. হাসান আহমেদ		০৪-০৮-৬৯ - ১২-০৭-৭১
জনাব এম. মুস্তাফিজুর রহমান		১৮-০৭-৭১ - ১৩-১২-৭১

বাংলাদেশ আমল (১৯৭১)ঃ

নাম	পদবী	কার্যকাল
জনাব এম. খসরুজ্জামান	জেলা প্রশাসকবৃন্দ	২২-১২-১৯৭১-২২-০৭-১৯৭২
জনাব এবি.এম. মোঃ আজিজুল ইসলাম		০৩-০৮-৭২ - ০৩-০৬-৭৪
জনাব এ.কে.এম. জালাল উদ্দিন		১৫-০৭-৭৪ - ২০-০৭-৭৫
জনাব এম. ফয়জুর রাজ্জাক		১৬-০৮-৭৫ - ২০-১০-৭৫
জনাব মোঃ রাফিউল করিম		২০-১০-৭৫ - ০১-০৬-৭৭
জনাব বদিউর রহমান		১০-০৬-৭৭ - ০৮-০৩-৭৮
জনাব এম. সাইফুল ইসলাম		১৫-০৩-৭৮ - ০৯-০৩-৭৯
জনাব জি.এম. মাওলা	জেলা প্রশাসকবৃন্দ	২১-০৩-৭৯ - ২৬-০৮-৮০
জনাব মোঃ আনসার আলী সিদ্দিকী		১৭-০৯-৮০ - ১৬-০৫-৮২
জনাব এম.এ. মান্নান		০১-০১-৮৬ - ০১-০৮-৮৭
জনাব ম. শফিউল আলম		০১-০৮-৮৭ - ০৭-০১-৯১
জনাব মোঃ আশরাফ		০৭-০১-৯১ - ০৯-০৫-৯২
জনাব এ.এফ.এম. মতিউর রহমান		০৯-০৫-৯২ - ২০-০৩-৯৫
জনাব মোঃ এনামুল কবির		২০-০৩-৯৫ - ১৮-১১-৯৬

নাম	পদবী	কার্যকাল
জনাব মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী, বীর বিক্রম	জেলা প্রশাসকবৃন্দ	১৮-১১-৯৬ - ১৭-০৫-৯৭
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম		২৭-০৫-৯৭-২৯-০৩-২০০১
জনাব মোঃ ময়েজ উদ্দিন খান		২৮-০৩-০১ - ৩১-০৭-০১
জনাব জাফর আহমেদ চৌধুরী		৩১-০৭-০১ - ১৭-১০-০২
জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম		১৭-১০-০২ - ০৩-১১-০৩
জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম		১৯-১১-০৩ - ১৭-০৭-০৪
জনাব মোঃ শাহ আলম বকশী		১৭-০৭-০৪ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

ক্রমিকনং	নাম	পদবী
১	জনাব প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাসেম তালুকদার	আতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
২	জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ	আতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)
৩	জনাব মোঃ রমজান আলী	আতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
৪	জনাব সাজ্জাদুল হাসান	আতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
৫	বেগম সায়েমা শাহীন সুলতানা	ভূমি আধিগ্রহণ কর্মমর্তা
৬	বেগম স্মৃতি কর্মকার	জেনারেল সার্টিফিকেট আফিসার

নং	নাম	পদবী
৭	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সিনিয়ার সহকারী কমিশনার
৮	জনাব হায়দার জাহান ফারাস	সিনিয়ার সহকারী কমিশনার
৯	বেগম রেহানা পারভীন	সিনিয়ার সহকারী কমিশনার
১০	বেগম ফেরদৌসী আখতার	সহকারী কমিশনার
১১	বেগম রোকসানা তারান্নুম	সহকারী কমিশনার
১২	জনাব অনুপম সাহা	সহকারী কমিশনার
১৩	বেগম লোৎফুন নাহার	সহকারী কমিশনার
১৪	বেগম সাবিনা ইয়াসমিন	সহকারী কমিশনার
১৫	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ তালুকদার	সহকারী কমিশনার
১৬	জনাব মন্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার	সহকারী কমিশনার
১৭	বেগম মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস	সহকারী কমিশনার
১৮	বেগম নাজনীন ওয়ারেস	সহকারী কমিশনার
১৯	জনাব রুবাইয়াৎ-ই-আশিক	সহকারী কমিশনার
২০	জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান	সহকারী কমিশনার
২১	জনাব আবু সাহেদ চৌধুরী	সহকারী কমিশনার
২২	জনাব মোঃ আবদুর রশীদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২৩	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা
২৯	জনাব মোঃ মহিদুল হক	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
৩০	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	সহকারী পরিচালক, বি.আর.টিএ.

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ সদর

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার অফিস কমপ্লেক্স জেলা শহরেই অবস্থিত। সঙ্গত কারণেই সদর উপজেলার আলাদা পটভূমি বর্ণনার অবকাশ নেই। সদর উপজেলায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১৩ টি। জেলা শহরের মধ্যে উপজেলা সদর অবস্থিত বলে সদর উপজেলায় ১ টি পৌরসভা রয়েছে। বলাই বাহুল্য এ পৌরসভার নাম ময়মনসিংহ পৌরসভা। সদর উপজেলার ইউনিয়নসমূহ হচ্ছে- অষ্টধার ইউনিয়ন, কুষ্টিয়া ইউনিয়ন, বোররচর ইউনিয়ন, পরানগঞ্জ ইউনিয়ন, সিরতা ইউনিয়ন, চরঈশ্বরদিয়া ইউনিয়ন, চরনিলখিয়া ইউনিয়ন, আকুয়া ইউনিয়ন, খাগডহর ইউনিয়ন, দাপুনিয়া ইউনিয়ন, ঘাগড় ইউনিয়ন, ভাবখালী ইউনিয়ন ও বয়রা ইউনিয়ন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ সদর থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	০১/০১/৮৩ থেকে ২৫/০৩/৮৪
২.	জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী	২৫/০৩/৮৪থেকে ২১/০৮/৮৫
৩.	জনাব এস.এম.মিজানুর রহমান	২১/০৮/৮৫ থেকে ০৬/১০/৮৭
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	০৬/১০/৮৭ থেকে ৩১/১২/৯০
৫.	জনাব ফজলে কবির	২৪/১১/৯১ থেকে ১৫/১১/৯২
৬.	জনাব সাইফুল ইসলাম	১৫/১১/৯২ থেকে ৩১/০১/৯৬
৭.	জনাব মো, আহমেদ হোসেইন	৩১/০১/৯৬ থেকে ২৬/১১/৯৬
৮.	বেগম তসলিম আরা বেগম	২৬/১১/৯৬ থেকে ০২/০৯/৯৭
৯.	বেগম আকতারি মমতাজ	০২/০৯/৯৭ থেকে ২৭/১০/৯৭
১০.	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন মোল্লা (ভঃ)	১৫/১০/৯৭ থেকে ২৭/১০/৯৭
১১.	মোছাঃ আনজুমনোয়ারা বেগম	২৭/১০/৯৭ থেকে ১৫/১০/০০
১২.	বেগম নাজনীন বেগম	১৫/১০/০০ থেকে ২৭/১২/০১
১৩.	ডঃ মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	২৭/১০/০১ থেকে ২৯-০১-০৫
১৪.	বেগম সায়েমা শাহীন সুলতানা	২৯-০১-০৫থেকে অদ্যাবধি।

ময়মনসিংহ সদর থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব জালাল আহাম্মদ	সার্কেল অফিসার (রাজস্ব)	১১/০৪/৮৩ – ২৭/১১/৮৩
২.	জনাব শামছুল আলম	উপজেলা রাজস্ব অফিসার (চলতি দায়িত্ব)	২৮/১১/৮৩ – ২২/০৩/৮৪
৩.	জনাব আব্দুল কাদির	উপজেলা রাজস্ব অফিসার	২৩/০৩/৮৪ –১৫/০৮/৮৭
৪.	জনাব মফিজ উদ্দিন তালুকদার	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৬/০৮/৮৭ – ২২/০৬/৮৮
৫.	জনাব আব্দুল খালেক	উপজেলা রাজস্ব অফিসার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২২/০৭/৮৮ – ০৮/১১/৮৯
৬.	জনাব মুর্ত্তেজুর	সহকারী কমিশনার	০৯/১১/৮৯ – ২৯/০৯/৯১

www.pathagar.com

	রহমান চৌধুরী	(ভূমি)	
৭.	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৩০/০৯/৯১ – ০৬/০৮/৯৪
৮.	জনাব মোঃ তাবুল ইসলাম প্রধান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৭/০৮/৯৪ – ০৩/০৯/৯৬
৯.	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৪/০৯/৯৬ – ১৫/০৭/৯৭
১০	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন মোগল	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৬/০৭/৯৭ – ২৬/০৪/৯৮
১১	বেগম সায়েমা শাহীন সুলতানা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৭/০৪/৯৮ – ০১/৮/২০০০
১২	জনাবমোঃ খলিলুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২/৮/২০০০ – ২৩/১/২০০২
১৩	ডঃ নাজমানারা খানুম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ছুটিকালীন সময়)	২৪/০১/০২ – ২০/০৩/০২
১৪	বেগম হোমায়রা বেগম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২১/০৩/০২ – ০২/০৫/০৩
১৫	ডঃ নাজমানারা খানুম	উপজেলা নির্বাহীঅফিসার (ছুটিকালীন সময়)	০৩/০৫/০৩ – ২২/০৯/০৩
১৬	মোহাম্মদ আতিকুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২৩/০৯/০৩ – ০২/১১/০৩
১৭	বেগম হোমায়রা বেগম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২১-০৩-০২ অদ্যাবধি।

এক নজরে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা ঃ

১। আয়তন ঃ ৩৮,১০০ বর্গ কিলোমিটার।

২। অবস্থান ঃ উত্তরে ফুলপুর ও গৌরীপুর উপজেলা এবং দক্ষিণে ফুলবাড়ীয়া ও ত্রিশাল উপজেলা পশ্চিমে মুক্তাগাছা ও জামালপুর সদর উপজেলা।

৩। পৌরসভা ঃ ১ টি।

www.pathagar.com

৪। ইউনিয়ন ঃ ১৩ টি ।

৫। গ্রাম ঃ ১৭৩ টি।

৬। জনসংখ্যা ঃমোট-৫,৬৬,৩৬৮(১৯৯১এর আদমশুমারী অনুযায়ী)

পুরুষ-২,৯৫,৫৩৪, মহিলা-২,৭০,৮৩৪।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২ টি
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬ টি
বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৮ টি
কমিউনিটি বিদ্যালয়	০৬ টি
স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	২৪ টি
এন. জি. ও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৮ টি
নার্সারী স্কুল	২৯ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৫ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬১ টি
মহাবিদ্যালয়	১৬ টি
আইন মহাবিদ্যালয়	০১ টি
মেডিক্যাল কলেজ	২ টি (১ টি সরকারি, ১ টি বেসরকারি)
হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ	০১ টি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	৩ টি (২টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি) সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ দু'টির মধ্যে ১ টি মহিলা।
পিটি আই	০৩ টি
ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১ টি
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	০১ টি
মূক ও বধির বিদ্যালয়	০১ টি
সঙ্গীত বিদ্যালয়	০১ টি
মৌলিক একাডেমি	০১ টি
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০১ টি
পাঠাগারের সংখ্যা	০২ টি
শিক্ষার হার	৬৯%

www.pathagar.com

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

আলীয়া মাদ্রাসা	০২ টি
দাখিল মাদ্রাসা	১৩ টি
হাফেজিয়া মাদ্রাসা	২৯ টি
খারিজিয়া মাদ্রাসা	২০ টি
এতিমখানা	০৫ টি
মসজিদ	৬১৪ টি
মন্দির	২২ টি
গীর্জা	০৩ টি

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ

সিনেমা হল	০৬ টি
পাবলিক হল	০১ টি
স্টেডিয়াম	০১ টি
যাদুঘর	০২ টি
ডাক বাংলো	০১ টি
রেস্ট হাউজ	০৪ টি
ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান	২৩ টি
পার্ক	০২ টি
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	০১ টি
এন.জি.ও.	১৫ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারি হাসপাতাল	০২ টি
বেসরকারি হাসপাতাল	০২ টি
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	নেই
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩ টি
পারিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০৭ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৫৭ টি
এল. এস. ডি. খাদ্যগুদাম	০১ টি
সি. এস. ডি. খাদ্যগুদাম	০১ টি

www.pathagar.com

মুক্তাগাছা উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার ঐতিহ্যবাহী এক উপজেলা মুক্তাগাছা। অনেক দিনের পুরোনো পৌরসভাও এই মুক্তাগাছা। মুক্তাগাছার নাম এলেই এসে যায় মুক্তাগাছার জমিদার ও মন্ডা প্রসঙ্গ। জমিদার আচার্য চৌধুরী বংশ মুক্তাগাছা শহরের গোড়াপত্তন করেন বলে জানা যায়। আচার্য চৌধুরী বংশ শহরের গোড়াপত্তন করে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। আচার্য চৌধুরী বংশের প্রথম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী ছিলেন বগুড়ার বাসিন্দা। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে রাজস্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন নবাবের খুবই আস্থাভাজন। নবাবের দরবারে রাজস্ব বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১১৩২ সালে তিনি সেই সময়ের আলাপসিং পরগণার বন্দোবস্ত্ম নিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে মুক্তাগাছা শহরসহ মুক্তাগাছা উপজেলার বেশির ভাগই ছিলো আলাপসিং পরগণার অন্তর্ভুক্ত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর ৪ ছেলে বগুড়া থেকে আলাপসিং পরগণায় এসে বস-বাসের জন্যে সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর এই ৪ ছেলে হচ্ছে- রামরাম, হররাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম। বসতি স্থাপনের আগে তাঁরা এ পরগণার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখেন এবং বর্তমান মুক্তাগাছা শহর এলাকায় বসতি স্থাপনের জন্যে মনস্থির করেন। সে সময়ে আলাপসিং পরগণায় খুব একটা জনবসতি ছিলো না। চারদিকে ছিলো অরণ্য আর জলাভূমি। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর ৪ ছেলে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী আয়মানের তীরবর্তী এক স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা যে স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে ছিলেন, সে স্থানটিকে এখনো পর্যন্ত রাজঘাট নামে ডাকা হয়।

নামকরণ ঃ

রাজঘাটে নৌকা ভিড়ানোর পরবর্তী সময়ে এলাকার অধিবাসীগণ সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী জমিদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী নজরানা দেন। সেই সময় উল্লেখিত স্থানটির নাম ছিলো বিনোদবাড়ী। বিনোদবাড়ীর বাসিন্দাগণ ছিলো প্রান্তিক চাষী ও জেলে। জমিদারদের যাঁরা নজরানা দিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর নিজের হাতে তৈরি একটি পিতলের গাছা বা ধীপাধার জমিদারদের নজরানা দেন জমিদারগণ নজরানা পেয়ে বিনোদবাড়ীর পরিবর্তে এ জায়গার নাম রাখেন মুক্তাগাছা। সেই থেকে মুক্তাগাছা নামকরণটি চলে আসছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুক্তারাম কর্মকার নামক এক ব্যক্তি দীপাধারটি জমিদারদের নজরানা দিয়েছিলেন। জমিদারগণ মুক্তারামের মুক্তা এবং এর সঙ্গে গাছা শব্দটি যোগ করে জায়গার নাম করণ করেন মুক্তাগাছা। যে কোনো বিবেচনাই মুক্তাগাছার এই নামকরণটি সার্থক এবং যথার্থ।

অবস্থানঃ

মুক্তাগাছা জেলা সদর থেকে খুব দূরে নয়। জেলা সদর থেকে ১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে এর অবস্থান। মুক্তাগাছার পূর্বে ফুলবাড়ীয়া উপজেলা ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলা, উত্তরে ময়মনসিংহের সদর উপজেলা ও শেরপুর জেলার নকলা এবং দক্ষিণে ফুলবাড়ীয়া উপজেলার অংশ বিশেষ।

www.pathagar.com

মুক্তাগাছা থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	১৫/০৯/৮৩ থেকে ১৫/০৯/৮৫
২.	জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী	১৫/০৯/৮৫থেকে ০৫/০৭/৮৮
৩.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	০৫/০৭/৮৮থেকে ১৬/০৭/৯০
৪.	জনাব অপরূপ চৌধুরী (ভারঃ)	১৭/০৭/৯০ থেকে ২৫/০৯/৯০
৫.	জনাব আবদুল ওহাব পাটোয়ারী	২৬/০৯/৯০ থেকে ০৫/০৯/৯১
৬.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম	০৫/০৯/৯১ থেকে ০১/০৪/৯৩
৭.	জনাব শফিক আহমেদ	০১/০৪/৯৩ থেকে ২০/০৩/৯৪
৮.	জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন	২০/০৩/৯৪ থেকে ১৫/০৬/৯৫
৯.	জনাব আমজাদ হোসেন বেপারী (ভারঃ)	১৫/০৬/৯৫ থেকে ১৯/০৬/৯৫
১০.	জনাব ফারুক আহমেদ	১৯/০৬/৯৫ থেকে ০৪/০৫/৯৮
১১.	বেগম নীলিমা আক্তার (ভারঃ)	০৪/০৫/৯৮থেকে ১৪/০৬/৯৮
১২.	জনাব মোঃ আমীর হোসেন	১৪/০৬/৯৮ থেকে ০২/০৪/০০
১৩.	জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন খান	০২/০৪/০০ থেকে ২৮/৬/০২
১৪.	জনাব মনোয়ার হোসেন আকন্দ	২৮/০৬/০২থেকে ০৬/০৪/০২
১৫.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক আলম	০৬/০৪/০২থেকে ৩০-১১-০৩
১৬.	জনাব মোঃ শুকুর আলী	৩০-১১-০৩ থেকে অদ্যাবধি

মুক্তাগাছা থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব হাসান জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২১/১১/৮৮ থেকে ০৯/১০/৯০
২.	জনাব অপরূপ চৌধুরী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১০/১০/৯০ থেকে ২০/১০/৯০
৩.	" খন্দকার শাকের আহাম্মদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২১/১০/৯০ থেকে ০৫/০১/৯২
৪.	জনাবা মাহবুবা হাসনাত	সহকারী কমিশনার	০৫/০১/৯২ থেকে

www.pathagar.com

	(ভারঃ)	(ভূমি)	০৪/০৩/৯২
৫.	জনাবখন্দকার শাকের আহাম্মদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৪/০৩/৯২ থেকে ০৮/১২/৯৩
৬.	মরন কুমার চক্রবর্তী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮/১২/৯৩ থেকে ১৮/১২/৯৪
৭.	জনাব ফরহাদ উদ্দিন (ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৮/১২/৯৪ থেকে ১৬/০২/৯৫
৮.	জনাব আমজাদ হুসেন বেপারী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৬/০২/৯৫ থেকে ৩১/১২/৯৬
৯.	জনাব ফারুক আহম্মেদ(ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৩১/১২/৯৬ থেকে ০৮/০১/৯৭
১০	জনাব মোঃ আঃ রউফ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮/০১/৯৭ থেকে ০৮/০৫/৯৭
১১	জনাব ফারুক আহম্মেদ(ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮/০৫/৯৭ থেকে০৮/০৬/৯৭
১২	জনাব হাবিবমোঃ হালিমুজ্জামান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮/০৬/৯৭ থেকে০৩/০৩/৯৮
১৩	জনাব ফারুক আহম্মেদ(ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৩/০৩/৯৮ থেকে১৮/০৩/৯৮
১৪	বেগম নীলিমা আখতার	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৮/০৩/৯৮ থেকে ১৪/০১/৯৯
১৫	জনাব মোঃ আমীর হোসেন (ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৪/০১/৯৯ থেকে ০৫/০৫/৯৯
১৬	জনাব মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৫/০৫/৯৯ থেকে ২৩/০১/০২
১৭	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন আকন্দ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৪/০১/০২ থেকে ০৬/০৪/০২
১৮	জনাব ফারুক আলম (ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৬/০৪/০২ থেকে১০/১০/০২
১৯	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১০/১০/০২ থেকে ০৮/০৬/০৪
২০	জনাব মোঃ শুকুর আলী (ভারঃ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৮/০৬/০৪ থেকে ২১/০৬/০৪
২১	বেগম নাহিদ সুলতানা মল্লিক	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২২/০৬/০৪ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। আয়তন	ঃ ৩১৩ বর্গ কিলোমিটার।
২। জনসংখ্যা	ঃ ৩,৮০,২৪০ জন (পুরুষ +মহিলা)।
৩। পৌরসভা	ঃ ০১ টি।
৪। ইউনিয়ন	ঃ ১০ টি।
৫। সাক্ষরতার হার	ঃ ৫৩%।
৬। ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ ১০ টি।
৭। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ঃ ১০ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

মহাবিদ্যালয় সরকারী	০১ টি
মহাবিদ্যালয় বেসরকারী	০৩ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৩ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৩ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০১ টি
বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩ টি
কামিল মাদ্রাসা	০১ টি
ফাজিল মাদ্রাসা	০৪ টি
আলিম মাদ্রাসা	০১ টি
দাখিল মাদ্রাসা	১৪ টি
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	০১ টি
আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১ টি

বিশেষ তথ্য ঃ মুক্তাগাছা থানা ১৯৮৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সরকারের নির্বাহী আদেশ বলে উপজেলায় উন্নীত হয়। আগেই বলা হয়েছে, মুক্তাগাছা পৌরসভা বেশ পুরোনো। এটি ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ মুক্তাগাছার উপর দিয়ে ময়মনসিংহ-জামালপুর ও ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল সড়ক চলে গেছে। মুক্তাগাছার সঙ্গে ইউনিয়নসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভালো। মুক্তাগাছায় ট্রেনে যোগাযোগের কোনো সুযোগ নেই। মুক্তাগাছার

পাকা রাস্তা পরিমাণ	ঃ ১০০ কিলোমিটার।
কাঁচা রাস্তা পরিমাণ	ঃ ৭৪২.১৫ কিলোমিটার।

নদ-নদী ঃ মুক্তাগাছার উল্লেখযোগ্য নদ-নদী সমূহ হচ্ছে-আয়মন, সুতিয়া, বানার। নদী পথে শিবপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

www.pathagar.com

মুক্তাগাছার মন্ডা ঃ মন্ডা নামের বিশেষ এক মিষ্টি মুক্তাগাছায় পাওয়া যায়। এর সুনাম রয়েছে দেশে বিদেশে। মন্ডার প্রতিষ্ঠাতা হলেন কেদারনাথ পালের পুত্র রমেন্দ্র নাথ পাল। মুক্তাগাছায় মন্ডার দোকান প্রতিষ্ঠা করেন কেদার নাথ পালের দাদা গোপাল চন্দ্র পাল।

অর্থকরী ফসলঃ মুক্তাগাছায় ধান, পাট, সরিষা ছাড়াও আনারস, কাগজি লেবু, বিভিন্ন ধরণের মুখীকচু জন্মায়। বিশেষ ভাবে যে তথ্যটি প্রকাশ করতে হয়, সেটি হচ্ছে একটি কাগজি লেবু গাছ থেকে বছরে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার পর্যন্ত্ম কাগজি লেবু পাওয়া যায়। মুক্তাগাছা ঘোগা ও দাওগাঁও ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে কাগজি লেবু এবং আনারস পাওয়া যায়। মুক্তাগাছায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে আনারস ও কাগজী লেবুর চাষ করা গেলে মুক্তাগাছার অর্থনীতিতে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অবশ্য এখনো মুক্তাগাছায় স্বল্প পরিসরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আনারস ও কাগজী লেবুর চাষ করা হয়।

দর্শণীয় স্থান ঃ

মুক্তাগাছা উপজেলায় বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মুক্তাগাছার জমিদার বাড়ি, কালিশাহ দেওয়ানের মাজার ও রসুলপুর জয়েনশাহী মাজার।

www.pathagar.com

ফুলবাড়ীয়া উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার একটি উপজেলার নাম ফুলবাড়ীয়া। এই ফুলবাড়ীয়া ছাড়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ী, ফুলচৌকি নামে প্রায় একশ গ্রাম রয়েছে। ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ী, ফুলচৌকি নামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রধরেই ফুলবাড়ীয়া নাম কি, কেন তা আমাদের জানতে হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ফুলবাড়ীয়া, ফুলবাড়ী, ফুলচৌকিগুলোকে অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ আধুনিক কালের ডাকবাংলো বলে মনে করেন। অনুমান করা হয়যে, ফুলবাগিচায় সজ্জিত বাড়ীগুলোতে রাজধানী থেকে রাজস্ব আদায়কারী রাজ প্রতিনিধিগণ অস্থায়ী বা সাময়িক ভাবে বসবাস করতেন। অন্যদিকে, রাজা বা রাজপুরুষ গণের শিকার, ভ্রমন বা বিনোদনের প্রয়োজনেও এগুলো নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লক্ষণ সেনের ভাওয়াল তাম্রলিপিতে অস্থায়ী শাসনকেন্দ্র বা স্কান্দাবার হিসেবে ফলগুগ্রাম ও সুবর্ণ গ্রামের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এর সঙ্গে ও ফুলবাড়ীয়ার সম্পর্ক থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ময়মনসিংহ জেলায় ফুলবাড়ীয়া উপজেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দাপুনিয়া উইনিয়নে ফুলবাড়ীয়া নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এতক্ষণের আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, ফুলবাড়ীয়া, নামকরণের পিছনে কোন প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাফর আহমেদ চৌধুরী 'ময়মনসিংহ' গ্রন্থে ফুলবাড়ীয়া উপজেলার নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'ফুলবাড়ীয়া এলাকায় এক সময় ফুলখড়ি নামে এক প্রকার লম্বা খড় জাতীয় বৃক্ষ জন্মাত। সেই ফুলখড়ি ঘাসের নাম থেকেই ফুলবাড়ীয়া নামের উৎপত্তি বলে কথিত আছে'। আমরা যুক্তিসঙ্গত কারণেই জাফর আহমেদ চৌধুরীর এ বক্তব্য মেনে নিতে পারছিনা।

ফুলবাড়ীয়া উপজেলার আয়তন ৩৯৯ বর্গকিলোমিটার। এ উপজেলায় ১৩ টি ইউনিয়ন রয়েছে। ফুলবাড়ীয়া উপজেলার উত্তরে ময়মনসিংহ সদর, দক্ষিণে ভালুকা ও টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলা, পূর্বে ত্রিশাল উপজেলা ও পশ্চিমে মুক্তাগাছা এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলা অবস্থিত।

www.pathagar.com

ফুলবাড়ীয়া থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী	২৬-০৬-৮৩থেকে৩০-০৭-৮৩
২.	জনাব মোঃ আকরাম আলী মৃধা	৩১-০৭-৮৩ থেকে২০-০১-৮৭
৩.	জনাব কাজী মোঃ আবুবকর(ভারঃ)	২৭-০১-৮৭ থেকে১৫-০৩-৮৭
৪.	জনাব মোঃ ফজলুল রহমান ভূইয়া	১৫-০৩-৮৭থেকে ৩১-০১-৯০
৫.	জনাব মোঃ আঃকঃমঃ সালামত উল্লাহ	৩১-০১-৯০ থেকে১৮-০৭-৯২
৬.	জনাব মোঃ বজলুল হক বিশ্বাস	১৮-০৭-৯২ থেকে০৫-১২-৯২
৭.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান(ভাঃপ্রাঃ)	০৫/১২/৯২ থেকে ২৪/০১/৯৩
৮.	জনাব মোঃ বজলুল হক বিশ্বাস	২৪/০১/৯৩ থেকে ১৫/০৮/৯৫
৯.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	১৫/০৮/৯৫থেকে ২৮/০৮/৯৫
১০.	জনাব এম.এ বাসার	২৮/০৮/৯৫থেকে ৩০/০৪/৯৭
১১.	জনাব মাহমুদুল হাসান খান	৩০/০৪/৯৭ থেকে ০৫/০২/০১
১২.	জনাব মোঃ আবদুল হামিদ	০৫-০২-০১ থেকে১৭-০১-০২
১৩.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	১৭-০১-০২থেকে ১০-১১-০৪
১৪.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	১০-১১-০৪ থেকে অদ্যাবধি

ফুলবাড়ীয়া থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব বিপুলানন্দ ঘোষাল	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০২-০৮-৮৮থেকে২৩-০৭-৯০
২.	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৩-০৭-৯০ থেকে২৫-০১-৯৩
৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভাঃ)	২৬-০১-৯৩থেকে২৬-০৯-৯৩
৪.	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৭-০৯-৯৩থেকে১৯-০৩-৯৪
৫.	জনাব এস.এম. আব্দুল খালেক	থানা রাজস্ব আফিসার	২৯-১২-৯৩থেকে১১-০৬-৯৬
৬.	জনাব মোঃ হারুন-	সহকারী	২২-০৬-৯৬থেকে০৭-০৯-৯৬

www.pathagar.com

	অর-রশিদ বিশ্বাস	কমিশনার (ভূমি)	
৭.	জনাব মেসবাহ্ উদ্দিন ভূঞা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৭-০৯-৯৬থেকে১১-০৫-৯৭
৮.	জনাব ফয়েজ আহমেদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১২-০৬-৯৭ থেকে২৪-০৭-০০
৯.	জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়া	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৪-০৮-০০ থেকে২৫-০২-০১
১০	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ	উপজেলানির্বাহি আফিসার (ভাঃ)	২৫-০২-০১ থেকে০৪-০৪-০১
১১	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৪-০৪-০১ থেকে ০১-১২-০১
১২	জনাব মোঃ আঃ হামিদ	সহকারী কমিশনার (ভাঃ)	০১-১২-০১ থেকে১৭-০১-০২
১৩	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলানির্বাহি আফিসার (ভারপাপ্ত)	১৭-০১-০২থেকে০৩-০৭-০৪
১৪	জনাব সাইফ উদ্দিন আহম্মদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৩-০৭-০৪ থেকে অধ্যাবধি

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন	ঃ ৩৯৯বর্গ কিলোমিটার।
২। মোট ইউনিয়ন	ঃ ১৩ টি।
৩। পৌরসভা	ঃ ১ টি।
৪। গ্রাম	ঃ ১৪০ টি।
৫। জনসংখ্যা অনুযায়ী)।	ঃ ৩,৪৫,২৮৩ জন(৯১এর আদমশুমারী
(ক) পুরুষ	ঃ ১,৭৫,৩১২ জন।
(খ) মহিলা	ঃ ১,৬৯,১৭১ জন।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	ঃ ১.৫৮%।
শিক্ষিতের হার মোট	ঃ ৬৫.১২%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ

ডিগ্রি কলেজ	০১ টি
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	০৪ টি

www.pathagar.com

উচ্চ বিদ্যালয়	৪০ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	২২ টি
মাদ্রাসা	৫০ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬২ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারী হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারী হাসপাতাল	নেই
উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	০৪ টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	০৯ টি
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	১৮ টি
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১০৪ টি

হাট/বাজার সংক্রান্ত ঃ

মোট হাট/বাজার	ঃ ৩৯ টি।
ইউনিয়ন ভূমিঅফিস	ঃ ১৩ টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

মোট রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৬৪৫ কিঃ মিঃ।
পাকা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৪৭ কিঃ মিঃ।
কাঁচা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৫৯৮ কিঃ মিঃ।

www.pathagar.com

ত্রিশাল উপজেলা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত ত্রিশাল উপজেলার নাম অনেক দূরের মানুষের কাছেও পরিচিত। ত্রিশালে অনেক বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। সাহিত্যিক-সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী আবুল মনসুর আহমদ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ডেইলিস্টার সম্পাদক মরহুম আবুল মনসুর আহমদের পুত্র মাহফুজ আনাম এই ত্রিশালের সন্তান।

নামকরণ ঃ

ত্রিশালের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, অতীতে বিশাল আকৃতির তিনটি শাল বৃক্ষ ছিলো। এই তিনটি শাল গাছের নাম অনুসারেই ত্রিশালের নামকরণ হয়েছে। এই নামকরণ নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে। ত্রিশাল উপজেলার বৈলর ইউনিয়নের বাসিন্দা মরহুম ঈমান আলী, সাহিত্য রত্নের দিনপঞ্জি মারফত আমরা জানতে পেরেছি যে, অত্র এলাকা জনবসতি পূর্ণ হওয়ার আগে ত্রিশূলধারী ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে সমাজগঠিত

www.pathagar.com

হয়েছিলো। এই ত্রিশূলধারী ব্যক্তির শিষ্যগণ পরবর্তী সময়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই ত্রিশূল থেকেই ত্রিশালের নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

অবস্থানঃ

এই মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে যে, প্রথমে যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা এলাকার গভীর অরণ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ৩০জন। হিংস্র জীব-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁরা বাড়ির চারদিকে উচুঁ দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। এই উচুঁ দেয়ালকে বলা হতো 'আল'। আস্তে আস্তে অন্য বসতি স্থাপনকারীদের কাছে দেয়ালধারী বসতি স্থাপনকারীগণ গুরুত্ব লাভ করে। নতুন বসতি স্থাপনকারীগণ তাদেরকে ত্রিশ আলের লোক বলে সম্মান প্রদর্শন করতো। আর এভাবেই তিরিশ আল থেকেই ত্রিশাল নামের উৎপত্তি ঘটে।

ত্রিশাল থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব এ.কে.এম. আবুল আহসান	২৫/০৭/৮৩ থেকে ২০/০৮/৮৬
২.	জনাব এম.এ রাজ্জাক	০৫/০৭/৮৬ থেকে ১৫/০২/৮৯
৩.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	০৫/০২/৮৯ থেকে ১৫/০৮/৯১
৪.	জনাব এ.জেড.এম রফিকুর রহমান	১৫/০৮/৯১ থেকে ০৫/০৯/৯৪
৫.	জনাব ফারুক আহমেদ	০৫/০৯/৯৪ থেকে ১১/০৯/৯৪
৬.	জনাবএ.এইচ.এম তৌহিদুল ইসলাম	১১/০৯/৯৪ থেকে ২৭/০৪/৯৬
৭.	জনাব সুনীল চন্দ্র চৌধুরী	২৭/০৪/৯৬ থেকে ১৩/০৮/৯৭
৮.	জনাব মোঃ সারওয়ার খান	১৪/০৮/৯৭থেকে ১৫/০২/৯৯
৯.	জনাব মুহম্মদ হোসেন খান	২৫/০১/৯৯ থেকে ১৫/০২/৯৯
১০.	বেগম হোসনে আরা বেগম	১৫/০২/৯৯ থেকে ২১/০৯/০০
১১.	জনাব মীর আলী রেজা	২২/০৯/০০ থেকে২৬-০৫-০৩
১২.	জনাব মোঃ আতাহার আলী	২৬-০৫-০৩ থেকে অদ্যাবধি।

ত্রিশাল থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব জগদীশ রায়	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২২-০৭-৮৯ থেকে০৭-০৫-৯০

www.pathagar.com

২.	বেগম ছামেনা বেগম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপাপ্ত)	০৮-০৫-৯০ থেকে২৩-০৫-৯০
৩.	জনাব জ্যোতির্ময় দত্ত	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৪-০৫-৯০থেকে১৩-০৯-৯২
৪.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপাপ্ত)	১৪-০৯-৯২থেকে১১-১০-৯২
৫.	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১২-১০-৯২থেকে২০-০১-৯৪
৬.	জনাব এ.জেড.এম. রফিকুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপাপ্ত)	২১-০১-৯৪থেকে১৭-০২-৯৪
৭.	জনাব ফারুক আহমেদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৮-০২-৯৪থেকে০১-১০-৯৬
৮.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৬-০৯-৯৬থেকে১২-০২-৯৮
৯.	জনাব মোঃ সারওয়ার খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপাপ্ত)	১২-০২-৯৮থেকে২৭-০৪-৯৮
১০	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২২-০৪-৯৮থেকে৩০-০১-০১
১১	জনাব মীর আলী রেজা	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপাপ্ত)	০১-০২-০১থেকে১২-০৪-০১
১২	বেগম নাসরীজ আফরোজ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৩-০৪-০১থেকে৩০-০৮-০১
১৩	জনাব সৈয়দ নওসীন পর্নিনী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০২-০৮-০১থেকে২০-০১-০২
১৪	জনাব মীর আলী রেজা	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	২১-০১-০২থেকে১৭-১১-০২
১৫	জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৪-১০-০২থেকে০৮-০৬-০৪
১৬	জনাব মোঃ আতাহার আলী	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৯-০৬-০৪থেকে১৮-০৭-০৪
১৭	জনাব আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৭-০৭-০৪থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। আয়তন	ঃ ৩৩৮.৭৩ বর্গ কিলোমিটার।
২। লোকসংখ্যা	ঃ ৩,৭৩,৩৫৭ জন (পুরুষ +মহিলা)।
৩। পৌরসভা	ঃ ০১ টি।
৪। ইউনিয়ন	ঃ ১২ টি
৫। সাক্ষরতার হার	ঃ ৫২%।
৬। গ্রামের সংখ্যা	ঃ ১৪৮টি।
৭। মৌজা সংখ্যা	ঃ ৮৯টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

মোট রাস্ত্মা	ঃ ৯৪৭ কিলোমিটার।
পাঁকা রাস্তা	ঃ ৫৫ কিলোমিটার।
আধা পাঁকা রাস্তা	ঃ ১০ কিলোমিটার।
কাঁচা রাস্তা	ঃ ৮৮২ কিলোমিটার।

শিল্প-কারখানাঃ

কুটির শিল্প	ঃ ২০০ টি।
অন্যান্য শিল্প	ঃ ২০০ টি।
মোট জনসংখ্যা	ঃ ৩,৩৬,৭৯৭জন(৯১সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) পুরুষ ঃ ১,৭১,৬৬৪জন। মহিলা ঃ ১,৬৫,১৩৩জন।
হাট-বাজারের সংখ্যা	ঃ ৩১ টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	ঃ ১২ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

মহাবিদ্যালয়	০২ টি
মহিলা মহাবিদ্যালয়	০১ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৭ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৩ টি
মাদ্রাসা	৩৯ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০ টি
বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০ টি
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৩ টি

www.pathagar.com

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারী হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারী হাসপাতাল	নেই
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪ টি
মিশনারী হাসপাতাল	নেই
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	১১ টি
পশু হাসপাতাল	০১ টি
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১১ টি
পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪ টি

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

মসজিদ	৬৭৬ টি
মন্দির	২০ টি
গোরস্থান	০৫ টি
শ্মশান	০৪ টি

ভৌগলিক অবস্থান ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ত্রিশালে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। পার্শ্ববর্তী, ভালুকা উপজেলায় শিল্প বিকাশের সূত্রধরে ত্রিশালেরও শিল্পক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

www.pathagar.com

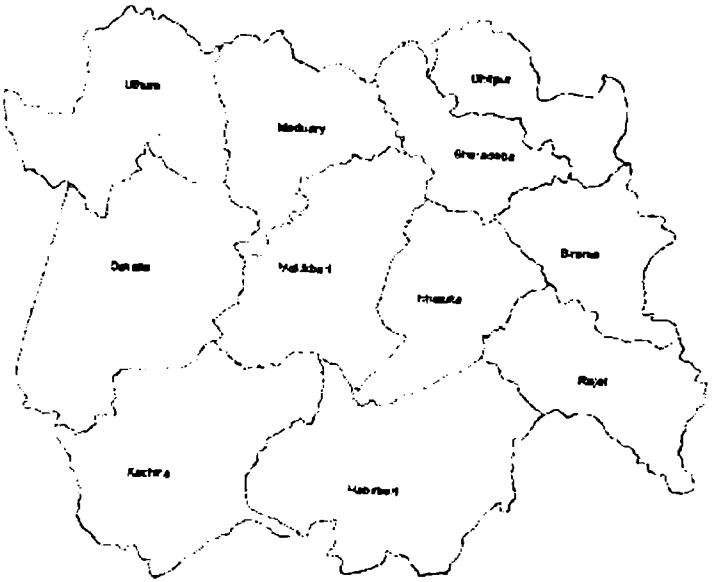

ভালুকা উপজেলা

সাধারণ পরিচিতিঃ

ময়মনসিংহ জেলার একমাত্র শিল্পসম্ভাবনাময় ও বনাঞ্চল সমৃদ্ধ উপজেলা ভালুকা। ভালুকা উপজেলা বৃহত্তর ময়মনসিংহের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। এককালের পশ্চাৎপদ উপজেলা। বর্তমান সময়ে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। ইতঃমধ্যেই অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ভালুকা উপজেলায়। আস্তে আস্তে শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ হচ্ছে উপজেলাটি। বিপুল বনজ সম্পদের অধিকারী ভালুকা শিল্প ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ময়মনসিংহ জেলার জন্যে অনিঃশেষ অনুপ্রেরণার উৎস।

নামকরণ ঃ

মূলতঃ ভালুকা গ্রাম ও ভালুকা বাজারকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী সময়ে ভালুকা থানা ও ভালুকা উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। ভালুকা নাম করণ বিষয়ে বেশ কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। এই জনশ্রুতি গুলোর মধ্যে তিনটি জনশ্রুতিই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি জনশ্রুতির একটি হলো বৃটিশ শাসন যখন বাংলাদেশে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নীলকর সাহেবগণ তাঁদের নিজস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় নীলকুঠি স্থাপন করেন। নীলকুঠি স্থাপনের পর

www.pathagar.com

নীলকর সাহেবগণ মাঝে মধ্যে শিকার করতে বের হতেন। শিকার করতে বের হয়ে নীলকর সাহেবগণ বনে-জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক দেখতে পেতেন। আর এ কারণেই নীলকর সাহেবদের কাছে এই এলাকা ভল্লুক এলাকা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ভল্লুক এর অপভ্রংশ হিসেবে উৎপত্তি ঘটে ভালুকা নামের।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি হচ্ছে -বর্তমান ভালুকা বাজারের দু'টি অংশ রয়েছে। এর একটি হচ্ছে পূর্ব অংশ, অন্যটি হচ্ছে পশ্চিমাংশ। পূর্ববাজারসহ গোটা ভালুকাই ছিলো ভাওয়াল পরগণার অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য ভালুকার পশ্চিম বাজার ছিলো মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজ শশীকান্তের জমিদারির আওতাভূক্ত। সেখানে জঙ্গলের ভেতর একটি মাজার ছিলো। এর খাদেম ছিলেন ওয়াহেদ আলী ফকিরের পিতা ইন্নত ফকির। মরহুম খান সাহেব আবদুল্লাহ চৌধুরীর নির্দেশে তাঁর সমসাময়িক বেশ ক'জন বিশ্বস্তলোক মনসুর আলী খান, জয়েদ আলী ও জয়েদখানের সহযোগিতায় ভালুকা বাজার সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাজারে একটি কাচারী ঘর ছিলো। সেখানে ভাওয়াল রাজার নামে খাজনা আদায় করা হতো। ভাওয়ালের কাচারীর নাম হয়ে ছিলো ভাওয়ালের নাম অনুসারেই। পরবর্তী সময় বাজারসহ গ্রামের নামকরণ হয় ভালুকা। ১৯১৭ সালে গফরগাঁও থানাকে বিভক্ত করে ভালুকা থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জনশ্রুতিটি হচ্ছে ভালুকা চাঁদ মন্ডল ছিলেন আদিবাসী কোচ বংশের সর্দার। উথুরা ইউনিয়নে ও বর্তমান ডাকাতিয়া অঞ্চলে কোচ বংশের লোকজনের অধিবাস এখনো রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমানে কোচ বংশের লোকজন বর্মণ পদবী ধারণ করেছে।

www.pathagar.com

ভালুকা থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব ইউছুফ জাহাঙ্গীর শিকদার	০১-০৮-৮৩ থেকে ০৭-০১-৮৭
২.	জনাব মোঃ ইমদাদুল হক (ভাঃ)	০৮-০১-৮৭ থেকে ০২-০৩-৮৭
৩.	জনাব গোলাম নবী	০৩-০৩-৮৭থেকে ২৩-০৮-৮৭
৪.	জনাব শরীফ নাফে আল সাবের	২৪-০৮-৮৭ থেকে ১৮-০৬-৯১
৫.	জনাব মোজাম্মেল হক খান	১৯-০৬-৯১ থেকে ১৮-০৪-৯৩
৬.	জনাব মোঃ বারেক উল্লাহ খান	১৮-০৪-৯৩ থেকে ২৭-০৪-৯৬
৭.	জনাব মোঃ ফজলুল বারী (ভাঃ)	২৭-০৪-৯৬ থেকে ০৬-০৫-৯৬
৮.	জনাব মোঃ লোকমান আহমেদ	০৬-০৫-৯৬ থেকে ১০-১০-৯৬
৯.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	১০-১০-৯৬ থেকে ০৪-০৮-৯৮
১০.	জনাব গাজী মোঃ জুলহাস	০৪-০৮-৯৮ থেকে ৩০-০৯-৯৯
১১.	জনাব খলিল আহমেদ (ভাঃ)	৩০-০৯-৯৯ থেকে ০৫-১০-৯৯
১২.	জনাব শরফুদ্দিন খান জিলানী	০৫-১০-৯৯ থেকে ২১-০৩-০০
১৩.	বেগম হোসনে আরা বেগম (ভাঃ)	২২-০৩-০০ থেকে ১০-০৪-০০
১৪.	জনাব শরফুদ্দিন খান জিলানী	১১-০৪-০০ থেকে ০৮-০২-০১
১৫.	জনাব সোহেলুর রহমান চৌধুরী (ভাঃ)	০৯-০২-০১ থেকে ০৩-০৩-০১
১৬.	জনাব এম.এ. মতিন	০৪-০৩-০১ থেকে ২৩-০৩-০২
১৭.	জনাব শেখ আলমগীর হোসেন	২৪-০৩-০২ থেকে ০২-০৫-০৪
১৮.	জনাব নন্দদুলাল বণিক	০২-০৫-০৪ থেকে অদ্যবধি।

ভালুকা থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৯-০৪-৮৮থেকে ০৪-১০-৯০
২.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৫-১০-৯০ থেকে২৫-১০-৯০
৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৬-১০-৯০ থেকে০৬-০২-৯৩
৪.	জনাব মোজাম্মেল হক খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	০৭-০২-৯৩ থেকে১৮-০৪-৯৩
৫.	জনাব মোঃ বারেক উল্ল্যাহ খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	১৯-০৪-৯৩ থেকে০২-০৫-৯৩
৬.	জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন মাহমুদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৩-০৫-৯৩থেকে ২৩-১১-৯৪

www.pathagar.com

৭.	জনাব মোঃ বারেক উল্ল্যাহ খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	২৪-১১-৯৪ থেকে১৩-০২-৯৫
৮.	জনাব মোঃ ফজলুল বারী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৪-০২-৯৫ থেকে১৩-১০-৯৭
৯.	জনাব খলিল আহমদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৪-১০-৯৭ থেকে২২-০৩-০০
১০	মিসেস হোসনে আরা বেগম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	২৩-০৩-০০ থেকে০৫-০৪-০০
১১	জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৬-০৪-০০ থেকে০৪-১২-০১
১২	জনাব এম.এ. মতিন	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	০৫-১২-০১ থেকে২৩-০৩-০২
১৩	জনাব শেখ আলমগীর হোসেন	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৩-০৩-০২ থেকে২৯-০৪-০২
১৪	জনাব মোঃ সানোয়ার জাহান ভূইয়া	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৯-০৪-০২ থেকে২০-০৮-০২
১৫	জনাব মোঃ শেখাবুর রহমান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২১-০৮-০২ থেকে২৫-১০-০৩
১৬	জনাবশেখ আলমগীর হোসেন	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	২৬-১০-০৩ থেকে১৮-১১-০৩
১৭	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ভূঞা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৯-১১-০৩ থেকে৩১-০৫-০৪
১৮	জনাব নন্দ দুলাল বণিক	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	৩১-০৫-০৪ থেকে২৭-০৬-০৪
১৯	জনাব মোঃ আকতার হোসেন আজাদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৭-০৬-০৪ থেকে অদ্যাবদি

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন	ঃ ৪৪৩বর্গ কিলোমিটার।
২। মোট ইউনিয়ন	ঃ ১১ টি।
৩। পৌরসভা	ঃ ০১ টি।
৪। মৌজার সংখ্যা	ঃ ৮৭ টি।
৫। গ্রামের সংখ্যা	ঃ ১০২ টি।
৬। জনসংখ্যা	ঃ ৩,০৮,৬০০ জন।
৭। সাক্ষরতার হার	ঃ ৫১.২ শতাংশ।

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ

ডিগ্রি কলেজ বেসরকারী	০২ টি
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বেসরকারী	০৩ টি
উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী	০১ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারী	০৮ টি
মাদ্রাসা	১৯ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৪ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩ টি
কমিউনিটি	২৫ টি
মাদ্রাসা উচ্চতর বেসরকারী	৩৮ টি
মাদ্রাসা এবতেদায়ি বেসরকারী	৫৫ টি

হাট-বাজারের সংখ্যা ঃ ৩৬ টি।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ১১ টি।

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারি হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারি হাসপাতাল	০২ টি
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪ টি
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি
ওষুধ কোম্পানি	০১ টি

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

মসজিদ	৬৩৯ টি
মন্দির	২৮ টি
আশ্রয়ণ প্রকল্প	০৩ টি

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

হাইওয়ে রাস্তা	ঃ ২২ কিঃ মিঃ।
ফিডার রোড(এ)	ঃ ৬০ কিঃ মিঃ।
ফিডার রোড(বি)	ঃ ৪০ কিঃ মিঃ।
কাঁচা রাস্ত্মা	ঃ ২৩ কিঃ মিঃ।

উপজেলায়/ তার সীমান্তে বহমান নদী/ শাখা নদী সমূহের নামঃ

নেউড়া নদী, মেদুয়ারী নদী, সুতিয়া নদী, লাউতী নদী, খিরু নদী।

উপজেলার প্রধান প্রধান কৃষি উৎপাদন ঃ ধান, পাট, ইক্ষু, কলা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

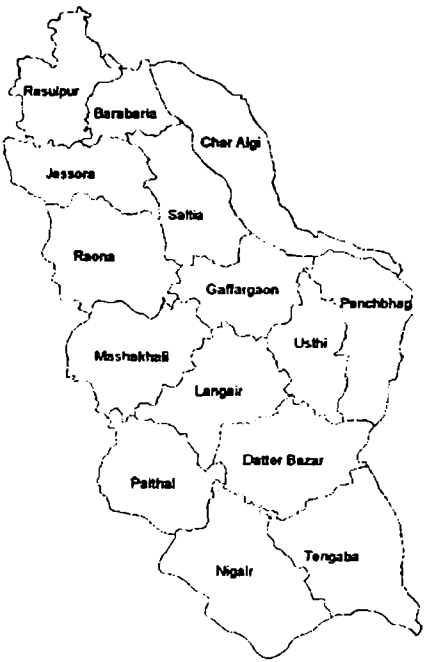

গফরগাঁও

ময়মনসিংহ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হচ্ছে গফরগাঁও। ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে ৪৮ কিঃমিঃ দক্ষিণে এর অবস্থান। নানা দিক থেকে এ উপজেলা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জনসংখ্যার দিক থেকেও এ উপজেলা বর্ধিষ্ণু। প্রায় ৫ লক্ষাধিক লোকের অধিবাস এখানে।

নামকরণ ঃ গফরগাঁও উপজেলার নামকরণ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শেরশাহের রাজত্বকালে গাফফার খান নামক তাঁর এক অনুচর ভাওয়াল পরগণার উত্তরাংশে অর্থাৎ রণ ভাওয়ালের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরের এ অঞ্চলে শাসনকার্যের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এলাকায় বস-বাস করতেন বলে তাঁর নাম অনুসারেই গফরগাঁওয়ের নামকরণ করা হয়েছিলো। তবে এর সমর্থনে দালিলিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারো মতে গফুর শাহ নামক জনৈক কামেল দরবেশের নামে গফরগাঁও এর নামকরণ হয়।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে গফরগাঁও থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। জানা যায় যে, ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১মে জেলা স্থাপনের পর ময়মনসিংহ জেলায় প্রতিটি পরগণায় একটি করে

www.pathagar.com

থানা স্থাপনের প্রয়োজণীয়তা অনুভব করেন জেলার কালেক্টর মিঃ বেয়ার্ড। এ লক্ষ্যে যুক্তি ও কার্যকারিতা উল্লেখ করে রেভিনিউ বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করেন জেলার কালেক্টর মিঃ বেয়ার্ড।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে জামালপুরে মহকুমা স্থাপনের সময় ময়মনসিংহ জেলার ১৪টি থানার বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে গফরগাঁও একটি। ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে জানা যায় যে, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুলিশ এ্যাক্ট প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত পাইক-বরকন্দাজগণই কনষ্টবলের ভূমিকায় অবতীর্ন হতো।

ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীর ঘেঁষে গফরগাঁও মৌজাতে প্রথম থানা স্থাপিত হয়েছিলো। এই থানা ছিলো ময়মনসিংহ টোক সড়কের পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীর ঘেঁষে। সড়কটির পশ্চিম পাশে ছিলো হাজতখানা, ব্যারাক এবং ঘোড়ার আস্তাবল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান স্থান সালটিয়া ইউনিয়নের শিলাসী মৌজায় স্থানান্তর করা হয়। এর আগে এটি ছিলো গফরগাঁও ইউনিয়নের পাঁচপাই মৌজা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেলস্টেশন ও ডাকঘরের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই থানা স্থানান্তরিত হয়েছিলো। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ৭ নভেম্বর গফরগাঁও থানা উপজেলায় উন্নীত হয়।

অবস্থান ঃ গফরগাঁও উপজেলার উত্তরে ত্রিশালের অবস্থান, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার অবস্থান দক্ষিণে, জেলার নান্দাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার অবস্থান গফরগাঁওয়ের পূর্বে, এবং পশ্চিমে ভালুকা ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলার অবস্থান।

গফরগাঁও থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ আবুল কাশেম	৩১/০৮/৮২ থেকে ২২/০২/৮৪
২.	জনাব দেওয়ান জাকির হোসাইন	২২/০২/৮৪ থেকে ১৭/০৭/৮৫
৩.	জনাব সায়ফুল আলম	২১/০৭/৮৫ থেকে ১০/০৯/৮৬
৪.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	১১/০৯/৮৬ থেকে ১৭/০১/৮৭
৫.	জনাব মো ঃ মজিবুর রহমান মিয়া	১৮/০১/৮৭ থেকে ০৩/০৯/৮৯
৬.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল মোমেন	০৩/০৯/৮৯ থেকে ২৭/০৪/৯১
৭.	জনাব মুশফিক আহমেদ শামীম	২৭/০৪/৯১ থেকে ১৩/০৭/৯১
৮.	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	২১/০৭/৯১ থেকে ২১/০৬/৯২
৯.	জনাব মোঃ আবুল মাকসুদ	২১/০৬/৯২ থেকে ০৪/০৯/৯৪
১০.	জনাব হাফিজুল ইসলাম মিয়া	২৪/০৯/৯৪ থেকে ২৪/০৩/৯৫
১১.	জনাব নাজমূল হক খান (ভারঃ)	২৫/০১/৯৫ থেকে ২৭/০৩/৯৫

www.pathagar.com

১২.	জনাব হাফিজুল ইসলাম মিয়া	২৮/০৩/৯৫ থেকে ০৯/০৪/৯৫
১৩.	জনাব মোঃ আলমগীর	০৬/০৪/৯৫ থেকে ২৪/০৪/৯৬
১৪.	জনাব নাজমূল হক খান (ভারঃ)	২৪/০৪/৯৬ থেকে ০৪/০৫/৯৬
১৫.	জনাব খন্দকার আহমেদ আলী	২৭/০৪/৯৬ থেকে ১৯/০৩/৯৮
১৬.	জনাব সিদ্দিক জোবায়ের	২৪/০৩/৯৮ থেকে ২৫/০১/৯৯
১৭.	জনাব সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মজুমদার	২৭/০২/৯৯ থেকে ০২/০১/০০
১৮.	জনাবএ.কে.এম.জাকির হোসেন ভূঞা	০২/০১/০০ থেকে ০৪/০৬/০১
১৯.	জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	০৪/০৬/০১ থেকে ০৯/০৮/০১
২০.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	০৯/০৮/০১ থেকে ১৮/০৯/০৪
২১.	জনাব গৌতম কুমার	১৮/০৯/০ থেকে অদ্যাবধি

গফরগাঁও থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৪/০৪/৮৮ থেকে ২৩/১০/৯০
২.	জনাব মোঃ সাজ্জাদ কবির	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	২৩/১০/৯০ থেকে ১৭/০৭/৯১
৩.	জনাব শেখ ইদ্রিছ মিয়া	সহকারী কমিশনার (রাজস্ব অফিসার)	১৭/০৭/৯১ থেকে ০৪/০৬/৯৩
৪.	জনাব আবুল মাফসুদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	০৫/০৬/৯৩ থেকে ১০/০৯/৯৩
৫.	জনাব নাজমূল হক খান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১১/০৯/৯৩ থেকে ০২/০৯/৯৬
৬.	জনাব মুহম্দ ইব্রাহিম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০২/০৯/৯৬ থেকে ১৫/০১/৯৮
৭.	জনাব খন্দকার আহমেদ আলী	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	১৫/০১/৯৮ থেকে ১৯/০৩/৯৮
৮.	জনাব আমিনুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	১৯/০৩/৯৮ থেকে ২৪/০৩/৯৮
৯.	জনাব সিদ্দিক জোবায়ের	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	২৪/০৩/৯৮ থেকে ২৫/০১/৯৯
১০	জনাব গাজী মোঃ জুলহাস	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৫/০১/৯৯ থেকে

www.pathagar.com

		(ভাঃপ্রাঃ)	০৮/০২/৯৯
১১	জনাব সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মজুমদার	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভাঃপ্রাঃ)	০৮/০২/৯৯ থেকে ২২/০২/৯৯
১২	জনাব গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২২/০২/৯৯ থেকে ২৩/০১/০২
১৩	জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৩/০১/০২ থেকে ১৮/০৯/০৪
১৪	জনাব গৌতম কুমার	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১৮/০৯/০৪ থেকে অন্যাবধি

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন ঃ ৩৯৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার।
২। ইউনিয়ন ঃ ১৫ টি।
৩। মৌজা ঃ ২০২ টি।
৪। গ্রামের সংখ্যা ঃ ২০৩ টি।
৫। পৌরসভা ঃ ০১ টি।
৬। মোট ইউনিয়ন ঃ ১৫টি।
৭। মোট জনসংখ্যা ঃ ৩, ৯৯,০৪০ জন (পুরুষ + মহিলা)।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

এ উপজেলা থেকে সড়ক, রেল ও নৌপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

পাকা রাস্তা ঃ ১২৫ কিলোমিটার।
কাঁচা রাস্তা ঃ ৬৫০ কিলোমিটার।
রেলপথ ঃ ২৩ কিলোমিটার।
নৌপথ ঃ ২৪৭ কিলোমিটার।

গফরগাঁও হাট-বাজার সংখ্যা ঃ ১৯ টি।
গফরগাঁও ভূমি আফিস ঃ ১৪ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৬টি
সরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	নাই
রেজিঃ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৭ টি

www.pathagar.com

সরকারী মহাবিদ্যালয়	০১টি
বেসরকারী মহাবিদ্যালয়	০৪টি
দাখিল মাদ্রাসা	৬৬টি

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে গফরগাঁওয়ের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এ উপজেলার বিস্ত্বীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে চরাঞ্চল। এ উপজেলার আহরিত বালু সরকারি রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপজেলার চারিপাড়া থেকে টোক পর্যন্ত্ব এবং বানার নদীর বালু মহাল পর্যন্ত্ব আহরিত বালু সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষি উৎপাদন ঃ কৃষি উৎপাদনে রয়েছে গফরগাঁওয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ফসলের মধ্যে ধান গফরগাঁওয়ের প্রধান ফসল। রবি শস্যের পাশাপাশি পাট ও গমের চাষ হয় গফরগাঁওয়ে। গফরগাঁওয়ের বেগুন দেশবিখ্যাত। এ উপজেলার চরাঞ্চলে প্রচুর বেগুন উৎপাদিত হয়। গফরগাঁও এ উন্নত জাতের গরু পাওয়া যায়। এসব গরুর বেশিরভাগই সাদা।

নদ-নদী ঃ নদী বিধৌত উপজেলা গফরগাঁও। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে যে সব নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–ব্রহ্মপুত্র, সূতিয়া, জলগাথা, বানার কাটাসুতী, শীলা, বানেশ্বর।

প্রধান রাস্ত্মাসমূহ ঃ

১। পুরাতন ঢাকা –ময়মনসিংহ (শেরশাহী) সড়ক।

২। ভালুকা –কোন্দালিয়া সি.এন্ড.বি.সড়ক।

গফরগাঁওয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ গফরগাঁও উপজেলার শিবগঞ্জ বাজার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় শাখার রাজত্বকালে শিবগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ দেশের বিভিন্ন বন্দর, বাজার ও গঞ্জের সাথে নদী পথে শিবগঞ্জ বাজারের যোগাযোগ ছিলো খুবই ভালো। এক সময় শিবগঞ্জ বাজার ছিলো ইসলামপুরের তাঁমা-কাঁসা ও পিতলের জিনিস পত্রের বড় বাজার। ঢাকা, টাঙ্গাইলের তাঁমা-কাঁসা ও পিতলের জিনিস পত্রের বড় বাজার ও ছিলো শিবগঞ্জ।

বৃটিশ আমলে গফরগাঁওয়ের পাট, ধান ও সড়িষা বোঝাই বড় বড় বেপারীর নৌকায়ও কোলকাতায় যাওয়া আসা করতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাসমান নৌকায় ব্যবসায়ীরা কাপড়ের চালান নিয়ে বাজারের ঘাটে নৌকা রাখত। ইংরেজ আমলে ডেভিড, আরসিম, মাইকেল, নারায়ণগঞ্জ কোম্পানী, চামার ও লেজার কোম্পানীর সাহেবেরা সপরিপারে শিবগঞ্জে নিজস্ব বাংলোয় বসে পাট ক্রয় করতো বলে ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়। সে সময় পাটের মওসুমে সপ্তাহে প্রায় ২৫০০ মণ পাট বোট ও ফ্লাটে ভর্তি হয়ে বাষ্পীয় যানে কোলকাতায় চালন করা হতো। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে

www.pathagar.com

গফরগাঁওয়ের ভৌগলিক অবস্থান গফরগাঁও ২৪-১৫ অক্ষাংশের উত্তর এবং ৯০-২৬ দ্রাঘিমার পূর্বে অবস্থিত।

টাকশালঃ এ উপজেলার গয়েসপুরে বাংলার সুলতানদের আমলে একটি টাকশাল স্থাপন করা হয়েছিলো। এই টাকশালটি স্থাপন করেছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তাঁর মুদ্রায় কসবা বা শহর গিয়াসপুর টাকশালের কথা উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ এটিই গিয়াসপুর।

শাসনকেন্দ্রের নাম নগর হোসেনাবাদ ঃ গফরগাঁওয়ের শিলাশী এবং তেঁতুলিয়া গ্রামের মধ্যবর্তী স্বল্প পরিসর একটি এলাকার নাম হচ্ছে নগর হোসেনাবাদ। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, হোসেনপুরের মতো সুলতান হোসেন শাহের আমলে এখানেও একটি শাসন কেন্দ্র ছিলো। নগর হোসেনাবাদ মৌজায় এখনও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পুরোনো ইট এবং পুকুর দেখা যায়।

মোগল নৌবাহিনীর ঘাঁটি ঃ গফরগাঁওয়ের দক্ষিণে ঢাকা জেলার অন্তর্গত টোকে মুগল নৌ-বাহিনীর একটি বিশেষ ঘাঁটি ছিলো। এর বিপরীত পার্শ্বে অর্থাৎ উত্তরে গফরগাঁও উপজেলার অন্তর্গত চানপুর ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন অঞ্চল মোগল আমলে ব্যবসা-বণিজ্য উপলক্ষে কর্মচঞ্চল থাকতো। টাঙ্গাব গ্রামের দক্ষিণপাশে ব্রহ্মপুত্র এবং বানার নদীর সঙ্গমস্থলে একটি মুঘল চৌকি ছিলো। দাউদখান কররানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং পূর্ব বাংলা থেকে ঈশা খাঁকে বিতারিত করার জন্যে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল প্রতিনিধি খান-ই-জাহান হোসেন কুলী বেগ দিল্লী থেকে এখানে আগমন করেছিলেন।

গফরগাঁওয়ের উল্লেখযোগ্য বাজার ঃ গফরগাঁওয়ের উল্লেখযোগ্য বাজারের মধ্যে রয়েছে জলগাবা,সূতি, কটাসূতির ত্রিমোহনায় শিবগঞ্জ গফরগাঁওয়ের সবচেয়ে প্রাচীন বাজার। প্রায় ৬শ'বছর আগে এই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে জানা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দর, বাজার ও গঞ্জের সঙ্গে নদী পথে শিবগঞ্জ বাজারের যোগাযোগ ছিলো। ঢাকায়, টাঙ্গাইল ও ইসলামপুরের তাঁমা-কাঁসা ও পিতলের বড় বাজার ছিলো গফরগাঁও। বৃটিশ আমলে গফরগাঁওয়ের পাট, ধান ও সড়িষা বোঝাই বড় বড় বেপারীর নৌকা কোলকাতার পথে পাড়ি জমাত।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ আমলে দেশী-বিদেশী পাটের কোম্পানী গফরগাঁও-এ ব্যবসারত ছিলো। মাইকেল, ডেভিট, নারায়ণগঞ্জ কোম্পাণী, আরসিম, চামারু ও লেজার কোম্পানীর সাহেবেরা শিবগঞ্জে নিজস্ব বাংলোয় বস-বাস করে পাট ক্রয় করতেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পাটের মওসুমে সপ্তাহে প্রায় ২৫০০ মণ পাট বোট ও ফ্লাটে ভর্তি হয়ে বাষ্পীয় যানে কোলকাতায় চালন হতো। পাটের কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে ছাপড়া, গোবখপুর, আজমগড়সহ বিভিন্ন জেলার কুলী এখানে বস-বাস করতো।

www.pathagar.com

নান্দাইল উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার একটি বর্ধিষ্ণু উপজেলা নান্দাইল। লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে এ উপজেলার গৌরবময় সম্পৃক্ততা রয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকায় নান্দাইলের আড়ালিয়া বিল এর কুড়া শিকারী প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়াও মনসা মঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অধিবাস ছিলো এই নান্দাইলে। গুরুত্বপূর্ণ এ চরিত্রের নাম হচ্ছে কানাহরি। পূর্ব ময়মনসিংহের এই নান্দাইলেই কানাহরির সাকিন ছিলো বলে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দাবি করা হয়। যদিও এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

নামকরণ ঃ

প্রতিটি জায়গার নামকরণের পিছনেই একটি ইতিহাস থাকে। নান্দাইলেরও রয়েছে। এক সময়ে নন্দদুলাল নামের এক জমিদার ছিলেন। জমিদারি সীমানা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন আইনের মাধ্যমে। জমিদারির খাজনা আদায় করতেন নন্দদুলাল। নন্দ দুলালের নন্দ। এর সঙ্গে আইল অপভ্রংশ যুক্ত হয়ে নান্দাইল নামকরণ হয়।

থানা ও উপজেলা সৃষ্টি ঃ

১৯১২ সালের ২জানুয়ারী প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে নান্দাইল থানার গোড়াপত্তন ঘটে। তখন ছিলো বৃটিশ শাসনামল। ১৯১২ সালের ১৮জানুয়ারী নান্দাইল থানা সরকারি গেজেটভুক্ত হয়। ১৯৮২ সালের ১৫ডিসেম্বর নান্দাইল উপজেলা সৃষ্টি হয়।

অবস্থান ও সীমানা ঃ

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে নান্দাইল উপজেলার দূরত্ব ৪৬ কিঃ মিঃ বাস যোগে ময়মনসিংহ থেকে নান্দাইল যেতে সময় লাগে ১ঘন্টা থেকে ১ঘন্টা ১৫মিনিট। জেলা সদর থেকে নান্দাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ সড়ক ধরে ময়মনসিংহ থেকে নান্দাইল এবং নান্দাইল থেকে ময়মনসিংহে আসা-যাওয়া করা যায়।

নান্দাইল থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ শামছুল হক	১২/১২/৮২ থেকে ১৮/০৭/৮৫
২.	জনাব দেওয়ান জাকির হোসেন	১৮/০৮/৮৫ থেকে ১৯/০৫/৮৭
৩.	জনাব শাহজাহান মিয়া (ভারঃ)	১৯/০৫/৮৭ থেকে ০৪/০৭/৮৭
৪.	জনাব মোঃ দবির উদ্দিন	০৪/০৭/৮৭ থেকে ১৭/১০/৮৭
৫.	জনাব মোঃ শাহজাহান	১৭/১০/৮৭ থেকে ২৪/০২/৮৮
৬.	জনাব মোঃ নুরুল হক মিয়া	২৪/০২/৮৮ থেকে ২৯/০১/৯১
৭.	জনাব কাজী আবুল কালাম	২৯/০১/৯১ থেকে ২৫/০৭/৯১
৮.	জনাব ফরহাদ উদ্দিন (ভারঃ)	২৬/০৭/৯১ থেকে ১১/০৮/৯১
৯.	জনাব বারেক উল্লাহ খান	১২/০৮/৯১ থেকে ১৪/০৪/৯৩
১০.	জনাব সন্তোষ রঞ্জন তালুকদার	১৫/০৪/৯৩ থেকে ১৬/০৩/৯৫
১১.	জনাব মৃণাল কান্তি দেবনাথ	১৬/০৩/৯৫ থেকে ১৬/০৪/৯৫
১২.	জনাব আবুল হাশেম সরকার	১৬/০৪/৯৫ থেকে ২৭/০৪/৯৬
১৩.	জনাব প্রাণ গোপাল ভৌমিক	২২/০৪/৯৬ থেকে ১৯/০৮/৯৭
১৪.	জনাব সিরাজুল হক খান	১৯/০৮/৯৭ থেকে ০৫/০৩/৯৮
১৫.	জনাব হারুন অর রশিদ বিশ্বাস (ভারঃ)	০৫/০৩/৯৮ থেকে ১৮/০৩/৯৮
১৬.	জনাব আনোয়ারুল হক খান	১৮/০৩/৯৮ থেকে ১৪/০৯/০০
১৭.	জনাব ইব্রাহিম খলিল	১৪/০৯/০০ থেকে ১৮/১০/০০
১৮.	জনাব মোশাররফ হোসেন (ভারঃ)	১৮/১০/০০ থেকে ১৪/১১/০০
১৯.	জনাব আমজাদ হোসেন	১৪/১১/০০ থেকে ০৫/০৭/০১
২০.	জনাব মোশাররফ হোসেন (ভারঃ)	০৫/০৭/০১ থেকে ১৯/০৮/০১
২১.	জনাব অজিত কুমার পাল	১৯/০৮/০১ থেকে ০৫/০৩/০২
২২.	জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন	০৫/০৩/০২ থেকে ০৯-১০-০৪
২৩.	জনাব দিলীপকুমার বণিক	০৯-১০-০৪ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। আয়তন	ঃ ৩২৬.৭৬ বর্গ কিলোমিটার।
২। লোক সংখ্যা	ঃ ৩,২৮,৮৪৭ জন (পুরুষ +মহিলা)।
৩। পৌরসভা	ঃ ০১ টি।
৪। ইউনিয়ন	ঃ ১১ টি
৫। মৌজা সংখ্যা	ঃ ১৩৬ টি।
৬। গ্রামের সংখ্যা	ঃ ৩০৫ টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

পাকা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ১০৩ কিলোমিটার।
কাঁচা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৩০৬ কিলোমিটার।
সেমি পাকা রাস্ত্মা	ঃ ৫৮৫.৫২ কিলোমিটার।
রেল পথ	ঃ ১৪.৫০ কিলোমিটার।
হাট-বাজারের সংখ্যা	ঃ ৪০ টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

মহাবিদ্যালয়	০১ টি
উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়	০৫ টি
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০১ টি
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৪ টি
মাদ্রাসা	৩০ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৫ টি
বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৪ টি
এবতেদায়ি মাদ্রাসা	১২০ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারী হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারী ক্লিনিক হাসপাতাল	০১ টি

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

মসজিদ	৬৩৯ টি
মন্দির	২৮ টি

সরকারি খদ্যি গুদাম	ঃ ০৫ টি।
উপজেলায় কৃষি উৎপাদন সমূহ	ঃ ধান, পাট, আলু, শীতকালীন সবজি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

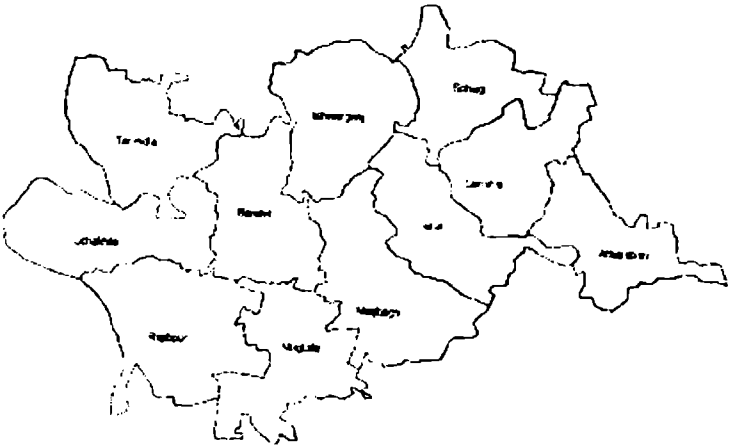

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার সদর থেকে সড়ক পথে পাকা রাস্তার ২৪ কিঃ মিঃ এবং রেলপথে ৩২ কিঃ মিঃ দূরত্বে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। ঈশ্বরগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সালে। একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এ উপজেলায় মুফেন্সী আদালত রয়েছে। ঈশ্বরগঞ্জের উত্তরে গৌরীপুর, দক্ষিণে নান্দাইল, পূর্বে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ সদর ও ত্রিশাল উপজেলার অবস্থান।

উপজেলার নামকরণ ঃ শুরুতেই ঈশ্বরগঞ্জের নামকরণ ঈশ্বরগঞ্জ ছিলো না। ইংরেজ শাসন আমলে এর নামকরণ ছিলো পিতলগঞ্জ। পিতলগঞ্জ থেকে ঈশ্বরগঞ্জের নামকরণ হওয়ার পিছনেও রয়েছে ঐতিহাসিক পেক্ষাপট। ঈশ্বরপাটনী নামে এক খেয়ামাঝি ছিলো। তাঁর কাজ ছিলো ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী অথচ গভীর খরস্রোতা 'কাঁচা মাটিয়া' নদীর বুক বেয়ে ঈশ্বরগঞ্জ সদরের পাশেই দওপাড়া গ্রাম এলাকায় পিতলগঞ্জ বাজারের ঘাটে খেয়াপারাপার করা। পিতলগঞ্জ বাজারটি ছিলো ইংরেজদের স্থাপিত। ঈশ্বরগঞ্জ ছিলো গৌরীপুরের জমিদারদের পরগণা। খেয়ামাঝি ঈশ্বরপাটনীকে খেয়াপারাপারের জন্যে জমিদারের নায়েবকে নজরানা দিয়ে খেয়াপারাপার করতে হতো। ঈশ্বরপাটনী আস্তে আস্তে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পিতলগঞ্জ হাটে খেয়াপারাপারের জন্যেই তাঁর এই পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা। পণ্য বেচাকেনার জন্যে মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই খেয়াপারাপার করতে হতো। এক পর্যায়ে ইংরেজগণ নীলকুঠি স্থাপন করে এবং মানুষকে নীল চাষে বাধ্য করে। ইংরেজরা নির্বিচারে এলাকার বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষ বিশেষ করে পিতলগঞ্জের ব্যবসায়ীদের অতিষ্ঠ করে তোলে। অত্যাচারে মানুষের

www.pathagar.com

প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও মানুষ প্রতিবাদ করার মতো সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ঈশ্বরপাটনী মানুষের এই দুর্ভোগ ও দুর্দশার নিরব সাক্ষী। নীলকরদের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি ঈশ্বরপাটনী। সে ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সে, হয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। এক পর্যয়ে কোনো একদিন নীলকুঠির সাহেবগণ হাটে সমাগত মানুষদের নীলচাষ করতে বলে, ধমক দেয়, এমনকি চাবুক পর্যন্ত মারে। ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে হাটে আসা মানুষগণ। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত মানুষের হাহাকারে প্রকম্পিত হয় পিতলগঞ্জের আকাশ-বাতাস। ঈশ্বরপাটনী এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শাল কাঠের বৈঠা হাতে নিয়ে দৌড়ে যায় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে 'সাহেব চাবুক মারা বন্ধকর'। ইংরেজ সাহেবগণ এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং ঈশ্বরপাটনীর গায়ে চাবুক চালাতে থাকে। ঈশ্বরপাটনীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং হাতের বৈঠা দিয়ে ইংরেজ সাহেবের মাথায় আঘাত করে। এতে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নীলকুঠির সাহেব। রক্ত ঝরতে থাকে তার। রক্তক্ষরণে এক পর্যায়ে নীলকুঠির সাহেব মারা যায়। সৃষ্টি হয় ভীতসন্ত্রস্থ অবস্থা। পিতলগঞ্জের অবস্থা হয়ে পড়ে থমথমে। পিতলগঞ্জে যেনো ঝড় হইতে থাকে এই ঘটনায়। সমগ্র বাংলায়ও এর প্রভাব পড়ে। ঈশ্বরপাটনীও প্রাণে বাঁচতে পারেনি। ভেঙে যায় পিতলগঞ্জের হাট।

তৎকালীন গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী বর্তমান ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদরের জন্যে দত্তপাড়া চরনিখলা মৌজায় বাজার স্থাপন করার জন্যে জমি দান করেন। তিনি ঈশ্বরপাটনীর নামের ঈশ্বরের সঙ্গে গঞ্জ যোগ করে বাজারের নাম দেন ঈশ্বরগঞ্জ। সেই থেকেই ঈশ্বরগঞ্জ নামের সূত্রপাত।

ঈশ্বরগঞ্জ থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আবদুল গনি	৩১/১১/৮২ থেকে ২৮/০১/৮৪
২.	জনাব বিধান চন্দ্র বিশ্বাস (ভারঃ)	২৮/০১/৮৪ থেকে ২২/০২/৮৪
৩.	জনাব মো ঃ শাহজাহান কবীর	২২/০২/৮৪ থেকে ১২/১০/৮৫
৪.	জনাব মোশারফ হোসেন চৌধুরী	১২/১০/৮৫ থেকে ১৬/০৭/৮৮
৫.	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন (ভারঃ)	১৬/০৭/৮৮ থেকে ১০/০৮/৮৮
৬.	জনাব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান	১০/০৮/৮৮ থেকে ১৫/০২/৯০
৭.	জনাব গোপাল চন্দ্র সাহা	১৫/০২/৯০ থেকে ০৪/০৬/৯২
৮.	জনাব মো ঃ নূর হোসেন তালুঃ	০৪/০৬/৯২ থেকে ৩০/০৬/৯২
৯.	জনাব মোঃ নূর হোসেন তালুঃ	০১/০৭/৯২ থেকে ০৬/০৯/৯৩
১০.	জনাব মোঃ জাহাংগীর হোসেন	৩০/০৯/৯৩ থেকে ১৮/০৪/৯৫
১১.	জনাব শাহ্জাহান আলী মোল্লা	১৮/০৪/৯৫ থেকে ০২/০১/৯৭
১২.	জনাব মোঃ আবু তালেব	০২/০১/৯৭ থেকে ২৩/১০/৯৭

www.pathagar.com

১৩.	জনাব এস.এস.এম.আতহার	২৩/১০/৯৭ থেকে ১৩/০২/০০
১৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম(ভারঃ)	১৩/০২/০০ থেকে ১৭/০৪/০২
১৫.	জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	১৭/০৪/০২ থেকে ১২/০৫/০৩
১৬.	জনাব মীর জহুরুল ইসলাম	২২/০৫/০৩ থেকে অদ্যাবধি

ঈশ্বরগঞ্জ থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব কেফায়েত উল্লাহ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৭/০৩/৮৮ থেকে ২৫/০৭/৯০
২.	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২৫/০৭/৯০ থেকে ২৮/০৮/৯১
৩.	জনাব মুহাম্মদ মুসা	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৮/০৮/৯১ থেকে ০৭/০৬/৯৩
৪.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৭/০৬/৯৩ থেকে ১২/০২/৯৫
৫.	জনাব আলী রেজা মজিদ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১২/০২/৯৫ থেকে ১৭/০৭/৯৭
৬.	জনাব ফরিদুল ইসলাম মজুমদার	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৪/০৭/৯৭ থেকে ১৮/০৩/৯৮
৭.	জনাব হারুন আর রশিদ বিশ্বাস	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২১/০৪/৯৮ থেকে ০৪/১১/৯৮
৮.	জনাব নজরুল ইসলাম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৭/০৩/৯৯ থেকে ২১/০১/০১
৯.	জনাব ইব্রাহিম খলিল	উপঃ নির্বাহী অফিসার ও সহঃ কমিশনার (ভূমি) (ভারঃ)	২২/০৫/০৩ থেকে ১৩/০৭/০৪
১০.	জনাব মীর জহুরুল ইসলাম	উপঃ নির্বাহী অফিসার ও সহঃ কমিশনার (ভূমি) (ভারঃ)	২২/০৫/০৩ থেকে ১৩/০৭/০৪
১১.	জনাব মিহির কান্তি রাউৎ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১৪/০৭/২০০৪ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১. মোট আয়তন	ঃ ২৮৬.১৯ বর্গ কিলোমিটার।
২. মোট ইউনিয়ন	ঃ ১১ টি।
৩. পৌরসভা	ঃ ১ টি।
৪. গ্রাম	ঃ ৩১৮ টি।
৫. মৌজার সংখ্যা	ঃ ২৯২ টি।
৬. শিক্ষিতের হার মোট	ঃ ৩৫.১২%।

জনসংখ্যা	ঃ ৩,২০,১৪০ জন ।
(ক) পুরুষ	ঃ ১,৬৫,০৮০ জন।
(খ) মহিলা	ঃ ১,৫৫,০৬০ জন।
মুসলমান	ঃ ২,৯১,৮৯৩ জন।
হিন্দু	ঃ ১২,৭৪২ জন।
খ্রিষ্টান	ঃ ৫৮৮ জন।
অন্যান্য ধর্মাবলম্বী	ঃ ১০৫ জন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ

ডিগ্রি কলেজ	০২ টি
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	০১ টি
উচ্চ বিদ্যালয়	২৫ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৪ টি
মাদ্রাসা	১৯ টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯২ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারি হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারি হাসপাতাল	নেই
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩ টি
মিশনারী হাসপাতাল	নেই
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	০৬ টি
দাতব্য চিকিৎসালয়	০৩ টি

মোট হাট/বাজার সংখ্যা	ঃ ৪৬ টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	ঃ ১১ টি।

www.pathagar.com

প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা	ঃ সড়ক পথ, রেলপথ।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

মোট রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৫১০ কিঃ মিঃ।
পাকা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ২৬ কিঃ মিঃ।
কাঁচা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৫৭৪ কিঃ মিঃ।
রেলপথ	ঃ ১৭ কিঃ মিঃ।
জলপথ	ঃ ১২ কিঃ মিঃ।

শিল্প-কারখানা ঃ

১) বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা	ঃ নেই।
২) কুটির শিল্পের সংখ্যা	ঃ ৪৮১ টি।

উপাসনালয় ঃ

মসজিদ	ঃ ৩৪৬টি।
মন্দির	ঃ ১৮ টি।
গীর্জা	ঃ নেই।

প্রধান প্রধান কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য ঃ ধান, পাট, আলু, গম, আঁখ, ও সরিষা।

www.pathagar.com

গৌরীপুর উপজেলা

অবস্থান ঃ অনেক গৌরবের সূতিকাগার জেলা ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ এক উপজেলা গৌরীপুর। ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে এর অবস্থান। রেলপথ এবং সড়কপথ-দু'ভাবেই যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর পশ্চিম পাশে অবস্থিত এ উপজেলায় অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। অনেক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে গৌরীপুর উপজেলা এক গর্বিত জনপদ। ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শন সমূহের প্রতি পর্যটকদের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। জমিদারদের স্মৃতিবিজড়িত গৌরীপুর উপজেলায় স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে জমিদার বাড়ী।

নামকরণ ঃ গৌরীপুর উপজেলার নামকরণ নিয়ে সঠিক তথ্য জানা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন-গৌরীপুরের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর গৌরী নামের এক কন্যা ছিলো। এ কন্যার নামানুসারেই উপজেলার নামকরণ হয়েছে গৌরীপুর। কারো কারোমতে, হিন্দুদের গৌরী দেরীর নাম অনুসারে গৌরীপুরের নামকরণ হয়েছে। এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি তথ্যও যদি সত্য হয়, তাহলে

www.pathagar.com

আমরা বলতে পারি যে, গৌরীপুর উপজেলার নামকরণ সার্থক ও সুন্দর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় ইংরেজ সমালোচকের বিখ্যাত সেই উক্তি-'A beautifull name is better than a lot of wealth.'

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ইংরেজী ১৯৮১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঈশ্বরগঞ্জ থানা থেকে ৯ (নয়)টি ইউনিয়ন নিয়ে গৌরীপুর থানা গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৮ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে ফুলপুর থানা থেকে আরও ১(এক) টি ইউনিয়ন গৌরীপুর থানার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মরহুম আহসান উল্লাহ চৌধুরী ১৯৮২ সালের ১৫ ডিসেম্বর গৌরীপুরকে থানাতে উন্নীত করেন। পরবর্তীতে, সুনির্দিষ্ট সরকারি ঘোষণার ফলে গৌরীপুর উপজেলায় উন্নীত হয়।

সীমানা ঃ গৌরীপুর উপজেলার উত্তরে ফুলপুর ও পূর্বধলা উপজেলা, দক্ষিণে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কেন্দুয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা অবস্থিত।

ঐতিহাসিক স্থান ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, গৌরীপুর উপজেলায় অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। এ সব স্থানের মধ্যে রয়েছে-গৌরীপুর রাজবাড়ী, কেল্লাবোকাইনগর, নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার হুজরাখানা, কেল্লাতাজপুর, বীরাঙ্গনা সখিনার মাজার, দেওয়ান ওমর খাঁর আমলের মসজিদ, কাগজের কল, ভুটিয়াকোনা থেকে ন-হাটা পর্যন্ত পাকা রাস্তা, চিমুরানীর দীঘিসহ আরও অনেক স্থান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গৌরীপুর উপজেলার অনেক প্রত্নতত্ত্বক নিদর্শন প্রযত্নের অভাবে এবং সময়ের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে।

গৌরীপুর রাজবাড়ী ঃ গৌরীপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও আকর্ষনীয় স্থানসমূহের প্রথমেই যে স্থানটির উল্লেখ করতে হয়, সেটি হচ্ছে-গৌরীপুরের রাজবাড়ী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেও এ বাড়িটি দৃষ্টি নন্দন। এটি এক সময় জমিদারদের বাগানবাড়ী ছিলো। বর্তমানে এখানে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অফিস, কোর্টভবন এবং স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত এ রাজবাড়ীর গোলপুকুর ও কৃত্রিম লেইন যেমন দেখবার মতো, তেমনি কালের সাক্ষী হিসেবে বিবেচ্য।

কেল্লাবোকাইনগরঃ ইতিহাস-ঐতিহ্যও গৌরবের নিদর্শন হিসেবে কেল্লাবোকাই নগরের আলাদা একটি গুরুত্ব রয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৎকালীন বাংলার সুবেদার খাজা ওসমানগণি এই কেল্লাটি নির্মাণ করেছেন। প্রাচীন স্মৃতির স্মারক এই কেল্লার সঙ্গেই একটি মসজিদ নির্মাণ ও একটি পুকুর খনন করেছিলেন সেই সময়ে বাংলার সুবেদার ওসমানগণি। তাঁর উত্তরসুরী সুবেদার চাঁদ রায় এই কেল্লার সঙ্গে একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন এবং খনন করেছিলেন একটি পুকুর। তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, মসজিদ, মন্দির ও কেল্লার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। তবে পুকুর দু'টো ভরাট হয়েগেছে। ভরাট করা পুকুর দু'টোতে ফসলের চাষাবাদ করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চাঁদ রায়

www.pathagar.com

বোকাইনগর রেলস্টেশনের কাছে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু, সেতুটি এখন আর নেই। এটি মাটির নিচে হারিয়ে গেছে।

নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার হুজরাখানা ঃ বোকাইনগরে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার হুজরাখানা এখনো বর্তমান। এখানে বসে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন। আধ্যাত্মিক এই সাধকের পুণ্যস্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে এবং সেই স্মৃতিকে অর্থবহ করার জন্যে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার বিশ্রামের স্থানটিকে পাকা করা হয়েছে। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে এখানে মেলা বসে।

কেল্লাতাজপুর ঃ কেল্লাতাজপুরে রারভূঁয়াদের অন্যতম দেওয়ান ওমর খাঁর বাড়ি বা কেল্লা ছিলো। এখানে এই উপজেলার মাওহা ইউনিয়ন অবস্থিত। কেল্লার চারদিকে প্রশস্ত মাটির দেওয়াল ছিলো।

বীরাঙ্গনা সখিনার মাজার ঃ বীরাঙ্গনা সখিনার মাজার মাওহা ইউনিয়নের কুমড়ী গ্রামে অবস্থিত। এখানেই পতিগতা প্রাণা সখিনা স্বামী ফিরোজ খাঁকে উদ্ধার করার জন্যে পুরুষের ছদ্মবেশে পিতা ওমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে মর্মান্তিক যে তথ্যটি পরিবেশন করতে হয়, সেটি হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর তালাকনামা হাতে পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলে বীরাঙ্গনা সখিনার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

দেওয়ান ওমর খাঁর আমলের মসজিদ ঃ দেওয়ান ওমর খাঁর আমলের একটি মসজিদের অস্তিত্ব কুমড়ী গ্রামে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়। এটি একটি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে মসজিদটির সংস্কার সাধন করা হয়। এই মসজিদে এলাকার লোকজন এখনো নামাজ আদায় করে থাকেন।

কাগজের কল ঃ আশ্চর্য হলেও সত্য যে দেওয়ান ওমর খাঁর আমলে মাওহা ইউনিয়নের ভূটিয়ারকোনা গ্রামে একটি কাগজের কল ছিলো। জানা যায় যে, এই কাগজের কলে সুন্দর ও উন্নত মানের কাগজ উৎপাদন করা হতো। বর্তমানে কাগজের কলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভূটিয়ার কোনা থেকে ন-হাটা পর্যন্ত পাকা রাস্তাঃ দেওয়ান ওমর খাঁর আমলে ভূটিয়ারকোনা থেকে ন–হাটা গ্রাম পর্যন্ত জনগণের চলাচলের জন্যে উন্নতমানের একটি পাকা রাস্তা ছিলো। আস্তে আস্তে রাস্তাটি মাটির নিচে হারিয়ে যায়। তবে, মাটি খুড়লে পুরাতন ইটের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

চিমুরানীর দীঘি ঃ দেওয়ান ওমর খাঁর বোন চিমুরানীর অভিপ্রায় অনুযায়ী এখানে একটি দীঘি খনন করা হয়। চিমুরানীর নাম অনুসারেই এই দীঘির নামকরণ করা হয়েছে চিমুরানীর দীঘি। এর আয়তন ১০ একর। পুকুরটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখানে এখন চাষাবাদ করা হয়। এটি অচিন্তপুর ইউনিয়নের সিংরাউন্দ মৌজায় অবস্থিত। গৌরীপুর উপজেলা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যঃ–গৌরীপুর উপজেলায় একটি পৌরসভা ও ১০টি ইউনিয়ন রয়েছে। গৌরীপুর পৌরসভা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি পৌরসভা। এটি প্রাচীনতম

www.pathagar.com

পৌরসভাগুলোর মধ্যে একটি। গৌরীপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন হচ্ছে-মাওহা ইউনিয়ন, গৌরীপুর ইউনিয়ন, অচিন্তপুর ইউনিয়ন, সহনাটি ইউনিয়ন, বোকাইনগর ইউনিয়ন, রামগোপালপুর ইউনিয়ন, ডৌহাখলা ইউনিয়ন, ভাংনামারী ইউনিয়ন ও সিধলা ইউনিয়ন।

গৌরীপুর থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন	১২-১২-৮২ থেকে ০৯-০৩-৮৬
২.	জনাব এ.এম.আব্দুল মতিন ভূইয়া	১০-০৩-৮৬ থেকে ০৭-০৬-৮৭
৩.	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (ভার)	০৮-০৬-৮৭ থেকে ০৭-০৯-৮৭
৪.	জনাব এম.এ রফিক	০৮-০৯-৮৭ থেকে ১৫-০২-৮৯
৫.	জনাব এ.কে.এম আব্দুল আউয়াল মজুমদার	১৬-০২-৮৯ থেকে ০৪-১০-৯০
৬.	জনাব সুকৃতি রঞ্জন চাকমা (ভারঃ)	০৫-১০-৯০ থেকে ১৯-১২-৯০
৭.	জনাব এস.এম এরশাদুজ্জামান	২০-১২-৯০ থেকে ০৪-০৫-৯২
৮.	জনাব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন	০৫-০৫-৯২ থেকে ১৯-০২-৯৪
৯.	জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম ভূইয়া (ভারঃ)	২০-০২-৯৪ থেকে ১৮-০৪-৯৪
১০.	জনাব এ.ওয়াই.এম হেমায়েত উদ্দিন	১৯-০৪-৯৪ থেকে ২৭-০৪-৯৬
১১.	জনাব মোঃ সাইফুল হাসিব	২৮-০৪-৯৬ থেকে ২৮-১০-৯৬
১২.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	২৯-১০-৯৬ থেকে ২৭-০১-০০
১৩.	জনাব শেখ আলমগীর হোসেন	২৩-১২-৯৯ থেকে ০৫-০৩-০২
১৪.	বেগম সাহান আরা বানু	০৫-০৩-০২ থেকে ০৩-০৭-০৪
১৫.	জনাব কাজী আনোয়ারুল হক	০৩-০৭-২০০৪ থেকে অদ্যবধি

গৌরীপুর থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ঃ

নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	কার্যকাল
১	জনাব মওদুদ এ কাইয়ুম চৌধুরী	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১৬-০৪-৮৮ থেকে ২০-০৯-৮৯
২	জনাব হুমায়ূন কবীর	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১১-১০-৮৯ থেকে ২৪-১১-৯০
৩	জনাব একরামুল হক	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২৫-১১-৯০ থেকে ১১-০২-৯১
৪	জনাব সুকৃতি রঞ্জন	সহঃ কমিশনার	১১-০২-৯১ থেকে ২৬-১০-৯১

www.pathagar.com

	চাকমা	(ভূমি)	
৫	জনাব এ এম সাইফুল হাসান	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২৬-১০-৯১ থেকে ১৩-০৯-৯২
৬	জনাব মঞ্জুর আলম ভূঁইয়া	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৯-০৯-৯২ থেকে ২২-১২-৯৪
৭	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৯-১১-৯৪ থেকে ১৮-১১-৯৭
৮	জনাব মোঃ ফজলুল বারী	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২২-১০-৯৭ থেকে ১৪-০৫-৯৮
৯	জনাব নূরুল আলম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২১-০৪-৯৮ থেকে ৩১-০১-০১
১০	বেগম রাশিদা ফেরদৌস	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৮-০১-০১ থেকে ২৩-০১-০২
১১	জনাব শেখ আলমগীর হোসেন	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২৩-০১-০২ থেকে ১৮-০৩-০২
১২	বেগম সাহান আরা বানু	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	১৩-০৩-০২ থেকে ১০-০৬-০৪
১৩	ডঃ মোছাৎ নাজমানারা খানুম	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	১১-০৬-০৪ থেকে ০৪-০৭-০৪
১৪	জনাব কাজী আনোয়ারুল হক	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	০৪-০৭-০৪ থেকে১০-০৭-০৪
১৫	জনাব এ.এস.এম মুস্ত াফিজুর রহমান	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১০-০৭-০৪ থেকে অদ্যাবধি

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন ঃ ২৭৭ বর্গ কিলোমিটার।
২। পৌরসভা ঃ ১টি।
৩। ইউনিয়ন ঃ ১০টি।
৪। গ্রাম ঃ ৩১২টি।
৫। মৌজা ঃ ২৪৮টি।
৬। মোট জনসংখ্যা ঃ ৩,০৯,৪২৮ জন।
৭। জনসংখ্যা ঃ ২,০৭,৯৪৮ জন।
(ক) পুরুষ ঃ ১,২৫,৭২৫ জন।
(খ) মহিলা ঃ ১,২২,২২০ জন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

www.pathagar.com

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯০টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৯টি
ভি,টি,আই ঃ	০১টি
সরকারী বয়ন বিদ্যালয়	০১টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭টি (১টি সরকারিসহ)
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯ টি
মহাবিদ্যালয়	৩ টি (১টি সরকারিসহ)
মাদ্রাসা	এবতেদায়ী ৩০টি, দাখিল,১১টি, আলিম ২টি, ফাজিল৩টি
মহিলা মহাবিদ্যালয়	০১ টি
শিক্ষার হার	৫২%

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারী হাসপাতাল	০১ টি
বেসরকারী হাসপাতাল	নেই
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৫ টি
মিশনারী হাসপাতাল	নেই
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

(ক) মোট রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৬২৪ কিলো মিটার।
(খ) পাকা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৪৮ কিলো মিটার।
(গ) কাঁচা রাস্তার পরিমাণ	ঃ ৫৭৬ কিলো মিটার।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ১০টি

হাট-বাজার, জলমহাল, পুকুর ও ফেরীঘাট ঃ

হাট-বাজার	১৭টি
জল-মহাল	০৯টি
ফেরীঘাট	নেই
খাসপুকুর	২৬টি

ঐতিহাসিক নিদর্শন ঃ

জমিদার বাড়ী	১২ টি
শাহী মসজিদ	০১ টি
মাজার	০২ টি
মসজিদ	৪৭১ টি
মন্দির	১৭ টি

www.pathagar.com

ফুলপুর উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার সবচে বড় উপজেলা ফুলপুর। ফুলপুরের পূর্ব নাম ছনকান্দা। ইংরেজ সাহেবদের উচ্চারণগত ত্রুটির কারণে ছন্দকান্দা হয়ে উঠেছে চান্দকোন্ডা। কেউ কেউ আবার চাঁদকোন্ডাও লেখেন। জেলা সদর থেকে আনুমানিক ৩৮ কিঃ মিঃ উত্তরে উপজেলা সদরের অবস্থান। ঢাকা শেরপুর মহাসড়ক ধরে ফুলপুর যেতে হয়। জরিপ ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ঘেঁটে ফুলপুর ইউনিয়নে মাগরফুলপুর নামে ২১ একর জমি নিয়ে একটি গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (জে.এল.নং-২৬)। কাজিয়াকান্দা, আমুয়াকান্দার অংশবিশেষ এবং মাগনফুলপুরের সমগ্র জমি নিয়ে গঠিত হয়েছে ফুলপুর উপজেলা সদর এলাকা।

ফুলপুরের নামকরণ কিভাবে হলো, এটি জানতে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, মাগনফুলপুরের নাম অনুসারে ফুলপুর উপজেলার নামকরণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক আগে থেকে এ স্থান ছন্দকান্দা নামে পরিচিত হয়েছে। এ উপজেলার আয়তন ৬৩৪. ৭০ বর্গ কিলোমিটার। ফুলপুর উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ২০ টি ইউনিয়ন রয়েছে। ফুলপুর থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালে।

www.pathagar.com

ফুলপুর থানা/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব মো ঃ মাহতাব উদ্দিন	১৪-০৯-৮৩ থেকে ২২-০৩-৮৪
২.	জনাব জাফর ছাদেক চৌধুরী	১৯-০৩-৮৪ থেকে ১৭-০৮-৮৫
৩.	জনাব খান মোঃ আবুল কালাম	১৭-০৮-৮৫ থেকে ০৬-১০-৮৭
৪.	জনাব আ.ন.ম আবদুল্লাহ	২৪-০৯-৮৭ থেকে ১৬-০২-৮৯
৫.	জনাব এম.এ রফিক	১৬-০২-৮৯ থেকে ১১-০৮-৮৯
৬.	জনাব সুলতান আলম	০৫-১০-৮৯ থেকে ২৯-০৪-৯২
৭.	জনাব এস.এম আব্দুল বাতেন	১০-০৫-৯২ থেকে ১৭-০৫-৯৫
৮.	জনাব নাসির আহমেদ (ভারঃ)	১৮-০৫-৯৫ থেকে ০৫-০৬-৯৫
৯.	জনাব মোঃ আবু তালেব	০৬-০৬-৯৫ থেকে ০১-০১-৯৭
১০.	জনাব মোঃ আমিনুল রব চৌধুরী	০১-০১-৯৭ থেকে ০৪-০২-৯৯
১১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	২৪-০২-৯৯ থেকে ০৮-০৮-০১
১২.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী	০৭-০৮-০১থেকে ০২-০৬-০৪
১৩.	জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন	০২-০৬-০৪ থেকে অদ্যাবধী

ফুলপুর থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১৬/০৭/৮৯-১৫/০৭/৯৩
২.	জনাব সুখরঞ্জন হালদার	থানা রাজস্ব অফিসার	৩০/০৮/৯৩ - ২২/০২/৯৪
৩.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৫/১২/৯৩ - ১২/০৯/৯৬
৪.	জনাব মোঃ আবু তালেব	থানা নির্বাহী অফিসার ও (অঃ দাঃ)	১৩/০৯/৯৬ - ৩০/০৯/৯৬

www.pathagar.com

৫.	জনাব মোঃ অলিউল্লাহ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০১/১০/৯৬ - ০১/০৮/০০
৬.	জনাব ফয়েজ আহমেদ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৫/০৭/০০ - ২৩/০১/০২
৭.	জনাব মোঃ ইউসুফ আলী	উপঃ নির্বাহী অফিসার ও সহঃ কমিশনার (ভূমি) (অঃ দাঃ)	২৩/০১/০২ - ২০/০২/০২
৮.	জনাব গৌতম চন্দ্র পাল	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২০/০২/০২ - ০৮/০৬/০৪
৯.	জনাব আবদুস সালাম সরকার	উপঃ নির্বাহী অফিসার ও সহঃ কমিশনার (ভূমি) (অঃ দাঃ)	০৯/০৬/০৪ - ১১/০৭/০৪
১০.	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১১/০৭/০৪ - অদ্যাবধি

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন	ঃ ৬৩৪.৭০ বর্গ কিলোমিটার।
২। মোট ইউনিয়ন	ঃ ২০ টি।
৩। পৌরসভা	ঃ ১ টি।
৪। গ্রাম সংখ্যা	ঃ ৪১৪ টি।
৫। মৌজার সংখ্যা	ঃ ৩৭৭ টি।
৬। ফেরী ঘাট	ঃ ০৪ টি।
৭। জনসংখ্যা	ঃ ৫,২৬,৯৮৪ জন ।
(ক) পুরুষ	ঃ ২,৬৮,৬৩৫ জন।
(খ) মহিলা	ঃ ২,৫৮,৩৪৯ জন।
মুসলমানঃ	
পুরুষ	ঃ ২,৫৫,৯০২ জন।
মহিলা	ঃ ২,৪৫,৮৬৭ জন।
হিন্দু ঃ পুরুষ	ঃ ১১,৫৩১ জন।
মহিলা	ঃ ১১,০৭৯ জন।
খিষ্টান ঃ পুরুষ	ঃ ৬১৫ জন।
মহিলা	ঃ ৫৯১ জন।
বৌদ্ধ ঃ পুরুষ	ঃ ১১৫ জন।
মহিলা	ঃ ১১০ জন।
অন্যান্য ধর্মাবলী ঃ	
পুরুষ	ঃ ৫৯৯ জন।
মহিলা	ঃ ৫৭৫ জন।

www.pathagar.com

উপজাতি ঃ গারো
ধর্ম ঃ খ্রিষ্টান
জনসংখ্যা ঃ ১৯৮০ জন
ভাষা ঃ গারো ভাষা।
শিক্ষিতের হার মোট ঃ ৬৪.৪%।
পুরুষ ঃ ৭২.০%।
মহিলা ঃ ৫৬.৮%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ঃ ৪০৯ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

ডিগ্রি কলেজ	০২ টি
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ	০৬ টি
উচ্চ বিদ্যালয়	৫৭ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২ টি
মহিলা মহাবিদ্যালয়	১ টি
মাদ্রাসা	৩৩ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৩ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৪ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৪ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

সরকারী হাসপাতাল	০১ টি
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৫ টি
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭ টি
ডিসপেনসারি	৩ টি

হাট/বাজার সংক্রান্ত ঃ
মোট হাট-বাজার ঃ ৮৫ টি।

www.pathagar.com

জল মহাল ঃ ২০ টি পুকুর (বড় ধরণের) ০৪ টি জলমহাল।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ২০ টি।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

পাকা রাস্তা ঃ ৫৮.৮৫ কিঃ মিঃ।

কাঁচা রাস্তা ঃ ৬৪২.০০ কিঃ মিঃ।

রেলপথ ঃ ২.৫০ কিঃ মিঃ।

শিল্প-কারখানা ঃ

১) বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা ঃ ২৮টি।

২) কুটির শিল্পের সংখ্যা ঃ ১৩০০টি।

উপাসনালয় ঃ

মসজিদ ঃ ৭৬৫ টি।

মন্দির ঃ ৩৯ টি।

গীর্জা ঃ ৩টি।

প্রধান প্রধান কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যে ঃ

ধান, পাট, গম. সরিষা, আঁখ, আলু, শাকসবজি।

www.pathagar.com

হালুয়াঘাট উপজেলা

অবস্থান ঃ জেলা ময়মনসিংহের একটি উপজেলা হালুয়াঘাট। ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে ৫২ কিলোমিটার উত্তরে এর অবস্থান। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমানা ঘেঁষে হালুয়াঘাট উপজেলা। সীমান্ত ঘেঁষা এই উপজেলাটি গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এর উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে কংশ নদী, পূর্বে ধোবাউড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে নালিতাবাড়ী উপজেলা।

নামকরণ ঃ 'হালুয়াঘাট' নামকরণটি নিয়ে ইতিহাসবেত্তাগণ সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তবে কেউ কেউ মনে করেন রামবাবুর বাড়ীর পার্শ্বে দর্শা নদীর ঘাটে হালুয়াগণ লাঙ্গল জোয়াল ও বলদ ধৌত করতো। এই ঘাটে হালুয়াদের ব্যাপক সমাগমের ফলে স্থানটি কালক্রমে হালুয়াঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হালচাষ যারা করে, তারাই হালুয়া অর্থাৎ কৃষক।

হালুয়াঘাটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ মোগল সাম্রাজ্যের শেষপাদে এক পর্যায়ের সুবাদার ইসলাম খাঁ। সে সময় লেখা হয় 'বাহারিস্তান-ই-গাইবি' নামক গ্রন্থ। এতে গারো পাহাড়ের সামান্য

www.pathagar.com

বর্ণনা আছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গারো পাহাড় আদিবাসীদের অধিবাস ছিলো। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ পাহাড়ে অন্য শ্রেনীর লোকজনের বসতি ছিলো না।

কালপরিক্রমায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এর কিছুদিন পর কাছাড় ও মনিপুরে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলশ্রুতিতে, প্রভাবশালী কিছুসংখ্যক লোকও স্থান ত্যাগে বাধ্য হয়। এসব লোকজন আসামের মধ্য দিয়ে গারো পাহাড়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তুরা ও ডালু অতিক্রম করে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে আসে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। সে সময়ে গারো পাহাড়ের পাদদেশে কংশ নদী পর্যন্ত ঘনবনে আবৃত ছিলো। আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। মানুষজন সমভূমিতে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করতে থাকে। আস্তে আস্তে বনভূমি উজাড় হয়। বনজঙ্গল হয়ে যায় সম্পদশালী শস্য ক্ষেত্র। সরল ও নিরীহ এই আদিবাসীদের শস্যসম্পদের আকর্ষণে দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন হালুয়াঘাট এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হালুয়াঘাটের দুর্গম এলাকায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। মিশনারীরা মিশন হাসপতাল ও মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আদিবাসীগণ দলে দলে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। বর্তমানে আদিবাসীগণ সকলেই খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী।

হালুয়াঘাটে আগত লোকজন নানা কৌশলে আদিবাসী রমনীদের বিয়ে করতে থাকে। উদ্দেশ্য-সম্পত্তি হস্তগত করা। গারো নিয়মানুযায়ী গারো মহিলাগণই সহায়-সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে। বহিরাগতদের কেউ কেউ সরল ও নিরীহ আদিবাসীদের ঠকিয়ে বিস্তর সম্পত্তি দখল করে নিয়ে যায়। এস.এ.এন্ড. টি এ্যাক্ট-এর ৯৭ নং ধারাতে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে ও আইনের জটিলতা ও যথাযথ প্রয়োগের অভাবে এই আইন তেমন একটা ফলপ্রসূ হয়নি এবং এই আইন আদিবাসীদের স্বার্থে সংরক্ষণেও তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি।

১৯৯৩ সালে হালুয়াঘাট-ময়মনসিংহ হাইওয়ে চালু হওয়ার আগপর্যন্ত কংশ, খরিয়া, দর্শা, গাঙ্গিনা প্রভৃতি নদী দ্বারা অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন ছিলো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বৃটিশ শাসনের সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলে গারো, হাজং, কোচ, ডালু, থানাইসহ অনেক অধিবাসীর আধিক্য ছিলো। সে সময় সীমিত সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান ও বস-বাস করতেন এখানে। বিগত ৫০ বছরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে ময়মনসিংহের গফরগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, ত্রিশাল, টাঙ্গাইল, বৃহত্তর ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভূমিহীন গরিব তথা প্রান্তিক মানুষজন এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পর ১৯৬৫ ও ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে অনেক আদিবাসী দেশত্যাগ করে পার্শ্ববতী ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে চলে যায়।

হালুয়াঘাট থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকালঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব এম.এ সামাদ	০৭-১১-৮৩ থেকে ০৩-১২-৮৩

www.pathagar.com

২.	জনাব এ.এম.সাইদ উর রহমান	০৪-১২-৮৩ থেকে ০৮-০৯-৮৫
৩.	জনাব এম.এ সামাদ	০৯-০৯-৮৫ থেকে ১২-১০-৮৫
৪.	জনাব শফিকুর রহমান	১২-১০-৮৫ থেকে ০২-০২-৮৯
৫.	জনাব এম.এ মুক্তাদির	১৩-০২-৮৯ থেকে ২১-০৯-৯১
৬.	জনাব মো ঃ আবু সিদ্দিক চৌধুরী	২১-০৯-৯১ থেকে ১৪-০৭-৯৩
৭.	জনাব মো ঃ আব্দুল হালিম	১৪-০৭-৯৩ থেকে ০৬-০৯-৯৪
৮.	জনাবএ.জেড.এম.রফিকুর রহমান	১১-০৯-৯৪ থেকে ১৫-১০-৯৬
৯.	জনাব আবদুর রউফ	২৩-১০-৯৬ থেকে ২৪-০২-০০
১০.	জনাব আয়ুব আলী	১০-০২-০০ থেকে ২১-০৫-০৩
১১.	জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী	২১-০৫-০৩ থেকে অদ্যাবধি

হালুয়াঘাট থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকালঃ

নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আলী আকবর	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১১-০৫-৮৯ - ০৪-০৪-৯১
২.	জনাব কাজী আমিনুল হক	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	০৫-০৪-৯১ - ২০-১১-৯১
৩.	জনাব মোঃ আলমগীর কবীর খান	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২০-১১-৯১ - ০২-০৮-৯৫
৪.	জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০২-০৮-৯৫- ২০-০৩-৯৭
৫.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২০-০৩-৯৭ - ২৩-০৭-৯৭
৬.	জনাব মোঃ আলী রেজা মজিদ	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৩-০৭-৯৭ - ০২-১১-৯৮
৭.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	০২-১১-৯৮ - ২৩-০৩-৯৯
৮.	জনাব অলি উল্লাহ	সহঃ কমিশনার (ভূমি) (অতিঃ দাঃ)	২৪-০৩-৯৯ - ১৮-০৫-৯৯
৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	১৮-০৫-৯৯ - ০৮-০২-০১
১০.	জনাব মোঃ নূরুল আলম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	০৯-০২-০১ - ২৩-০১-০২
১১.	জনাব মোঃ আয়ুব আলী	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	২৪-০১-০২ - ২৬-০৩-০২
১২.	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহঃ কমিশনার (ভূমি)	২৭-০৩-০২ - ০৩-১০-০২
১৩.	জনাব মোঃ আয়ুব আলী	সহঃ কমিশনার (ভারঃ)	০৪-১০-০২ - ২২-০৫-০৩
১৪.	জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী	সহঃ কমিশনার (অতিঃ দাঃ)	২২-০৫-০৩ অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন	ঃ ৩৪৯.৯১ বর্গ কিলোমিটার।
২। মোট ইউনিয়ন	ঃ ১২ টি।
৩। মৌজা	ঃ ১৪৫ টি।
৪। জনসংখ্যা	ঃ ২,৪২,৩৩৯ জন (১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)।
(ক) পুরুষ	ঃ ১,২২,৮১৬ জন।
(খ) মহিলা	ঃ ১,১৯,৫২৩ জন।

হালুয়াঘাট থানা উপজেলায় উন্নীত হওয়ার তারিখ ঃ ৭/১১/১৯৮৩ ইং

মোট উপজাতি	ঃ ১৩,৯৩৫ জন।
(ক) পুরুষ	ঃ ৬,৯৯৭ জন।
(খ) মহিলা	ঃ ৬,৯৩৮ জন।

মোট হাট-বাজারের সংখ্যা	ঃ ৩২ টি।
ক) উপজেলার নিয়ন্ত্রণাধীন	ঃ ০৪ টি।
খ) উই. পি.র নিয়ন্ত্রণাধীন	ঃ ১৯ টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।

মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৫ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮১ টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৯ টি
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৪৫ টি

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক)	২৩ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা)	০১ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়(বালক)	০৪ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়(বালিকা)	০১ টি
দাখিল মাদ্রাসা	১২ টি

কলেজ ঃ

ডিগ্রি কলেজ	০১ টি
মহিলা কলেজ (ইন্টার মিডিয়েট)	০১ টি
ইন্টার মিডিয়েট কলেজ	০১ টি

হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ

www.pathagar.com

সরকারি হাসপাতাল	০১ টি (বেডের সংখ্যা-৩১ টি)
বেসরকারি হাসপাতাল	০১ টি
উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩ টি
ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, ছাতুগাঁও	০১ টি
জয়রামকুড়া খৃস্টান মিশন হাসপাতাল	০১ টি (১৯৪৬ সালে দুর্গম এলাকায় প্রতিষ্ঠিত)

ভারত থেকে কয়লা আমদানীর স্থল বন্দর ঃ ০২ টি।
(ক) কড়ইতলা
(খ) গোবরাকুড়া।

ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার, রাংরা পাড়া ঃ ০১ টি। (এটি গারোদের কমিউনিটি সেন্টার ও সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসেবে কাজ করে।)

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

মোট রাস্ত্মা	ঃ ৮৭১ কিলো মিটার।
কাঁচা রাস্ত্মা	ঃ ৭৭১ কিলো মিটার।
পাকা রাস্ত্মা	ঃ ৪৬ কিলো মিটার।
পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০৫ টি।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	ঃ ০২ টি।
ইউ.পি. পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	ঃ ০৪ টি।
এম.সি.এইচ ইউনিট	ঃ ০১ টি।
ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	ঃ ৩৪ টি (নির্মাণাধীন)।
জনসংখ্য বৃদ্ধির হার	ঃ ১.৯%।

হালুয়াঘাটের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে হালুয়াঘাটের রয়েছে গৌরবউজ্জল ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের গোটা ৯ মাস ধরেই এখানে যুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ৩ নভেম্বর তেলিখালি নামক স্থানে পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধে ২৮ জন মুক্তিযুদ্ধা শহীদ হন। তেলিখালিতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর রয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরোচিত যুদ্ধ জাতির জন্যে নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। বান্দরঘাটায় ইপিআর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় ক্যাম্প দখলের পর দূর থেকে পাকবাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে মুক্তিযোদ্ধা আজিজ, সালাম, পরিমলসহ ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ৫ আগষ্ট শহীদ হন।

www.pathagar.com

ধোবাউড়া উপজেলা

জেলা ময়মনসিংহের পশ্চাৎপদ উপজেলার নাম ধোবাউড়া। সব দিক থেকেই এটি অবহেলিত, পশ্চাৎপদ এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এ উপজেলা গঠনের পেক্ষাপট হচ্ছে সময়, পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক শৃংখলার স্বার্থে ধোবাউড়া উপজেলা গঠিত হয়। গঠন পর্যায়ে এটি ছিলো থানা। পরবর্তীতে, এটি উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৭৫-১৯৭৬ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে দুর্গাপুর থানা সদর থেকে হালুয়াঘাট থানা সদরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি থানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালের ৩১মে তারিখের দুর্গাপুর থানার দক্ষিণ-মাইজপাড়া, ধোবাউড়া, গামারীতলা, পোড়াকান্দুলিয়া ইউনিয়ন এবং হালুয়াঘাট থানার ঘোষগাঁও, শাকুয়াই, বাঘবেড় ও বিলডোরা ইউনিয়ন নিয়ে তৎকালীন ঝিকুয়া বাজার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ধোবাউড়া থানা। পরবর্তীতে, ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর ধোবাউড়া উপজেলায় উন্নীত হয়। এরপর এই উপজেলা থেকে শাকুয়াই ও বিলডোরা ইউনিয়নকে আগের হালুয়াঘাট উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্থিতিশীলতার কথা চিন্তা করে ধোবাউড়া উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভালো।

নামকরণ ঃ ধোবাউড়া উপজেলার নামকরণের ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই এলাকার ভূ-স্বামী, জোতদার গৌরী বল্লভ সেনের বস-

www.pathagar.com

বাস ছিলো। তাঁর বসতঘরের পাশেই ছিলো একটি পুকুর। বলা যায়, এই পুকুর পাড়েই ছিলো ধোপাদের আধিবাস। তাদের নেতা ছিলো সীতা নামের এক ধোপা। এক সময় সীতা পুকুরে ডুবে মারা যায়। সীতার সলিল সমাধির পর অবশিষ্ট তাঁর স্বগোত্রীয় ধোপারা পুকুর পাড়ে বস-বাস করতে গিয়ে ভড়কে যায়। এক পর্যায়ে ধোপারা এ স্থান ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। তখন থেকেই এলাকাটি ধোবাউড়া নামে পরিচিত হতে থাকে। সময়ের ধারাবাহিকতায় ধোবাউড়ায় গ্রাম এবং মৌজাও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ধোবাউড়া স্বাভাবিকভাবেই ছিলো গ্রাম, পরবর্তীতে এটি ইউনিয়ন হয়। আর ইউনিয়ন থেকেই ধোবাউড়া হয় থানা, পরবর্তীতে উপজেলা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুকুর পারে সীতা ও তাঁর স্বগোত্রীয়রা বস-বাস করতো, তা সীতার দীঘি নামে পরিচিতি লাভ করে। এখনোও সে পরিচয় হারিয়ে যায়নি।

অবস্থান ঃ ২৫.০৫-২৫.২ উত্তর অক্ষাংশ, ৯০.৪-৯০.৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৩৫-৫০। ধোবাউড়া উপজেলার অবস্থান জেলা সদর থেকে ৫৫ কিলোমিটার উত্তরে। উপজেলা সদরের উত্তরে ভারত সীমান্ত, দক্ষিণে ফুলপুর ও পূর্বধলা, পূর্বে দুর্গাপুর ও পশ্চিমে হালুয়াঘাট উপজেলা।

ধোবাউড়া থানা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নামসহ কার্যকাল ঃ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	জনাব এ.কে.এম আবদুল মতিন	০৪-১১-৮৩ থেকে ২০-০৩-৮৬
২.	জনাব সুকৃতি রঞ্জন চাকমা	২১-০৩-৮৬ থেকে ১০-০৭-৮৬
৩.	জনাব মো ঃ সাইফুল ইসলাম	১১-০৭-৮৬ থেকে ১৫-০২-৮৯
৪.	জনাব এ.এম সুলতান আহম্মদ	১৬-০২-৮৯ থেকে ১৯-০৩-৮৯
৫.	জনাব মো ঃ সহিদ উল্লাহ	২০-০৭-৮৯ থেকে ০৩-০৭-৯২
৬.	জনাব সন্তোষ রঞ্জন তালুকদার	০৪-০৭-৯২ থেকে ২৩-০২-৯৩
৭.	জনাব মো ঃ আবুল হোসেন	২৪-০২-৯৩ থেকে ২৬-১১-৯৫
৮.	জনাব মো ঃ আব্দুল মালেক	২৭-১১-৯৫ থেকে ৩০-১১-৯৫
৯.	জনাব এ.জেড.এম রফিকুর রহমান	০১-১২-৯৫ থেকে ০৩-১২-৯৫
১০.	জনাব মো ঃ মোবারক আলী	০৪-১২-৯৫ থেকে ১৫-১০-৯৭
১১.	জনাব মো ঃ আবুবকর ছিদ্দিক মোল্লা	১৫-১০-৯৭ থেকে ০৬-০১-০০
১২.	জনাব মো ঃ রহুল আমিন মুন্সী	০৬-০১-০০ থেকে ২৯-০৭-০১
১৩.	ডঃ রেজাউল বাসার সিদ্দিকী (ভারঃ)	২৯-০৭-০১ থেকে ১৩-০৮-০১
১৪.	জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী	১৩-০৮-০১ থেকে ৩০-০৯-০৪
১৫.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	৩০-০৯-০৪ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

ধোবাউড়া থানা/ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ঃ

নং	নাম	পদবী	কার্যকাল
১.	জনাব রাজ মাহমুদ	উপজেলা রাজস্ব অফিসার	০৭/১২/৮৩ হতে ২৪/০৩/৮৭
২.	জনাব এম.আর.চাকমা	উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট	২৫/০৩/৮৭ হতে ০৫/০৪/৮৭
৩.	জনাব মোঃ শামছুল আলম	উপজেলা রাজস্ব অফিসার (চঃ দাঃ)	০৬/০৪/৮৭ হতে ০৯/০৯/৮৯
৪.	জনাব মোঃ আনছার আলী	উপজেলা রাজস্ব অফিসার (চঃ দাঃ)	১০/০৯/৮৯ হতে ২৭/০৬/৯০
৫.	জনাব সত্যব্রত সাহা	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৮/০৬/৯০ থেকে ১৯/০৯/৯১
৬.	জনাব মোঃ শামছুল আলম	উপজেলা রাজস্ব অফিসার (চঃ দাঃ)	২০/০৯/৯১ থেকে ২৯/০৭/৯২
৭.	জনাব এস.আর. তালুকদার	সহকারী কমিশনার(ভারঃ)	৩০/০৭/৯২ থেকে ০৭/০৯/৯২
৮.	জনাব মোঃ নাজমূল হক	সহকারী কমিশনার(চঃদাঃ)	০৮/০৯/৯২ থেকে ১০/১২/৯৫
৯.	জনাব হাফিজ উদ্দিন	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১১/১২/৯৫ থেকে ২১/১০/৯৬
১০	জনাব এম মোবারক আলী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (চঃ দাঃ)	২২/১০/৯৬ থেকে ০৪/১১/৯৬
১১	জনাব রঞ্জিত কুমার দাস	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৫/১১/৯৬ থেকে ১১/০২/৯৮
১২	জনাব আবু বকর ছিদ্দিক মোল্লা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (চঃ দাঃ)	১২/০২/৯৮ থেকে ০৬/০১/০০
১৩	জনাব রুহুল আমিন মুন্সী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (চঃ দাঃ)	০৭/০১/০০ থেকে ১২/১২/০০
১৪	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অঃ দাঃ)	১৩/১২/০০ থেকে ০৮/০২/০১
১৫	জনাব নুরুল আলম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০৯/০২/০১ থেকে ২১/০৬/০১
১৬	জনাব রেজাউল বাসার সিদ্দিকী	সহকারী কমিশনার (ভূমি) (ভারপ্রাপ্ত)	২১/০৬/০১ থেকে অদ্যাবধি

www.pathagar.com

মৌলিক তথ্যাবলী ঃ

১। মোট আয়তন	ঃ ২৫১.০৫ বর্গ কিলোমিটার।
২। ইউনিয়ন	ঃ ৭টি।
৩। গ্রাম	ঃ ১৬২টি।
৪। মৌজা	ঃ ৯৬টি।
৫। হাট-বাজার	ঃ ২০টি।
৬। জনসংখ্যা	ঃ ১,৭২,৭৬০ জন (২০০১ সানের আদমশুমারী অনুযায়ী)।
পুরুষ	ঃ ৮৮২৬০ জন।
মহিলা	ঃ ৮৪৫০০ জন।
মুসলমান	ঃ ৮৮.৭৩%
খৃষ্টান	ঃ ৬.৩৬%।
হিন্দু	ঃ ৪.৪৯%।
বৌদ্ধ	ঃ .১৫%।
অন্যান্য	ঃ .২৭%।
আদিবাসী/উপজাতি	ঃ গারো (খৃষ্টান) হাজং, ক্ষত্রিয় ও বানাই।
ইউনিয়ন ভূমি আফিস	ঃ ৭ টি।
উল্লেখযোগ্য হাট-বাজার	ঃ ধোবাউড়া, গোয়াতলা, কলসিন্দুর, ঘোষ গাঁও, মুন্সির হাট, পোড়াকান্দুলিয়া।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯টি
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৯টি
কেজি স্কুল	০২টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	০৬ টি
দাখিল মাদ্রাসা	০৬টি
মহাবিদ্যালয়	০২টি (১মহিলা মহাবিদ্যালয়সহ)
স্কুল এন্ড কলেজ	০১টি
আলিম মাদ্রাসা	০১টি
ফাজিল মাদ্রাসা	০১টি
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৩টি
খারিজি মাদ্রাসা	০৪টি

www.pathagar.com

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ ধোবাউড়া। গড় উষ্ণতা জানুয়ারি মাসে ১৮.৫°c এবং জুলাই মাসে ২৮.°c। উত্তর পাশে নদী। দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কংশ নদী। উত্তর সীমান্তে অনেক টিলা রয়েছে। উত্তরাংশে টিলার পাদদেশে পাদদেশীয় সমভূমিতে বেলে ও বেলে দোঁয়াশ মাটি এবং দক্ষিণাংশে এটেল মাটি দিয়ে গঠিত হয়েছে ধোবউড়া উপজেলার পৃষ্ঠদেশ। এ উপজেলার বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০০১-৩৫০০ মি ঃ মিঃ।

ভূমির ব্যবহার ঃ

মোট জমি	ঃ ২৫.১৮৭ হেক্টর।
চাষাবাদ যোগ্য জমির পরিমান	ঃ ১৭৮০২ হেক্টর।
অনাবাদি চাষাবাদ জমির পরিমান	ঃ ১৭৮০২ হেক্টর।
সাময়িক পতিত জমির পরিমান	ঃ ১০০ হেক্টর।
এক ফসলি জমির পরিমান	ঃ ৩৯১০ হেক্টর।
দুফসলি জমির পরিমান	ঃ ১২৩২২ হেক্টর।
তিন ফসলি জমির পরিমান	ঃ ১০২৫ হেক্টর।
ফসলের নিবিড়তা	ঃ ১৮৩.২৮%।

জমির প্রকৃতি ঃ

উচু জমির পরিমান	ঃ ৩৮৯৬ হেক্টর।
মাঝারী জমির পরিমান	ঃ ৮২৯৯ হেক্টর।
নিচু জমির পরিমান	ঃ ২৫০৭ হেক্টর।

খাদ্য বিভাগ ঃ

মোট খাদ্য চাহিদা	ঃ ২৫,২০০মেট্রিক টন।
মোট খাদ্য উৎপাদন	ঃ ৩১,৩০০মেট্রিক টন।
মোট খাদ্য গুদাম	ঃ ০৩টি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

মোট রাস্তার পরিমান	ঃ ৩৫৩ কিলোমিটার।
পাকা রাস্তা	ঃ ১২ কিলোমিটার।
এইচ বি বি রাস্তা	ঃ ৫ কিলোমিটার।
কাঁচা রাস্তা	ঃ ৩৩৬ কিলোমিটার।

বিশেষ নোট ঃ

জেলা সদরের সাথে থানা সদরের যোগাযোগের কোনো পাকা রাস্তা নেই। পাকা রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং রাস্তার কিছু অংশ পাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হলে এবং সেতু-কালভার্ট প্রয়োজনে নির্মাণ করা গেলে জেলা সদরের সাথে ধোবাউড়া উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সরাসরি না হলেও ঘুরো পথে ধোবাউড়া যাওয়া যায়। মাধ্যম বাস, ম্যাক্সি, প্রাইভেট কার।

www.pathagar.com

জেলা বোর্ড (লোকাল গর্ভমেন্ট)/ জেলা পরিষদ

স্থানীয় সরকারের রূপরেখা প্রাচীন আমলে কি রকম ছিলো, তা বলা মুশকিল। সে সময় স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিলো কি না তা-ও জানা যায় না। ইতিহাসের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানী শাসন ক্ষমতা লাভ করে, তখন থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মোগল আমলের শাসন ব্যবস্থাই অব্যাহত ছিলো। আমরা বলতে পারি যে, ব্রিটিশ সরকার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের জন্যে কোনো প্রকার নীতিমালা ঘোষণা করেনি কিংবা এ ব্যাপারে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেয়নি।

১৮১৬ এবং ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে রাস্তাঘাট, সেতু, নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে জেলা পর্যায়ে কর ধার্য করার জন্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে আইন গৃহীত হয়। খরচাদি নির্বাহের জন্যে প্রতি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। অর্থ ব্যয় করা হতো কমিটির পরামর্শক্রমে। আমরা এই কমিটিকেই স্থানীয় প্রশাসনের সূচনা বলে ধরে নিতে পারি।

ময়মনসিংহ জেলায় এক সময় একটি ফেরী তহবিল গঠিত হয়েছিলো। এটি হয়েছিলো ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল এ্যাক্ট-৮ অনুযায়ী। সড়ক ও ফেরীসমূহের উপর কর ধার্য করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আইন ব্যবহৃত হতো। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর প্রয়োজন অনুসারে প্রতি জেলায় বরাদ্দ নির্ধারিত হতো।

জনসাধারণ যে স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষা, যাতায়াত ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে এগিয়ে আসে, তা সরকারি প্রচেষ্টার ফলেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসব কাজ তদারকি করার জন্যে একটি করে কমিটি গঠিত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদে যে জেলা রোডসেস এ্যাক্ট পাস করা হয়েছিলো, তা উল্লেখিত কমিটির অনুমোদন ও সুপারিশক্রমে। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে, জেলা রোডসেস এ্যাক্ট হয়েছিলো ১৮৭১ সালে। এই এ্যাক্ট বা আইন বলে প্রতি জেলায় একটি করে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

কমিটিতে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে সরকারি এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবে বেসরকারি। সরকার সকল সদস্যকে নিয়োগদান করতেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। উল্লেখিত আইনের অধীনে সর্বোচ্চ পথকর নির্দিষ্ট করাই ছিলো কমিটির প্রধান কাজ। কর আদায় এবং ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিলো কমিটির উপর। জেলা সড়ক ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্যে জেলা সড়ক কমিটি ১৮৭১ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। এই কমিটি আদায়কৃত শুল্ক ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক ১.৮০০ টাকা ব্যয় করতে পারতো। রোডসেস এ্যাক্টের বলেই জেলা সড়ক কমিটি তা করতে পারতো। তবে গুরুত্বপূর্ণ ফেরীসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ জেলা সড়ক কমিটি খরচ করতে পারতো না,

www.pathagar.com

তা সরকারি তহবিলে জমা দিতে হতো। এই আওতা অনেক বেশি সম্প্রসারিত ছিলো। গ্রামের রাস্তার জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুর করার প্রয়োজনে প্রতিটি মহকুমায় শাখা সড়ক কমিটিও গঠিত হয়েছিলে। জেলা সড়ক কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিলো ১৭ জন।

জেলাবোর্ড স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায়। 'Bengal Local Self-Government Act in 1885'-অনুসারে ও স্থানীয় সরকার (বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যা) বিধান মোতাবেক ১৮৮৭ সালে ৩ বছরের জন্যে জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এর কর্তাব্যক্তি ও চেয়ারম্যান। ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এ নিয়ম বহাল থাকে। (Vide Government of Bengal Municipal Department No-232-36 LSG dt, 3. 2. 20) আগেই বলা হয়েছে যে, ১৮৮৭ সালে জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিলো। এ সময়েই লোকাল বোর্ড গঠিত হয়েছিলো। জেলার কালেক্টর ডব্লিউ, রটন জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। সভাপতিসহ এই বোর্ডের সদস্য ছিলো ২৫ জন। একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হতেন সভ্যগণের মধ্য থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জেলা বোর্ড ময়মনসিংহে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ/মনোনয়নের ক্ষেত্রে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো, অন্য কোনো জেলায় ঘটেছিলো বলে আমাদের জানা নেই। কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'জেলার কালেক্টর এই বোর্ডের সভাপতি। সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই বোর্ডে সভাপতিসহ মোট ২৫ জন সভ্য। ইহাদের ১২ জন লোকাল বোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন ও ১২ জন গবর্ণমেন্ট মনোনীত করিয়া থাকেন'। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটায়ার বৃহত্তর ময়মনসিংহ' এর প্রধান সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান কেদরনাথ মজুমদারের সাথে এক মত পোষণ করেন।

আমরা জানি যে, জেলা বোর্ড গঠিত হবার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। জেলা বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল, বি, এল.। তিনি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর। পাবলিক প্রসিকিউটর হওয়ার কারণে সরকারি নীতি অনুসারে তিনি পদত্যাগ করেন। সে সময়ে সরকার এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন যে, আইনজীবীদের মধ্যে যাঁরা জিপি ও পিপি হিসেবে কর্মরত থাকতেন, তাঁরা সরকারি কর্মচারি হিসেবে গণ্য হতেন। ৭-৫-১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত জেলা বোর্ডের সভায় খান বাহাদুর এস এ হোসাইন চৌধুরীকে ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরকার বাহাদুর বরাবর প্রস্তাব পাঠালে সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর খান বাহাদুর ইসমাইল ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ সালের শেষের দিকে সরকার তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে ২ বছরের জন্যে লেঃ এস.এম. হোসেইন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন। এর দু'বছর পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবার ক্ষমতা ফিরে পান। অবশ্য ইতোপূর্বে ১২ নভেম্বর, ১৮৯২, স্থানীয় সরকার আইন ৩/১৮৮৫ মুলে

www.pathagar.com

লেঃ গর্ভনর ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পুনঃ ক্ষমতা অর্জনের আদেশ জারি করেছিলেন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্যে।

এদিকে, সরকার ২৫-১১-৩২ তারিখে স্মারক নম্বর ৫৬৪৮ ও ৫৬৪৯ এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ভাইস-চেয়ারম্যানের নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান করলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দান করেন পাবলিক প্রসিকিউটর খান সাহেব শারফুদ্দিন বি.এল.কে। তিনি ১৪-১২-৩২ থেকে ২৭-৮-৩৭ ইং পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে, ২৮-৮-৩৭ ইং তারিখ থেকে ৫ বছরের জন্যে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন খান সাহেব নূরুল আমীন বি. এল। এক্ষণে আমরা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সরকারিভাবে ও বেসরকারিভাবে নির্বাচিত সদস্য গণের নামের তালিকা কার্যকালসহ উল্লেখ করছি-

বেসরকারী চেয়ারম্যান ঃ

নং	নাম	কার্যকাল	মন্তব্য
১	খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল, বি.এল।	২৮-০২-১৮২০–০৬-০৫-১৮২০	এ সময় তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, ফলে চেয়ারম্যান পদে ইস্তফাদেন।
২	খান বাহাদুর সৈয়দ আহম্মদ হোসেন চৌধুরী।	০৭-০৫-২০– ২২-০১-২৪	–
৩	খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল, বি.এল।	২২-০১-২৪– ২৮-০৬-২৯	জিপি, পিপিগন নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পারবেন সে আলোকে।
৪	লে ঃ এস.এম. হোসেন।	২৭-০৭-২৯–৩০-০১-৩১	সরকার কর্তৃক মনোনিত।
৫	এইচ, গ্রাহাম, ইএসকিউ, আই, সি, এস, আই, ই এবং রায় বাহদুর এস, সি ঘটক।	৩১-০১-৩১ – ১৩-১২-৩২	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও চেয়ারম্যান।
৬	খান বাহাদুর শরাফ উদ্দিন আহমেদ, বি, এল।	১৪-১২-৩২–২৭-০৮-৩৭	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ও সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ও পরবর্তীতে বিলুপ্ত ঘোষিতহয়।

www.pathagar.com

ভাইসচেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ঃ

নং	নাম	কার্যকাল	মন্তব্য
১	বাবু ঈশাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল।	২৯-০৮-৩৭ থেকে ২৮-১১-১৮৯৪	দু'বার।
২	বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস।	২৯-১১-৯৪ থেকে ২০-০৪-৯৭	–
৩	বাবু গঙ্গা নারায়ণ রায় ডেপুটি কালেক্টর।	২১-০৪-৯৭ থেকে ২০-০৯-৯৭	সরকারিভাবে।
৪	বাবু চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী, বি, এল।	২১-০৯-৯৭ থেকে ২৬-১০-১৯০০	–
৫	বাবু অনাথ বন্ধু গুহ বি,এল।	২৭-১০-১৯০০ থেকে ২৬-১১-০৬	দু'বার।
৬	খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল, বি.এল।	২৭-১১-০৬ থেকে ২৭-০২-২০	চারবার।
৭	রায়বাহাদুর শশধর ঘোষ বি, এল।	২৮-০২-২০ থেকে ২২-০১-২৪	–
৮	মৌলভী সাহাবউদ্দিন আহমেদ, বি, এল।	২৩-০১-২৪ থেকে ১৯-০৮-২৭	–
৯	রায়বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদার	২০-০৮-২৭ থেকে ১৩-১২-৩২	–
১০	খানসাহেব আবদুল হামিদ চৌধুরী, এম,এল,সি।	১৪-১২-৩২ থেকে ২৭-০৮-৩৭	–
১১	বাবু জিতেন্দ্র নাথ দত্ত বি,এল।	২৮-০৮-৩৭ থেকে -	–
১২	মৌলভী গিয়াস উদ্দিন পাঠান বি,এল।	২৮-০৮-৩৭ থেকে -	–

জেলা বোর্ড মেম্বার ২৮-০২-২০ থেকে ২২-০১-২৪

১. সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।
২. মহকুমা প্রশাসক,নেত্রকোনা।
৩. মহকুমা প্রশাসক জামালপুর।
৪. মহকুমা প্রশাসক টাঙ্গাইল।
৫. মহকুমা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ।
৬. জেলা, উপ স্কুল পরিদর্শক, ময়মনসিংহ।

www.pathagar.com

৭. রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী।
৮. রায়বাহাদুর চন্দ্রকিশোর কর।
৯. রায়বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদার ।
১০. রায়বাহাদুর শশধর ঘোষ বি, এল।
১১. খান বাহাদুর মো ঃ ইসমাইল, বি.এল।
১২. খান বাহাদুর সৈয়দ আহমেদ হোসেন চৌধুরী।
১৩. বাবু গোপিনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৪. বাবু সুরেন্দ্র প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী।
১৫. বাবু কামিনী মোহন বিশ্বাস, এম,এ, বি,এল।
১৬. বাবু বসন্ত কুমার আইন, বি, এল।
১৭. মৌলভী, আবদুর রহিম খান চৌধুরী।
১৮. মৌলভী, সাহাবউদ্দিন আহম্মেদ, বি, এল।
১৯. মৌলভী, আফাজ উদ্দিন আহম্মেদ, বি, এল।
২০. মৌলভী, খন্দকার আবদুল হালিম, বি, এল।
২১. মৌলভী, আবদুল ওদুদ চৌধুরী, বি,এ, এল,এল,বি।
২২. মৌলভী, ফজলুল হক।
২৩. মৌলভী, আইন উদ্দিন আহম্মেদ।
২৪. মৌলভী, গোলাম আহম্মেদ, সিদ্দিকী।

২৩-০১-২৪ থেকে ১৯-০৮-২৭

১. খান বাহাদুর মৌলভী মো ঃ ইসমাইল, বি.এল।
২. খান সাহেব মৌলভী সাহেব আলী।
৩. খান সাহেব মৌলভী খন্দকার রুস্তম আলী।
৪. রায়বাহাদুর শশধর ঘোষ, বি, এল।
৫. রায়বাহাদুর চন্দ্রকিশোর কর।
৬. রায়সাহেব উমেশ চন্দ্র চাকলাদার ।
৭. সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।
৮. মহকুমা প্রশাসক,নেত্রকোনা।
৯. মহকুমা প্রশাসক জামালপুর।
১০. মহকুমা প্রশাসক টাঙ্গাইল।
১১. মহকুমা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ।
১২. লেঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন।
১৩. মৌলভী মোসলেহউদ্দিন আহমেদ।
১৪. মৌলভী, খন্দকার আবদুল হালিম, বি, এল।
১৫. মৌলভী, সাহাবউদ্দিন আহম্মেদ, বি, এল।

www.pathagar.com

১৬. মৌলভী, শরাফ উদ্দিন আহম্মেদ, বি, এল।
১৭. মৌলভী, আবদুল গনী খান, বি, এল।
১৮. মৌলভী, আবদুল হামিদ চৌধুরী।
১৯. মৌলভী, আবদুল হাকিম খান।
২০. মৌলভী, নাজিরুল হক।
২১. মৌলভী, মাসুদ অলী খান পন্নী।
২২. মৌলভী, সদরুল হোসাইন অহমেদ।
২৩. মৌলভী, মীর আহম্মেদ আলী ।
২৪. মৌলভী, খোশ মাহমুদ চৌধুরী ।
২৫. মৌলভী, তাহের উদ্দিন ।
২৬. মৌলভী, মীর জামাল উদ্দিন ।
২৭. মৌলভী, সাদী আব্বাস ।
২৮. বাবু বসন্ত কুমার আইন, বি, এল ।
২৯. বাবু, রাধানাথ দত্ত ।
৩০. বাবু, দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল, এম, এ, বি, এল ।
৩১. বাবু, অমেন্দ্র নাথ ঘোষ ।
৩২. বাবু, সতেন্দ্র মোহন চৌধুরী ।
৩৩. মৌলভী, রুস্তম আলী আহমেদ ।

২০-০৮-২৭ থেকে ১৩-১২-৩২ পর্যন্ত

১. খান বাহাদুর মৌলভী মোঃ ইসমাইল, বি, এল।
২. খান বাহাদুর মৌলভী সাহাবউদ্দিন।
৩. খান বাহাদুর মৌলভী দৌলাউদ্দিনখান।
৪. খান বাহাদুর মৌলভী আবুল হোসেন।
৫. মৌলভী মোশারফ হোসেন।
৬. মৌলভী, মাসুদ অলী খান পন্নী।
৭. মৌলভী, আবদুল হামিদ চৌধুরী (খান সাহেব)।
৮. মৌলভী, তাহের উদ্দিন আহম্মদ।
৯. মৌলভী, মীর আহম্মেদ আলী ।
১০. মৌলভী, খোশ মাহমুদ চৌধুরী ।
১১. মৌলভী, সাদী আব্বাস ।
১২. মৌলভী, আবদুল বারী খান।
১৩. মৌলভী, মেহের আলী, বি, এল।
১৪. মৌলভী, সৈয়দ আলী, বি, এল।
১৫. মৌলভী, আজিজুর রহমান, এম, এল, সি।

www.pathagar.com

১৬. মৌলভী, করম নেওয়াজ খান, বি, এল।
১৭. মৌলভী, মির্জ্জা উদ্দিন খান।
১৮. মৌলভী, দেওয়ান জহর বখ্‌ত।
১৯. মৌলভী, আবু নাসার মোঃ ওয়াহেদ তালুকদার।
২০. মৌলভী, পীর রেফাজ উদ্দিন।
২১. লেঃ এস, এম হোসেন।
২২. খান সাহেব আবদুল জাব্বার ভূইয়া।
২৩. সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।
২৪. মহকুমা প্রশাসক,নেত্রকোনা।
২৫. মহকুমা প্রশাসক জামালপুর।
২৬. মহকুমা প্রশাসক টাঙ্গাইল।
২৭. মহকুমা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ।
২৮. রায় বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদার ।
২৯. রায় সাহেব চিন্তাহরণ মজুমদার।
৩০. বাবু পদ্মিনী মোহন নিয়োগী।
৩১. বাবু মোহনী মোহন রায়।
৩২. বাবু কালীপদ মুখার্জী
৩৩. মৌলভী, আবদুল খালেক-আল-মজিদী।

১৪-১২-৩২ থেকে ২৭-০৮-৩৭

১. রায় বাহাদুর উমেশ চন্দ্র চাকলাদার।
২. মৌলভী, আবদুল হামিদ চৌধুরী।
৩. খান বাহাদুর মৌলভী, সরাফউদ্দিন আহমেদ, বি, এল।
৪. খান সাহেব নূরুল আমীন, বি, এল।
৫. মৌলভী, মোঃ হোসেন আলী।
৬. মৌলভী, মোঃ আবদুল করিম খান।
৭. মৌলভী, দুলালউদ্দিন খান।
৮. বাবু গীরিন্দ্র কে, রায়, চৌধুরী।
৯. মৌলভী, আলাউদ্দিন তালুকদার।
১০. মৌলভী, আমীর উদ্দিন চৌধুরী, বি, এল।
১১. বাবু কেদার নাথ মজুমদার।
১২. মৌলভী, আবদুল গনী খান, বি, এল।
১৩. মৌলভী, হামিদ উদ্দিন আহমেদ, বি, এল, খান সাহেব।
১৪. মৌলভী, এ, এফ,নূরউল্যাহ, বি এ।
১৫. মৌলভী, শরাফ উদ্দিন আহমেদ।

www.pathagar.com

১৬. মৌলভী, সাহেব আলী খান, এম, এ।
১৭. মৌলভী, মোশারফ হোসেইন, বিএ।
১৮. মৌলভী, এ, কে, রাফাত উদ্দিন তালুকদার।
১৯. মৌলভী, খোরশেদ আলী খান, বিএ।
২০. মৌলভী, দেওয়ান জাব্বার বখ্‌ত।
২১. মৌলভী, শরাফ উদ্দিন আহম্মেদ।
২২. মৌলভী, আবদুল গনী বেগ।
২৩. সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।
২৪. মহকুমা প্রশাসক,নেত্রকোনা।
২৫. মহকুমা প্রশাসক, জামালপুর।
২৬. মহকুমা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
২৭. মহকুমা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
২৮. খান বাহাদুর কবির উদ্দিন খান, বি, এল।
২৯. বাবু রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
৩০. বাবু অশ্বিনী কুমার বোস, বিএ।
৩১. বাবু পদ্মনী মোহন নিয়োগী।
৩২. বাবু দূর্গাপ্রসাদ বল।
৩৩. জনাব আই, এস, কে গজনভী।

www.pathagar.com

২৮-০৮-৩৭ থেকে নির্বাচিত/ জেলা বোর্ড সদস্যগণের নামের তালিকা No. 26 T.L.S.G. Dated 14.5.37. vide Calcutta Gazette dated 20.5.37-page-1293 (ক্রমিক১-২২ নির্বাচিত, ২৩-৩৩ মনোনিত)ঃ

১	খান সাহেব নূরুল আমীন, বি, এল।	সদর।	সাধারণ।
২	মৌলভী, গিয়াস উদ্দিন পাঠান, বি, এল।	সদর।	সাধারণ।
৩	মৌলভী, আব্বাস আলী আহমেদ, বি, এল।	সদর।	সাধারণ।
৪	মৌলভী, ওয়াইজউদ্দিন আহমেদ।	সদর।	সাধারণ।
৫	খান সাহেব হামিদ উদ্দিন আহমেদ, বি,এল।	কিশোরগঞ্জ।	সাধারণ।
৬	খান সাহেব আবদুল অদুদ চৌধুরী, এল, এল, বি।	কিশোরগঞ্জ।	সাধারণ।
৭	মৌলভী, এ, এফ, এম নূরউল্যাহ, বিএ।	কিশোরগঞ্জ।	সাধারণ।
৮	মৌলভী, আবদুস সামাদ তালুকদার, বি, এল।	নেত্রকোনা	সাধারণ।
৯	মৌলভী, দেওয়ান জাহের বখ্‌ত।	নেত্রকোনা	সাধারণ।
১০	মৌলভী, আবদুল গনী বেগ।	নেত্রকোনা	সাধারণ।
১১	মৌলভী, রমিজ উদ্দিন।	জামালপুর	সাধারণ।
১২	মৌলভী, আবুল হোসাইন।	জামালপুর	সাধারণ।
১৩	মৌলভী, আবদুর রশীদ।	জামালপুর	সাধারণ।
১৪	খান সাহেব আবদুল হামিদ চৌধুরী এম, এল, সি	টাঙ্গাইল।	সাধারণ।
১৫	মৌলভী, আলাউদ্দিন তালুকদার।	টাঙ্গাইল।	সাধারণ।
১৬	মৌলভী, খন্দকার আজিজুর রহমান বি,এল।	টাঙ্গাইল।	সাধারণ।
১৭	মৌলভী,সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী,এম, এল,এ।	টাঙ্গাইল।	সাধারণ।
১৮	বাবু দূর্গাপ্রসাদ বল।	সদর।	বিশেষ।
১৯	বাবু পরেশচন্দ্র নন্দী, এম,এ, বিএল।	কিশোরগঞ্জ।	বিশেষ।
২০	বাবু লক্ষণ চন্দ্র দাশ, বিএল।	নেত্রকোনা।	বিশেষ।
২১	বাবু উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল।	জামালপুর।	বিশেষ।
২২	বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এল	টাঙ্গাইল।	বিশেষ।
২৩	সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ।	মনোনিত।

www.pathagar.com

২৪	মহকুমা প্রশাসক,নেত্রকোনা।	নেত্রকোনা।	মনোনিত।
২৫	মহকুমা প্রশাসক জামালপুর।	জামালপুর।	মনোনিত।
২৬	মহকুমা প্রশাসক টাঙ্গাইল।	টাঙ্গাইল।	মনোনিত।
২৭	মহকুমা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ।	কিশোরগঞ্জ।	মনোনিত।
২৮	খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দিন হোসাইন,এম,এল,,সি।	–	মনোনিত।
২৯	মৌলভী,মির্জা আবদুল হাফেজ,বি,এল,এম, এল,এ।	–	মনোনিত।
৩০	আবুল হোসাইন আহমেদ, এম, এল, এ।	–	মনোনিত।
৩১	রায় বাহদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার।	–	মনোনিত।
৩২	বাবু অমৃতলাল মন্ডল, এম,এল,এ।	–	মনোনিত।

চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ (উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদায়)ঃ

১ জনাব মোঃ এমদাদুল হক

২ জনাব মোঃ নূরুল আমিন খান পাঠান এম.পি.

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব)ঃ

১	জনাব সুলতান আলম	২০-০৩-২০০১ - ২১-১০-২০০১
২	জনাব এ. বি. এম. আবদুস সাত্তার	২১-১০-২০০১ - ২৪-০৪-২০০২
৩	জনাব মোঃ সাইদুল হক ভুঁইয়া	২৪-০৪-২০০২ - ০৮-১২-২০০২
৪	জনাব সফিকুল আলম	২২-০২-২০০৩ - ০৬-০৪-২০০৩
৫	জনাব নজরুল ইসলাম	১১-০৬-২০০৩ - ০৩-১১-২০০৪
৬	জনাব সুলতান আলম	২১-১১-২০০৪ - অদ্যাবধি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লোকাল বোর্ডকেই প্রথমে স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু, আইন পাশের পর জেলা বোর্ডকেই গণ্য করা হতে থাকে স্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক স্তর হিসেবে। লোকাল বোর্ড জেলা বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কোনো কর ধার্য করতে পারতো না। জেলা বোর্ডের কালেক্টরই জেলা বোর্ডের তাবৎ কর্মকান্ড সম্পাদন করতেন। জেলা বোর্ডের সদস্যগণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না কিংবা তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না। জেলা সম্পর্কেও তাঁদের খুব একটা জ্ঞান ছিলো বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সীমিত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে জেলা বোর্ড উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে বেশ অসুবিধার মুখোমুখি হতো। জেলা বোর্ডই প্রশাসনিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জেলা কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বুনিয়াদী গণতন্ত্র

www.pathagar.com

প্রবর্তিত হয়। আর এই বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ফলশ্রুতিতেই জেলা বোর্ডগুলো জেলা কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়। জেলা কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে ছিলো থানা কাউন্সিল ও ইউনিয়ন কাউন্সিল। জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলা কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত হয়েছিলো ঢাকা বিভাগের কমিশনারের উপর। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। চেয়ারম্যানই বুনিয়াদী গণতন্ত্রে নির্বাহি ক্ষমতার অধিকারী হতেন। ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকেই। কাউন্সিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকতেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত জেলা কাউন্সিল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। ১৯৭২ সালে পাশ হয় 'বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এন্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটিজ (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার'। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে ২০ জানুয়ারি থেকে আগের সকল স্থানীয় সংস্থা বাতিল হয়ে পড়ে। জেলা কাউন্সিল রূপান্তরিত হয় জেলা বোর্ডে।

১৯৭৬ সালে জেলা বোর্ড জেলা পরিষদে রূপান্তরিত হয়। এটি করা হয় লোকাল গভর্ণমেন্ট অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী। একটা সময় পর্যন্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হন জেলা প্রশাসক। তারপর জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান করা হয়। তিনি উপমন্ত্রীর পদ মর্যাদা ভোগ করতেন।

পরবর্তীতে, আবার জেলাপ্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হন। এর পর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর জেলা পরিষদের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। এখনও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপরই জেলা পরিষদের সার্বিক দায় দায়িত্ব ন্যস্ত । তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

জেলা পরিষদ গঠিত হয় সরকারি সদস্য, নির্বাচিত সদস্য এবং মহিলা সদস্যদের নিয়ে। গঠনের পর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন থেকে জেলা পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী জেলা পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। জনস্বার্থে জেলা পরিষদ কাজ করে। যাতায়াত অবকাঠামোর উন্নয়ন তথা রাস্তা–ঘাটের সংস্কার, নতুন রাস্ত া–ঘাট নির্মাণ, সেতু, পুল, কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, বেসরকারি সাধারণ ফেরিসমূহ নিয়ন্ত্রন ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারির ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি, শিল্প ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করা, কৃষিজাত এবং কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি জেলা পরিষদের কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।

এ প্রসঙ্গে আমরা জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যক্রম ও দায়িত্বের প্রসঙ্গটি অবতারণা করতে পারি। জেলা পরিষদের ঐচ্ছিক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে– (১) শিক্ষা (২) শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি (৩) সমাজ কল্যাণ (৪) জনস্বাস্থ্য (৫) অর্থনৈতিক কল্যাণ (৬) সাধারণ উন্নয়ন কার্যক্রম।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য

ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যে মানব-মানবীর স্বাধীন প্রণয়সাধনা তথা মুক্ত জীবনাকাঙ্খা চরিতার্থ করার সহজাত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এজন্যে লোক সাহিত্যের চরিত্র সমূহের জীবন সংগ্রাম আমাদের সামনে সৌন্দর্যের দীপ্তিতে ও প্রণয় গভীরতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ ময়মনসিংহের লোক সাহিত্যের স্বর্ণখনি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গীতিকাসমূহে যে জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটেছে-এক কথায় তা অভূতপূর্ব। জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্মিলন-সন্ধান গীতিকাসমূহের আত্মার ধ্বনিপুঞ্জ হয়ে ওঠেছে। এতে ব্যক্তি-আশ্রয়ী ধর্ম-বোধ বিচ্ছিন্ন প্রণয়াকাঙ্খা এবং সে আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্যে যে জীবন সংগ্রাম সেই জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রণয়ের শক্তিই প্রমাণিত হয়েছে। সামাজিক সাম্যের অনুপস্থিতি প্রণয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যাও সংকট তৈরি করে, সেই সমস্যা ও সংকটের পার্শ্বচিত্র যেনো গীতিকাসমূহ। গীতিকাসমূহে স্বাভাবিক ভাবেই ময়মনসিংহ অঞ্চলের নৈসর্গিক, ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক পরিবেশ উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি-অভীলিপ্সার উৎসারণ ঘটেছে। গীতিকাসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ময়মনসিংহের লোক সঙ্গীতের কথাও এ প্রসঙ্গে বলতে পারি। মেয়েলী গীত, ছড়া, জারীগান, 'হাইর' বা সারি গান, গাড়ু বা ঘাটু

www.pathagar.com

গান, বারমাস্যা বা বারমাসী, বাউলগান, লোকায়ত শিল্পকলা ইত্যাদিও ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে যে সমাজচিত্র বিবৃত হয়েছে, তার গুরুত্বও কম নয়। গীতিকাসমূহের উদ্ভব-কাল, ভাষা, কাহিনী নির্বাচন, ঘটনা বিন্যাস শিল্পিত মানে উন্নীত। গীতিকাসমূহে নারী চরিত্র সমূহের প্রেমের দুর্জয় শক্তি এবং আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ পবিত্রতা আমাদের সক্রিয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে আমরা মযহারুল ইসলামের মন্তব্য মনে করতে পারি। তিনি বলেছেন-"বাংলা লোক কাহিনী গুলোকে যদি বাঙালীর কল্পনার রঙীন আলোকে রঙীন বলা চলে, তবে ময়মনসিংহের গীতিকাগুলোকে বলতে হয় সমাজের বাস্তব জীবনালেখ্য"। মযহারুল এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন- 'বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয়োন্মুখ নারীর জীবনে সমাজের স্বৈরাচারের ফলে যে দুর্দৈব নেমে এসেছে, গীতিকাগুলি যেন তারি মর্মবেদনায় মুখর। দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন- 'পালাগানের অধিকাংশই ময়মনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চালিয়া গিয়াছে-সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন'।

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-'ইহার জীবন বাস্তব, জগৎসত্য ও ভাষা জীবন্ত'। আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য-'এমন একটা যুগছিল যখন গীতিকা তৈরীর পেছনে একটা সামাজিক প্রেরণা ছিল। কোন একজন গায়ক একটি গীতিকা তৈরী করাতেন সামাজিক প্রয়োজনে। সামাজিক প্রয়োজনেই তাতে নানা পাঠভেদ ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠতো। এ সমাজ ছিল গ্রামীণ-এর সংস্কৃতিও ছিল গ্রামীণ'।

গীতিকাগুলোতে সমাজের শাসক ও শোষকের ভূমিকা বিধৃত হয়েছে। আন্তরিক প্রণয়াবেগ, মানবীয় ঔদার্য, সংবেদনশীলতা, উন্নত চরিত্র গীতিকাসমূহে ভাষা পেয়েছে। 'মহুয়া', 'দেওয়ান-ভাবনা' 'মলুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা' 'রূপবতী', 'কমলা', 'মৈষাল বন্ধু', 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', 'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি', 'ভেলুয়া', 'আন্ধা বন্ধু', 'বীর নারায়নের পালা' 'কাজল রেখা', 'বারতীর্থের গান', 'মুকুট রায়', 'রতন ঠাকুরের পালা', 'রাজা রঘুর পালা', 'ভারইয়া রাজার কাহিনী', 'শ্যাম রায়', 'জীরলেনী', ইত্যাদি গাঁথায় আত্মত্যাগ, প্রণয়াবেগ, সংবেদনশীলতার পাশাপাশি শাসক-শোষকের ঘৃণ্য চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। শাসক চরিত্রে রূপলালসা ও নিগ্রহপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতেও আমরা দেখেছি। নারীঅপহরণ প্রসঙ্গও এসেছে বিভিন্ন গাঁথায়। কোন কোন গাঁথায় কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা, কৌশলপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। সাহসিকতা, বীরত্বের পরিচয় কমবেশী সব গাঁথায়ই পাওয়া যায়।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উল্লেখযোগ্য একটি পালা মহুয়া'। এর ছত্র সংখ্যা ৭৭৫। কোন কোন সমালোচকের মতে মহুয়া পালাটি সমাজজীবনে ঘটা অনুরূপ কোন ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। নদ্যার ঠাকুরের প্রতি প্রেমাবেশ মহুয়ার হৃদয়কে বিচলিত করেছে।

www.pathagar.com

পালংসই-এর সঙ্গে মহুয়ার কথোপকথন 'মহুয়া' পালার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পালংসই মহুয়ার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। পালংসই চরিত্রটি অনেক বাস্তব সম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। পালংসই মহুয়াকে বলেছে -

'বরাক্ষণের পুত্র ঠাকুর
তরে না লইব ঘরে।
জাইনা শুইনা কিসের লাইগ্যা
মন দিলি তুই তারে'।

নদ্যার ঠাকুরের প্রেম সম্পর্ক জাত-পাত সংস্কারহীন ও মোহমুগ্ধ প্রণয়ের প্রসঙ্গ এসেছে 'মহুয়া' পালায়। এ পালায় আমরা দেখি নদ্যার চাঁদের প্রতি মহুয়ার ভীষণ ক্রোধ। সে নদ্যার ঠাকুরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে নদ্যার চাঁদকে হত্যা করতে পারেনি। মহুয়া চরিত্রটি বেশ শক্তিমত্তা নিয়ে হাজির হয়েছে এ পালায়-

'গর্জিয়া উঠে কালা দেওয়া হাতে লয়্যা ছুরি।
মহুয়া বাইর করিল তার বঙ্কালের ছুরি।।
ছুরি হাতে গর্জন করে মহুয়া বলে-
খাড়া থাকো কালা দেওয়া, খাড়া থাকো বাস।
আইজ আমি ঘুচাইবাম আমার জন্ম জন্মের পাপ'।

বুদ্ধিমত্তা মহুয়া চরিত্রের তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি। মহুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। মহুয়া চরিত্রটি সব সময়ই সক্রিয়। সব সময়ই সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। মহুয়া চরিত্রে প্রণয়ধর্মে একনিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা, নীতিনিষ্ঠা, আশাবাদিতা মানবীয় রসে অভিসিক্ত। মহুয়া চরিত্রের আত্মত্যাগ ও প্রেমনিষ্ঠা তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। মহুয়াকে কেন্দ্র করেই গাঁথার অন্যসব চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। মহুয়ার প্রতি প্রণয়বাসনা ব্যক্ত করতে গিয়ে নদের চাঁদ গৃহ ত্যাগ করেছে। প্রণয়বাসনায়ও সে একনিষ্ঠ। সকল চরিত্র গতিশীল হয়েছে মহুয়াকে কেন্দ্র করে। নাদের চাঁদ 'মহুয়া' পালার নায়ক হলেও মহুয়া চরিত্রের তুলনায় অনুজ্জ্বল।

মহুয়ার অনুরাগে সে বাবা মা, পরিবার পরিজন গৃহ , প্রতিপত্তি-কূলমর্যাদা ত্যাগ করে পথবাসী হয়েছিলো। কাহিনীকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে মহুয়া বেদেনীর সক্রিয়তা লক্ষ্য করার মতো।

'মহুয়া' গাঁথায় গীতিকাব্যের উপাদানের পাশাপাশি মহাকাব্যিক উপাদানও রয়েছে। চিত্রময়তা, দৃশ্যময়তা, সংলাপধর্মীয়তা, নাটকীয়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিপুল ঘটনাপ্রবাহ সুবিন্যস্ত হয়েছে 'মহুয়া' পালায়। 'মহুয়া' পালার আখ্যানভাগ গঠনে জ্যামিতিক নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। প্রণয় সম্পর্কের ব্যাপারটি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রণয়বাসনা এখানে মহুয়া

www.pathagar.com

প্রেমের আদর্শে পল্লবিত হয়েছে। 'মহুয়া' গাঁথার পরিণতি বিয়োগান্তক। প্রকৃতির ভূমিকাও 'মহুয়া' গাঁথায় গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির ভূমিকা কেবল মহুয়া গাঁথায় নয়। প্রকৃতি 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র সব গাঁথার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র গাঁথা সমূহের বিভিন্ন চরিত্র প্রকৃতিকে আহ্বান, প্রকৃতির সহায়তা প্রত্যাশা করেছে।

'মলুয়া' পালার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রেমধর্মিতা। আগেই বলা হয়েছে যে, 'মলুয়া' গাঁথার পরিণতি বিয়োগান্তক। সমাজ যে মারাত্মক পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন-সেখানে পশ্চাৎপদতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারী-হৃদয় পর্যুদস্ত হবে এটিই স্বাভাবিক। মলুয়াকে তাই তার অচরিতার্থ আকাঙ্খা নিয়ে সর্বচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, আত্মহত্যা করতে হয়েছে। মলুয়া চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যকেও মলুয়ার পরিণতির জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না। গাঁথার ট্র্যাজিক পরিণতি সৃষ্টির জন্যে সমাজে ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবই কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সমালোচকের মন্তব্য সামনে আনতে পারি-'একটি নারী চরিত্রের অন্তর্মুখী শাশ্বত সংস্কার ও আর একটি হিন্দু সমাজের বহির্মুখী অনুশাসন এই সংঘাতই এই কাহিনীর ট্রাজেডির মূল্য'। মলুয়া চরিত্রের বিয়োগান্তক পরিণতির জন্যে আমরা তাই সামন্ত অপ-শক্তির উদগ্র লালসা এবং মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতাকে দায়ী করতে পারি।

'চন্দ্রাবতী' 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র উল্লেখযোগ্য একটি পালা। এ গাঁথার জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সংকট আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। প্রণয়াবেগ বশত আবাল্য সাথী চন্দ্রাবতীর প্রতি অনুরাগ জয়ানন্দকে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করে। আমরা লক্ষ্য করি যে, জয়ানন্দ অনুশোচনা-দগ্ধ হয়ে চন্দ্রাবতীর নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলো এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলো। চন্দ্রাবতী চরিত্রে রূপ ও গুণের সমন্বয় সাধন হয়েছে। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর প্রণয়ভাজন হয়ে খুব সহজেই নিজের প্রণয়বাসনা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু, চন্দ্রাবতী লজ্জাবশত জয়ানন্দের প্রণয় প্রার্থনার পরও নিজের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেনি। তবে চন্দ্রাবতীর বক্তব্য থেকে অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে-

'ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী'।

চন্দ্রাবতী পিতৃ-আজ্ঞাকে শিরোধার্য করে নিজের হৃদয় বাসনা তথা প্রণয়বাসনা পরিত্যাগ করেছে। মানুষের হৃদয় যে পিতৃ-আজ্ঞা, সমাজ সংস্কার কিংবা ধর্মনিষ্ঠার অধীন নয়, হৃদয় যে মনুষ্য-শরীরের পরিপূর্ণ স্বাধীন-সার্বভৌম এবং স্বশাসিত অঞ্চল, জয়ানন্দের আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়ে তা আবারও প্রমাণিত হলো। আত্মবিসর্জিত জয়ানন্দের মরদেহ দেখে চন্দ্রাবতীর হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো এবং সে হলো উন্মাদিনী।

www.pathagar.com

'চন্দ্রাবতী' গাঁথার পরিণতি বিয়োগান্তক। একদিকে আমরা লক্ষ্য করি, রূপলালসায় মোহাবিষ্ট ও ধর্মান্তরিত যুবক জয়ানন্দের প্রণয়ে-বিশ্বাসঘাতকতার পাশাপাশি ভগ্নমোহ জয়ানন্দের আত্মদীর্ণ অনুশোচনাবোধ। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি- চন্দ্রাবতীর গোপন প্রণয় পাশাপাশি পিতৃচালিত চন্দ্রাবতীর সংস্কারাচ্ছন্ন মন। চন্দ্রাবতীর হৃদয়ের যে আঘাত সে আঘাত কেবল ঘটনার আঘাতেই ক্ষত-বিক্ষত নয়। বরং তা হৃদয়ের প্রণয়বাসনার উপর আর একটি হৃদয়ের আঘাত। আর তাই চন্দ্রাবতীর মানসিক আঘাতের মাত্রাও অপরিসীম। অল্প শোক নয়, অধিক শোকে সে পাথর হয়ে গেছে। বারমাসি দুঃখের কান্নায় সে তাই অশ্রুসজল নয়ঃ-

'না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী'।
(মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা-১১৩)

চন্দ্রাবতীর জন্যে অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু, চন্দ্রাবতী কুমারীব্রত পালন করে। আমৃত্যু কুমারী থাকার সংকল্প ব্যক্ত করার ফলে সব প্রস্তাবই চন্দ্রাবতী ফিরিয়ে দেয়। চন্দ্রাবতী শিবপূজা করার সংকল্প ব্যক্ত করে। এই অবস্থা পাষাণবৎ বললেই যথার্থ বলা হয়। মনের অবস্থার সঙ্গে সাংকেতিক সাযুজ্য রেখে তাই বলা হয়েছে-

'নির্ম্মাইয়া পাষাণশিলা বানাইলা মন্দির।
শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির'॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা-১১৪)

জয়ানন্দের যে প্রণয়, সে প্রণয়কে অস্তিত্বত্ব মূলীভূত প্রণয় বলা যেতে পারে। চন্দ্রাবতীর প্রকৃতি বহিরাঙ্গিক নয়। চরিত্রের অন্তর্গত দুর্বলতাই ট্র্যাজেডিতে করুণ রসকে ঘনীভূত করে তুলেছে। দু'টি সজীবপ্রাণ নির্জীব হওয়ার মধ্যে গাঁথার ট্র্যাজেডির আবেদন।

'দেওয়ানা মদিনা' গাঁথার কেন্দ্রীয় ও নায়িকা চরিত্র মদিনা। এদিক থেকে বিবেচনা করলে দুলালকে নায়ক চরিত্রের মর্যাদা দিতে হয়। কিন্তু, নায়কোচিত গুনাবলী দুলালের চেয়ে আলালের মধ্যেই বেশি। আলাল দূরদর্শী, দৃঢ়চিত্তের অধিকারী, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের জন্যে আলাল চরিত্র উদ্ভাবনার উজ্জ্বল প্রান্ত।

দুলাল পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সহজেই নিজকে মানিয়ে নেয়। এ ধরণের মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতার মধ্য দিয়ে মূলতঃ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের বহিঃ প্রকাশ ছাড়া আর অন্য কিছুই প্রকাশ পায়নি। পালায় চরিত্রসমূহের গতিশীলতা পালাকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রেই নয়, শৈল্পিক সাফল্যের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে। কৃষক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে কৃষক কন্যা মদিনার সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

দুলাল চরিত্রের অন্তর্গত ত্রুটি তাকে বঞ্চিত করেছে নায়কোচিত মর্যাদা থেকে। এই সংকীর্ণতা ও হীনতাই তার পূর্ণ পরিচয়কে ধারণ করেনা। বরং, এতে তাকে খন্ডিত করা হয়। দুলাল চরিত্রের দ্বন্দ্বময়তা তাকে রক্ষা করার পিছনে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে। পুত্রকে বিদায় দিতে গিয়েই সৎ বিবেচনাবোধ জাগ্রত হয়েছে তার মধ্যেঃ

১। দুঃখের দোসর বিধি আমার যে জান।
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরান ॥
সুখের লাগিয়া বিয়া দিচ্ছিল যে তারে ॥

২। বিদায় দিয়া পরানের পুতে চিন্তয়ে দুলাল।
কলিজার লৌ আমার সুরুজ জামাল ॥
নিদয় অইয়া তারে কেমনে দেই ছাড়ি।
কেমনে ছাড়িবাম আমি মদিনা সুন্দরী ॥

'দেওয়ানা মদিনা' গাঁথার উজ্জ্বল চরিত্র মদিনা। প্রণয় বাসনার আদর্শেই তার চরিত্র মহিমান্বিত। মুক্ত প্রণয় আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্যেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রণয়বাসনা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়েই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে তার চরিত্র। জীবনঘনিষ্ঠ প্রণয় ধর্ম এবং প্রকৃতি ধর্ম একাকার হয়ে উঠেছে তার চরিত্রে। গোটা গাঁথারই একটা 'Emotional atmosphere' তৈরি হতে আমরা দেখি। চূড়ান্ত পরিণতির পর কাহিনী অগ্রসর হয়ে শেষ হয়েছে। জীবনের দ্বন্দ্ব আর শিল্পের দ্বন্দ্ব একাকার হয়েছে 'দেওয়ানা মদিনা' পালায়। 'দেওয়ানা মদিনা'র ট্র্যাজিক পরিণতি এ পালার অন্তরাশ্রয়ী আবেদনে সার্থকতামন্ডিত হয়ে উঠেছে। মদিনার মৃত্যুর পর দুলাল নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাদগ্ধ হয়। সে দেওয়ানির মোহমুক্ত হয় এবং গ্রহণ করে মোহমুক্ত সন্ন্যাস জীবন। 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় ঘটনার পরিণতির জন্যে মদিনাই কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে আলাল তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি। এ পালায় এক ধরনের জিঘাংসাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মদিনার প্রতি দুলালের অবাল্য প্রণয়। জীবনের অস্তিত্বের গভীরতম প্রয়োজন এ পালায় ভাষা পেয়েছে। সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠায় মদিনা অনন্য। ব্যক্তিত্বময় ও মানবিক ঔদার্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছে মদিনা চরিত্র। নবলব্ধ সামাজিক মর্যাদার স্ফুরণ ঘটেছে 'দেওয়ানা মদিনা' পালায়। পতির প্রতি মদিনার বিশ্বাস এবং আশাবাদ গভীর প্রণয়াবেগেরই ফলশ্রুতি।

গাঁথার ঘটনা বিন্যাসে চরিত্র চিত্রের প্রকৃতিসংলগ্নতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আগেই বলা হয়েছে যে, ঘটনার পরিণতির জন্যে মদিনা-দুলাল কাহিনীই মুখ্য, আলাল সেখানে অনেকটাই নিস্প্রয়োজনীয়।

'দেওয়ানা মদিনা' পালায় দেওয়ান সোনাফরের চরিত্রটি অপূর্ব পত্নীপ্রেম, সন্তান বাৎসল্য এবং সততা ও নিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্যসব চরিত্রের চেয়ে মদিনা চরিত্রে অতিরিক্ত কিছু গুণ বিদ্যমান রয়েছে। আলালের মধ্যে আমরা দেখি

www.pathagar.com

বিমাতার ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ এবং রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প। সে সব বাস্তবায়নের জন্যে আলাল যে পরিকল্পনা করে তাও নিখুঁত।

'কঙ্ক ও লীলা' ময়মনসিংহ গীতিকার একটি উল্লেখযোগ্য পালা। ঔদার্য ও মানবীয় গুনাবলীর সাথে, অন্য গুনাবলীর দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ ঘটেছে এ পালায়। গগসাধু 'কঙ্ক ও লীলা' পালার মহিমান্বিত চরিত্র। এই চরিত্রে গভীর পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের সমন্বয় ঘটেছে। পাশাপাশি ঔদার্য, মহানুভবতা ও মানবীয় অন্য গুণাবলীর দ্বন্দ্বময় সমন্বয়ও লক্ষ্য করা যায় এ চরিত্রে। এ চরিত্রে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। গগ চরিত্রে আমরা জীবন-ঘনিষ্ঠ মানবীয় উপলব্ধির দেখা পাই ঃ

'কিসের সংসার ঘর কি হবে আমার।
মায়ের বিহনে আমার সকল আন্ধার ॥
.....
বোধনে প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে।
কি কব এ কর্ম্মফল আছিল কপালে।
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও।
শালগ্রাম শিলা যত সায়রে ভাসাও'॥
[ময়মনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা ৩১১]

চরিত্র ও চরিত্রায়ন বিবেচনায় গাঁথার কঙ্ক অত্যন্ত গুনবান। কঙ্কের হৃদয়ে আমরা দেখি দুর্জয় দ্বন্দ্বের উপস্থিতি। কঙ্কের জীবনে সবকিছুর উর্ধ্বে প্রণয়ভাবনাই সত্য হয়ে উঠলো। কঙ্ক চরিত্র সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কঙ্কের পরিচয় গাঁথার কোথাও পাইনা। কঙ্ক দ্বন্দ্বদীর্ণ ও বিচলিত। কঙ্ক প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করলেই আমরা কঙ্কের প্রণয়ভাবনা সত্য হতে দেখি-

'বিচিত্রের মুখে তার বারতা পাইয়া।
শীঘ্রগতি হইয়া কঙ্ক ঘরে আসে ধাইয়া ॥
আসিয়া দেখিল কঙ্ক সব অন্ধকার।
গৃহে না জ্বলবে বাতি সকলি আঁধার ॥
শ্মশানে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচ্চ স্বরে।
শীঘ্রগতি হইয়া কঙ্ক গেল নদীতীরে ॥
বহুকষ্টে চিতা জ্বালি প্রদক্ষিণ করে।
কন্যার লাগিয়া কান্দে হাহাকারে ॥
.....
অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল'।
[ময়মনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা ৩১০-১২]

www.pathagar.com

গাঁথায় লক্ষনীয় বিষয়গুলো-ঘটনার কেন্দ্রীয় ঐক্য। কঙ্কের বাঁশির সুরে যুবতী লীলা কিভাবে আন্দোলিত হয় এবং প্রণয়বাসনা ব্যক্ত করে-তার বর্ণনা এসেছে এভাবে ঃ

'শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জ্বালা।
দন্ডেক অদেখা কন্যা না হও উতলা' ॥
[ময়মনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা ৩৭৪]

'কঙ্ক ও লীলা'র করুণ ও বিয়োগান্ত্মক পরিণতির জন্যে কঙ্ক ও লীলা উভয়েই দায়ী। লীলার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ববোধে হাহাকার করেছেন সাধু। তাঁর হাহাকার ও বেদনার সঙ্গে আমরাও একাত্ম না হয়ে পারি না। দক্ষ কূটনীতিক ও লড়াকু বৈশিষ্ট্যের জন্যে গগ সাধু চরিত্র বেশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে। 'কঙ্ক ও লীলা' গাঁথার ট্রাজিক আবেদন মূলতঃ অন্ত্মরাশ্রয়ী। গগ সাধুর অন্ত্মর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র বৈশিষ্ট্যও এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এ গাঁথায় কঙ্ক হয়েছে দেশান্ত্মরিত এবং অকালমৃত্যু হয়েছে 'লীলা'র। চরিত্রের দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাস আলোচ্য গাঁথার শুরু থেকে অনেক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, মহানুভবতায় চূড়াস্পর্শী হয়ে উঠেছে গগ সাধু চরিত্রটি। গগ সাধু চরিত্রের অনুশোচনাবিদ্ধ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে এভাবে-

'কারে লইয়া দিবরে আমি দেবের আরতি।
কে মোর আন্ধাইর ঘরে জ্বালাইবে বাতি ॥
কে তুলিবে পূজার ফুল ভরিয়া না ডালা।
কি করিয়া শূণ্য ঘরে রহিব একেলা'।
(ময়মনসিংহ গীতিকা পৃষ্ঠা- ৩১০)

লীলার অবর্তমানে গগের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আমরা কঙ্ককে দেখি-

'কিসের সংসার - ঘর কি হবে আমার।
মায়ের বিহনে আমার সকল অন্ধকার ॥
.....
বোধনে প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে।
কি কব এ কর্ম্মফল আছিল কপালে।
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও।
শালগ্রাম শিলা যত সায়রে ভাসাও' ॥
(ময়মনসিংহ গীতিকা পৃষ্ঠা– ৩১১)

ময়মনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত এক পালা 'দেওয়ান ভাবনা'। আন্ত্মরিকতায়, সক্রিয়তায়, সাহসিকতায়, প্রণয়ে, একনিষ্ঠতায়, বুদ্ধিদীপ্ততায়, আত্মত্যাগের মহিমায় 'দেওয়ান ভাবনা' পালাটি মহিমান্বিত। সেই চরিত্রটি এক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গ্রামীণ জীবনের আবহে লালিত ও ক্ষুদ্র-নিচ মানসিকতা সম্পন্ন ঘেরা নামের ব্যক্তির মাধ্যমে সোনাইয়ের দেহসৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে দেওয়ান তাকে অপহরণে উদ্যত হয়েছিলো। সোনাইয়ের সঙ্গে জমিদার পুত্র মাধবের

www.pathagar.com

প্রণয়সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সে দেওয়ানের বিরোধিতা করতে থাকে। অপহরণের আগে তাকে উদ্ধারের জন্যে মাধবের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে সোনাই সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলো। আত্মবিসর্জনের ঘটনায় সোনাই চরিত্রের গৌরবময়তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিলো। সোনাই আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো পতি ও প্রণয়াকাঙ্খী মাধবের জীবন রক্ষার জন্যে। স্বামীর জীবনরক্ষায় স্ত্রীর আত্মবিসর্জন নিঃসন্দেহে মহিমান্বিত ব্যাপার। মাধব চরিত্রে সাহসিকতা, বীরত্ব ও পৌরুষের সুসমন্বয় ঘটেছে। এ চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছিলো। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলো মাধব। সোনাইয়ের জন্য তার নিজের ও পরিবারের উপর নিপীড়নের খড়গ নেমে এসেছে জেনেও মাধব তার স্ত্রী ও প্রণয়ীকে নিরাপদে রেখে নিজেই বিপদ মোকাবেলা করেছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠা, বিশ্বস্তুতার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় মাধব চরিত্রে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী এগিয়েছে ক্ষিপ্ত গতিতে, বাধাগ্রস্ত হয়ে থমকে দাঁড়ায়নি কোথাও। গল্প গ্রন্থনে একমুখী গতি লক্ষ্য করা যায়।

সোনাইয়ের মহিমান্বিত আত্মবিসর্জন গাঁথায় ট্র্যাজিক পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে। আত্মদানের বীরাঙ্গনা মূর্তি পাঠকের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। শাসকশক্তির রিরংসাবৃত্তি এবং তজ্জনিত নিপীড়নমূলক আচরণ গাঁথার চরিত্রসমূহকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো।

'রূপবতী' গাঁথার বিশিষ্টতা হচ্ছে রূপকধর্মিতা। এই রূপকধর্মিতার পাশাপাশি ধর্মনিষ্ঠাও এ গাঁথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রূপবতীর যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো চিত্র কিংবা যুবতীর যৌবনধর্মের কোনো আচরণই গাঁথায় অঙ্কিত হয়নি।

এ গাঁথার মদন চরিত্রটি নায়ক হিসেবে অস্পষ্ট এবং ব্যক্তিত্বহীন। রাজা মুসলমান নবাবের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে নারাজ। কন্যাকে গৃহভৃত্যের কাছে বিয়ে দিয়ে দূর দেশে প্রেরণ করে। মদনের রূপবতীর সঙ্গে একত্রে বস-বাসের আগে তার মধ্যে কোনো সক্রিয়তাই দেখা যায় না। বনবাসেও সে নিজের স্ত্রীকে গৃহভৃত্যের মতো পরিচর্যা করার আগ্রহ পোষণ করে। এ গাঁথায় সুন্দরী নারীর অনুসন্ধান লাভ এবং তাকে হস্তগত করার লালসা দীনহীন আচরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে নবাব চরিত্র।

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্য নায়িকা চরিত্রের সঙ্গে রূপবতী চরিত্রটি ঠিক মেলে না। অন্যসব নায়িকার মতো জীবনতৃষ্ণাও তার মধ্যে প্রবল নয়। কাতরতা থেকে মুক্তি পাবার কোনো সক্রিয়তাই তার মধ্যে দেখা যায়না। এ গাঁথায় দুই নারী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গাঁথার রসনিস্পত্তিও প্রশ্নাতীত নয়। গাঁথার আখ্যানভাগে আমরা যে মিলনাত্মক পরিণতি লক্ষ্য করি, তাকে ঠিক সমগ্র কাহিনীর মৌল প্রেরণার সঙ্গে মেলানো যায়না। গাঁথার মিলনাত্মক পরিণতিও আরোপিত। গাঁথার কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই এর স্বাভাবিক পরিণতি সম্ভব কি না এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

'ময়মনসিংহ গীতিকায়' অনেক গাঁথা ও পালা রয়েছে। এসব গাঁথা ও পালায় চরিত্র অঙ্কিত হওয়ার পাশাপাশি জন সমাজের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার

www.pathagar.com

প্রণয় আকাঙ্খা জাগ্রত হওয়াই শেষ কথা নয়, বরং জনসমাজের গতি প্রকৃতি তুলে আনার ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ গীতিকার রয়েছে অভাবনীয় ভূমিকা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ গীতিকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯২৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০টি পালা নিয়ে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। একই বছর মৈমনসিংহ গীতিকার ইংরেজি অনুবাদ 'Eastern Bengal Ballads Mymensingh' প্রকাশিত হয়।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলোতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এই পালাগুলোতে যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষার কাব্যরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, তা বলাই বাহুল্য।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলোতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্থান-কাল-পাত্র তথা ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশের পরিচয় বিধৃত হয়ে উঠেছে। কাহিনীসমূহের চরিত্র এবং চরিত্রসমূহের মুখের ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ এবং প্রয়োগও ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষার প্রতিধ্বনী। পালাগুলো যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিদেরই রচিত এ নিয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। পাশাপাশি এ-ও বলা যায় যে, পালাগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলের গায়েন কর্তৃক সাধারণ মানুষের চিত্তবিনোদনের উপযোগী করে রচিত।

একটি তথ্য উল্লেখ না করলেই নয় যে, পালাগুলো চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে দীনেশ চন্দ্র সেনকে দিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী এবং চন্দ্র কুমার দে'র প্রতিবেশী রওশন ইয়াজদানীর বক্তব্য এক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন-

'ময়মনসিংহ গীতিকায় সংগৃহীত পালাগান সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন ভুল ধারণা নেই। আমারই প্রতিবেশী চন্দ্র কুমার দে যেখানে যেমনটি শুনেছিলেন, কাহিনী ঠিক তেমনটিই সংগ্রহ করেছিলেন। তবে দু'একটি পালার নামকরণে অনধিকার হাত দেওয়া হয়েছে, একথা চন্দ্র কুমার দে জীবদ্দশায় তাঁর বাড়িতে বসেই স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছিলেন; যেমনঃ-'বাদিয়ানীর পালা'র 'মহুয়া' নামকরণ অথবা 'উনার বাইদ্যা'কে 'হুমরা বেদে' বলে উল্লেখ, 'আলালের দুলাল' পালার দেওয়ানা মদিনা নামকরণ ইত্যাদি। মৈমনসিংহ গীতিকায় ময়মনসিংহের বিচিত্র জনজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এতে নিত্যদিনের জীবনাচারণ,উচ্চারিত ভাষা কাঠামো যে ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনজীবন ও ভাষারই প্রতিনিধিত্ব করে সে সম্পর্কে বলার অবকাশ থাকে না।

জনশ্রুতিমূলক কাহিনী বা কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করেই 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা'র গাঁথাগুলো গড়ে উঠেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালাসমূহ এভাবেই রচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো এই পালাগুলোও লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত। তবে পালাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে এবং মতানৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। ডঃ আহমদ শরীফ মৈমনসিংহ গীতিকার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। পালাগুলোর সময়কাল নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। পালাগুলো কবে কখন থেকে রচিত হয়ে জনমুখে প্রচলিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে-সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এসব পালায় চিত্রিত জনজীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপ দেখে আমরা বলতে পারি যে, পালাগুলোতে আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব প্রত্যক্ষ। এ প্রভাব থেকে পালাগুলোর প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় কাহিনীর যে পরিণত রূপ পাওয়া যায়, তা অনেক দিনে সৃষ্ট হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করেই পালাগুলো পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেছে। মৈমনসিংহ গীতিকায় শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্য সংস্কার ও বিশ্বাসও উঠে এসেছে পালাসমূহে। কৃষিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন পালাগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পালাগুলোতে শাসকশ্রেণীর প্রণয় বাসনায় আন্তরিকতার অভাব, হৃদয়জ গভীরতার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্খাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় মানুষের যে জীবন ও সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের বিষয়বস্তু অবলম্বন থেকে অনেকটা পৃথক প্রকৃতির। মৈমনসিংহ গীতিকায় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকায় গ্রামবাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। নারীর মুক্ত জীবনাকাঙ্খা ও স্বাধীন প্রণয়বাসনার প্রকাশও ঘটেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা যে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত-এ সত্যটিও বিভিন্ন পালায় উঠে এসেছে। বিবাহোত্তর জীবনেও পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি যে নারীর জীবনকে দুর্বিসহ, করুণ ও মর্মান্তিক করে তোলে-এটিও গীতিকায় উঠে এসেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলো বিশেষত্ব লাভ করেছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে, প্রেমের একনিষ্ঠতায়, নারীধর্মের প্রত্যয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তায়, প্রেম-নিষ্ঠায়, ব্যক্তিত্বময়তায়, প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় মৈয়মসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নারী জীবনে প্রেমকাহিনী প্রধান বিষয় হলেও আপামর মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও অভিব্যক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালাগুলো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। হিংসা, ঈর্ষা, রাগ, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা মানুষের প্রবৃত্তির কুৎসিত অথচ বাস্তব দিকই ফুটে উঠেছে মৈমনসিংহ গীতিকায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' পাঠ করলে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, মানুষের জীবনে প্রেম-ভালোবাসা যেমন সত্য, তেমনি সত্য মানুষের জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোও। পালাকারগণ তাদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা বহুমুখী

www.pathagar.com

ও বৈচিত্র্যমুখী চরিত্রগুলোকে দর্শক শ্রোতাদের জন্যে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনা বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে পালাকারগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের গভীরতায় মৈমনসিংহ গীতিকায় সবিশেষ শক্তির পরিচয় রেখেছেন। যা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় সমাজ-শাস্ত্র-মানুষ বিভিন্ন পথে সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। নারীর জীবনে জেগে ওঠা প্রেম শত বিপত্তির মুখেও এগিয়ে চলেছে সামনের পানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। পরিস্থিতির কারণে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলোও নারী প্রধান। মৃত্যুকে বরণ করে নিলেও নায়িকাগণ আপন মহিমাকে ক্ষুন্ন করেনি। নায়িকাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে নায়িকাদের প্রেমেরই বিজয় ঘোষিত হয়েছে। মদিনা ও লীলা নিরবে মৃত্যুবরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজকে তারা ধিক্কার জানিয়ে গেছে। প্রেমাস্পদকে নিয়ে জীবনের সাধ-আহলাদ উপভোগ করতে না পারলেও তাদের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ- অভিযোগ ছিলোনা। নায়িকাদের এক সময় বিশ্বাস ভাঙ্গে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকল প্রতীক্ষা ও যন্ত্রণার অবসান ঘটে।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলোর প্রেক্ষাপট বা ঘটনা কোনো সত্যকে কিংবা প্রচলিত কিংবদন্তীকে ভিত্তি করে রচিত হলেও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রেমের একনিষ্ঠতার জন্যে নারী মৃত্যুর পরও অমর হয়েছে, হয়েছে শক্তিতে বলীয়ান ও মহীয়সী। গীতিকার পালাগুলো ছিলো সব কিছুর উর্ধ্বে। নারীর হৃদয়ের এবং প্রেমের জয়গানে পালাগুলো মুখরিত।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো কখনোই সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নয়। এগুলো জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবেও গড়ে উঠেনি। পালাগুলোতে সর্বস্তরের জনসাধারণের চিত্র ফুটে উঠেছে। আর তাই কৃষি নির্ভর সামন্তবাদী সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রায় সর্বস্তরের জনসাধারণের চিত্রই এখানে ফুটে উঠেছে। একজন নারী বা পুরুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রেক্ষাপটে যতোগুলো ভূমিকা গ্রহণ করে, গীতিকার পালায় তার সবগুলোই আমরা উঠে আসতে দেখি। আমরা তাই বলতে পারি যে, 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সকল স্তরের জীবন সংবলিত বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। একই সঙ্গে এটি জাতীয় সম্পদ। বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে ঘিরে মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। সকল স্তরের মানুষের পরিচয়ও মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় আমরা দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল, শিকারী-জেলে, দাস-দাসী সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায়। পেশাজীবী বিচিত্র মানুষের ও তাদের জীবনাচারণের পরিচয়ও এখানে বিধৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি নির্ভর জীবনে কৃষিজীবী মানুষের ছবি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। লক্ষ্যণীয় এই যে, সামন্তবাদী সমাজ জীবনের এক স্তরে রয়েছে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ, অন্য স্তরে রয়েছে শাসক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণী। প্রত্যেকের কথাই

www.pathagar.com

পালাগুলোতে ঠাঁই পেয়েছে। বিভিন্ন পালার প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলো গ্রাম বাংলার শাশ্বত মানব-চরিত্র, দোষে-গুণে ভরপুর সহজ সরল জীবনাচারণে অভ্যস্থ বলেই তাদের জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও আমাদের আকৃষ্ট করে।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবনে নারীর ভূমিকাই প্রধান। গীতিকার অধিকাংশ পালাই নায়িকাকেন্দ্রিক। আমরা লক্ষ্য করি যে, নায়িকারা পতিব্রত্যে, ত্যাগে, ধৈর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, সরলতায় চিরন্তন বাঙালি নারীর প্রতিনিধি হিসেবেই চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম-বাংলার ঘরে-বাইরেই তাদের বস-বাস। কিন্তু, 'মহুয়া' পালা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। 'মহুয়া' পালা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন-'একমাত্র মহুয়া এই গাঁথা সাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী-ইহা ঘরের নহে, বাহিরেরও নহে'। মহুয়া ছাড়া মলুয়া, মদিনা, লীলা একেবারেই গ্রাম-বাংলার শাশ্বত বাঙালি নারীর স্বরূপে ও মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া' পালায় আমরা দেখি 'নদের চাঁদ' সুখী স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে অভ্যস্থ। জীবিকার জন্যে তার কোনো ভাবনা কিংবা সংগ্রাম নেই। এদিক থেকে অন্যদের তুলনায় সে ব্যতিক্রম। নদের চাঁদ তার সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদার কারণেই অনেকটা নির্বিরোধ আবেগতাড়িত চরিত্র। কোনো ব্যাপারেই গভীর চিন্তার বহিঃ প্রকাশ নেই তার চরিত্রে। সব কিছুই সে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে। নদের চাঁদ সামাজিক বৈষম্যেও বিশ্বাসী নয়। নদের চাঁদ সুখী, নিশ্চিত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। নদের চাঁদের জীবনা চারণ, আবেগায়িত জীবনধারা সব কিছুই স্বসমাজের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। প্রেমে বিশ্বস্থতা এবং প্রেমের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগের মহিমা তাকে নায়কের মর্যাদায় উন্নীত ও মহৎ করেছে।

নদেরচাঁদ কোনোভাবেই সামাজিক বৈষম্যে বিশ্বাসী নয়। সামাজিক চিত্তবিনো দনের প্রতি রয়েছে তার বিশেষ ভাবে আস্থা। নদের চাঁদ ইনাম-বখশিশ দিতেও কার্পণ্য করতো না। এটি সত্য যে, নদের চাঁদ সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রেমের প্রতি বিশ্বস্থতা এবং প্রেমের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগের মহিমা নদের চাঁদকে নায়কের মর্যাদায় উন্নীত ও মহৎ করেছে। পালাকারের মনোযোগও নদের চাঁদের প্রতি খুব বেশি ছিলো না।

মহুয়া চরিত্র সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এখানে আমাদের যা বলবার, তা হচ্ছে-মহুয়া পুরোপুরি ঘরের না হলেও উন্মুল নারী চরিত্রের প্রতিনিধি। মুক্তজীবন ও স্বাধীন প্রণয়ের প্রতি আকাঙ্খায় ব্যাকুল মহুয়া বাঙালি নারীর ঐতিহ্যও কুলমর্যাদাকে মনে রেখে সচেতন থেকেছে। নদের চাঁদের প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সে তার প্রেম প্রকাশ করেনি। 'মহুয়া' প্রেমময়ী নারীদেরই সগোত্রীয়। মহুয়া দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র। এ দ্বন্দ্ব পরিবেশগত, বংশগত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজাত। মহুয়া নির্ভীক এবং তেজস্বী। ভালোবাসার প্রকাশে অতুলনীয়া। মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে সংকটের সমাধান করেছে মহুয়া। প্রেম ও প্রেমাস্পদের প্রতি তার নিষ্ঠার অভাব নেই। প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে

www.pathagar.com

পরিধান করেছে। আর এই মুক্তাহার পরিধান করেই মহুয়া হয়েছে চির বিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে সে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী। নিয়তিলাঞ্ছিত ছিলো মহুয়ার জীবন।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালায় নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য প্রধান-অপ্রধানচরিত্র এবং সমকালীন জনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এসব চরিত্রের গুরুত্বকেও স্বীকার করে নিতে হয়। অনেক অপ্রধান চরিত্রও নায়ক-নায়িকার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে 'মহুয়া' পালার হোমরা বেদের কথা মনে করতে পারি। হোমরা নায়ক না হলেও প্রধান চরিত্রগুলোর একটি। সামাজিক অবস্থান, পেশাগত কারণে হোমরা বেদে কঠোর, রূঢ়, অনুভূতিহীন এবং নির্দয়। তার রয়েছে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দৃঢ়তা, অবিচলতা। গোষ্ঠীগত জীবনে ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতিকে সে প্রাধান্য দেয় না, এমনকি মূল্য দিতেও জানে না। পেশাগত ও ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত জীবনই তার কাছে বড়। সর্দার হোমরার কাছে ব্যক্তি হোমরার হৃদয়ের আবেগ ও স্নেহের উত্তাপ প্রচ্ছন্ন থাকতে দেখা যায়। আমরা তাই হোমরাকে মহুয়া নদের চাঁদের প্রেমের ক্ষেত্রে তীব্রভাবে বিরোধিতা করতে দেখি শুরু থেকেই। নদের চাঁদকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টাও দেখি সর্দার হোমরার মধ্যে। শেষ দৃশ্যে নদের চাঁদকে হত্যা করতে নিষ্ঠুরভাবে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষার ছুরি তুলে দেয় হোমরা বেদে।

গীতিকাসমূহের নাট্যরস (Dramatic Element) আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংঘাতময় নানা অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে এসব গাঁথায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সাধারণ গরিব পরিবারগুলোর গৃহ ও গৃহ পারিপার্শ্ব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে গীতিকাসমূহে। 'মহুয়া' গাঁথায় জমিদার নদের চাঁদ বেদে দলকে বস-বাসের জন্য ভূমি দিলে, সেখানে তারা গৃহ ও বাসোপযোগী পরিবেশ রচনা করে। স্বচ্ছল কৃষক জীবনের পাশাপাশি গরিব অর্ধাহারী-অনাহারী-বস্ত্রহীন কৃষকজীবনের চিত্রও আমরা মৈমনসিংহ গীতিকায় পাই। 'মলুয়া' গাঁথায় চন্দ বিনোদ হত দরিদ্র কৃষক। অবস্থাটা এমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানি হলে তাকে অনাহারে থাকতে হয়। ছিন্নবস্ত্রের কারণে শীতে কষ্টকর জীবন নির্বাহের পাশাপাশি অর্থাভাবে ধর্মকর্ম থেকে নিবৃত থাকতে হয় তাকে ঃ

'উত্তরিয়া শীতে পরান কাঁপে থরথরি
ছিড়া বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুরি ॥
.....
ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা লক্ষ্মীপূজার তরে'॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃষ্ঠা-৪৭)

বিষয়বস্তু ও ভাবগত- উভয়দিক থেকেই ময়মনসিংহের গীতিকাগুলো বাংলা সাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সম্পদ। চরিত্রগুলোর মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো।

www.pathagar.com

লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার সুযোগ নেই। ময়মনসিংহ গীতিকায় অভ্যন্তরীণ জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্যে বিভিন্ন গীতিকায় রচনার সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের চরিত্র ধর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসম্পর্কে আমরা সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য মনে করতে পারি। তিনি বলেছেন- 'সংগ্রামশীল মানবগোষ্ঠীর ঘটনাধীন বিবর্তনশীল জীবনধারার সকল সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করেই লোকসাহিত্য পৃথিবীর সর্বত্র বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহও এর ব্যতিক্রম নয়'।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে প্রণয়াবেগের স্বাধীনতামনস্কতা আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি আমরা প্রত্যক্ষ করি ধর্মীয় অনুশাসনের ঊর্ধ্বে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য। সবকিছু ছাপিয়ে সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব মানবীয় ঔদার্যগুণের পরিচয়ই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের মৌল উপজীব্যঃ বিষয়গত দিক থেকে প্রণয়ভাবনা এবং সুরের দিক থেকে সঙ্গীতময়তা। আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ময়মনসিংহের গীতিকা সমূহের নৈকট্য বেশ প্রত্যক্ষ। আদিবাসী জীবনাবেগ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে গীতিকা সমূহে এসেছে মুক্ত জীবন আকাঙ্খা এবং প্রণয় আকাঙ্খা। এটি বললে মিথ্যা বলা হবে না যে, ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতি ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকায়ত জনজীবনের স্বাধীন প্রণয় আকাঙ্খার দিকে ধাবিত করেছিলো। ময়মনসিংহ গীতিকাসমূহে নারী সমাজের বৈচিত্র্যময় ও স্বাতন্ত্র্যধর্মীরূপ প্রতিফলিত হতে দেখি আমরা।

মৈমনসিংহ গীতিকায় আমরা দেখতে পাই স্ত্রী-প্রধান মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমাজ স্বীকৃত স্বাধীন প্রণয়াধিকার। সে কারণে সঙ্গতভাবে বাল্যবিবাহের পরিবর্তে পরিণত বয়সে বিবাহ উদ্যোগ, স্বামী নির্বাচনে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ বিবেচনাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে দেখি। রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট মৈমনসিংহ গীতিকার ভাবজগত নির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। জীবনে সফলকাম ও দেবতাদের তুষ্টিসাধনের জন্যে যেমন সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি প্রেম সঙ্গীতের উদ্ভবও হয়েছে জৈব প্রয়োজনের তাগিদে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের রোমাঞ্চকর, স্বতন্ত্রধর্মী এবং হার্দ্য অনুভূতিতে উদাসীন ও গীতিময় করে তোলে এমন ভৌগলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাধীন প্রণয়াবেগকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে, গোটা ব্যাপারটি হয়েছে গতিময় ও সংবেদনশীল।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকৃতির ভূমিকা সকল গাঁথায়ই রয়েছে। কেবল মহুয়া গাঁথায় নয়, ময়মনসিংহ গীতিকার সর্বত্রই প্রকৃতির এই ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এসব গাঁথায় জীবন ও সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে প্রকৃতিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিপদকালে তাই প্রকৃতির সান্নিধ্য কামনা করা হয়েছে। মহুয়ার আত্মবিসর্জনে হুমরার কঠিন হৃদয়েও বাৎসল্য ও অনুশোচনা জাগ্রত হয়। 'মহুয়া' পালার ঘটনা মহুয়া চরিত্রকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে আবর্তিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মৈয়মনসিংহ গীতিকায় চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ্য করি যে, চরিত্রসমূহকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে, তাদের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে উপস্থাপন না করে, ইঙ্গিত, সংকেত ও আকর্ষণের তীব্রতা প্রভৃতি উপাদানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর নাটকীয়তা, গীতিধর্মীতা, সংলাপ, দৃশ্য ও চিত্রময়তা।

ময়মনসিংহের বিভিন্ন গীতিকায় আমরা লক্ষ্য করি-কোথাও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ, কোথাও ব্যক্তিমানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিয়োগান্তক পরিণতি, সমাজমানসের সঙ্গে ব্যক্তি-অভীলিপ্সার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব সংঘাতের মর্মমূলে উপাদান হিসেবে নারীর আকর্ষণীয় দেহসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পরও আমরা তার সংগ্রামশীলতা অব্যাহত থাকতে দেখি। মৈমনসিংহ গীতিকার অনেক গাঁথায়ই আমরা লক্ষ্য করি যে, গাঁথার অসম্পূর্ণতার কারণে রসনিষ্পত্তিও সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাঁথার ঘটনাবিন্যাস কেন্দ্রীয় ঐক্যে সুগ্রথিত নয়।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালাগুলো পাঠ করলে আমাদের মনে এই ধারণার জন্ম নেয় যে, সমাজ নিরপেক্ষ মানবীয় অস্তিত্বের ধারণা অমূলক। মানুষের জীবনপ্রবাহ সব সময়ই সমাজ নিরপেক্ষ। সমাজ ও সংস্কৃতির হরিহর-আত্মিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিজীবন উৎসারনেও ব্যাপ্ত হয়ে আছে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন গাঁথা তথা পালাগান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-"পালাগানের অধিকাংশই মৈমনসিংহের কোন কোন যথাযথ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে- সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন"।

গাঁথাসমূহে আমরা লক্ষ্য করি-উচ্চাকাঙ্খা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, ষড়যন্ত্র প্রয়াস, নির্জন প্রিয়তা, মানবীয় ঔদার্য, উন্নত চরিত্রগুণ, আন্তরিক প্রণয়াবেগ, সংবেদনশীলতা দারুণভাবে সক্রিয়। শাসক ও শোষকের ভূমিকায় যেসব চরিত্র অবতীর্ণ, সেসব চরিত্র পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও শাসক সুলভ এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ধারক তারা।

'রাজা রঘুর পালা' মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা। এ পালায় আমরা লক্ষ্য করি- গাঁথার আখ্যানভাগ স্বল্প পরিসরের হলেও এর রয়েছে দু'টি পর্ব। প্রথম পর্বে আমরা দেখি 'ধার্মিক রাজা' তার স্ত্রী বিয়োগের ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে অসহায় ও দুঃখকাতর। এ পর্বে আমরা দেখি- রাজা কর্তৃক প্রয়াত রানী কমলাকে স্বপ্ন-দর্শন,

www.pathagar.com

শিশুপুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে রানীর পরামর্শ দান এবং প্রতি রাতে মৃত রানী কর্তৃক পুত্রকে দুগ্ধদান। প্রভৃতি ঘটনা লোকাতীত ও অতি প্রাকৃত।

দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখি পিতার মৃত্যুর পর শিশুপুত্র রঘুনাথকে অমাত্যবর্গ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে, ঈশা খাঁ তাঁর চিরশত্রু 'ধার্মিক রাজা'র মৃত্যু সংবাদ শুনে এবং অসহায় পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে রঘুনাথের রাজ্য আক্রমণ করে এবং শুধু আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সম্পদ লুটপাট করে এবং শিশু রাজাকে অপহরণ করে। রাজা শিশু হোক আর বৃদ্ধ হোক, রাজা রাজাই। শিশু রাজাকে অপহরণের পর বাজার আনুগত প্রজাগণ তাঁকে উদ্ধার করে ঈশা খাঁর নৌকাতেই দ্রুত চলে যায় সুসং। প্রজাগণের রাজা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে কাহিনীরও শেষ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ গাঁথার কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের যেমন ঐক্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনৈক্য। গাঁথায় গারো জনগণের পরম রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চেক গবেষক দুসান ঝাভিতেল ঐতিহাসিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, রঘুনাথ রাজার বিরুদ্ধে গারো জনগণ বিদ্রোহে মেতে উঠেছিলো এবং সেই বিদ্রোহ দমনের জন্যে রাজাকে দিল্লির বাদশাহের শরনাপন্ন হতে হয়েছিলো ঃ

'.....the famous chronicle Ain-i-Akbari informs us that king Raghunath Sing paid a year's tribute to the Mughal Sultans in Delhi as a recompense for the military help he got when suppressing the revolt of his unloyal subjects from the Garo Hills.'

ময়মনসিংহ অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আদিবাসী জনগণের অধিবাস বেশি। বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়ের শতকরা প্রায় একশ'ভাগ এবং পুরো জনসংখ্যার নব্বইভাগের বস-বাস এখানে। স্বাভাবিকভাবেই এসব আদিবাসীর জীবনাচারণ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এই আদিবাসীদের পরিবর্তনহীন কৃষি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশে তাৎপর্যমন্ডিত ভূমিকা পালন করেছে। ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় আমরা সে সত্যকেই প্রতিফলিত হতে দেখি। জাতিভেদ প্রথা ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকায়ত জীবনকে স্বাধীন প্রণয়াকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

ময়মনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন-'স্থানীয় প্রকৃতি এবং জীবনই ময়মনসিংহ গীতিকার প্রধান উপজীব্য এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চলই ময়মনসিংহ গীতিকার ভূগোল'। প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বয়ম্ভর গ্রামীণ সমাজের নিজস্ব সংকৃতিতে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলো এ অঞ্চল। অন্যান্য গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এ জনপদ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার মধ্যেই এ জনপদের স্বাতন্ত্র্য। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় ময়মনসিংহের গ্রামীণ জীবন বাস্তব রসমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গাঁথাগুলো জনশ্রুতিমূলক বিভিন্ন কাহিনী, সত্য ঘটনা এবং কিংবদন্তীকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মতো পালাগুলোও লোকমুখে রচিত ও প্রচলিত।

পালাগুলোকে অনেকে আবার রূপকথা বলতে আগ্রহী। মৈমনসিংহ গীতিকার নিষ্ঠাবান গবেষক ডঃ আলি নেওয়াজ 'কাজল রেখা' পালাটিকে রূপকথা হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন বলে উল্লেখ করেছেন। বাকি পালাগুলো, 'চন্দ্রাবতীর কাব্য প্রতিভা বিকাশের পর থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবের আমলের কিছুকাল পর পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ ১৬শতকের শেষ দিক থেকে ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে রচিত' বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

গীতিকায় সংকলিত বিভিন্ন পালাগুলো একই সময়ে রচিত নয়। পালাগুলো বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিলো। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই পালাগুলো রচিত হয়েছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র বিভিন্ন পালায় কাহিনীর যে পরিণত রূপ পাওয়া যায়, তা-ও অনেক দিনের সৃষ্টি বলে ধরে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই কাহিনীগুলো পরিণত রূপ লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনে কবে থেকে গীতাভিনয় শুরু হয়- সেটি অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক পেশার স্তরবিন্যাস অর্থাৎ পেশাজীবী বা কর্মজীবী মানুষের স্বরূপটি লক্ষ্য করা যায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে নিজেদের জীবনভিত্তিক গাঁথা রচনার প্রচলন দেখা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাকারদের কাছে ধর্মীয় কোন আদর্শ বা সংস্কার বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাদের সামনে কোনো দেবমূর্তিও ছিলোনা। পালাকারদের রচনায় মানবীয় আবেগ ও মূল্যবোধই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সংঘাত এসেছে কখনো গোষ্ঠীগত আবার কখনোবা ব্যক্তিক চেতনাজাত দ্বন্দ্বের কারণে। এ সংঘাত আবার এসেছে ক্ষমতাবান পুরুষের স্বার্থোদ্ধারজনিত ষড়যন্ত্রের কারণে, আবার কখনোবা সম্প্রদায়ের ভিন্নতার কারণে।

অকৃত্রিমতাই পালাগুলোর প্রধান গুণ বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। কাহিনীভাব, ভাষা, চরিত্র ইত্যাদি সব কিছুই পালাকারগণ সংগ্রহ করেছেন। গাঁথাগুলো সম্পর্কে এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন-'গাঁথাগুলো একাধারে নারী নির্যাতনের ও নারীমহিমার প্রচারকাব্যও। উনিশ শতকের আগে নারীর প্রতি এত শ্রদ্ধা বা মমতা সুলভ ছিল না জীবনে কিংবা শাস্ত্র ও সমাজে'। পালাকারগণ সমাজকে, সমাজের মানুষকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জগত থেকেই কাহিনী নির্বাচন, ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ করেছেন। পালাগুলোতে জীবনবোধের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় সমাজ-শাস্ত্র-মানুষ বিভিন্ন পথে সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে। নারীর জীবনে জাগ্রত প্রেম শত বিপত্তির মুখেও সামনে এগিয়ে চলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। কাহিনীগুলোর প্রেক্ষাপট বা ঘটনা বাস্তব কোন সত্যকে কিংবা প্রচলিত কিংবদন্তীকে

www.pathagar.com

ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কাহিনীর পরিণতিতে জনগণের আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার ছাপ ফুটে উঠেছে। আর এভাবেই কাহিনীও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কাহিনীর চরিত্রসমূহের যে জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে জীবনের জীবন-যন্ত্রণা ও সংকটও প্রত্যক্ষ করি।

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাসমূহ কোনো সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে জনবিচ্ছিন্ন কাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেনি। নারী ও পুরুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও রক্তের বন্ধনসূত্রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের আওতাভুক্ত সবাই এখানে এসেছে। বিচিত্র শ্রেণীর জনজীবনকে কেন্দ্র করেই মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। সামন্তবাদী সমাজের একদিকে এসেছে শাসকশ্রেণী, অন্যদিকে বণিক শ্রেণী। সমাজের উঁচু শ্রেণীর বা অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে পালাকারদের তিক্ততাপূর্ণ অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারী চরিত্রের তুলনায় এসব পালায় পুরুষ চরিত্র নিষ্প্রভ। নারী-পুরুষের সহ অবস্থান থাকলেও সাংসারিক ঐক্য ময়মনসিংহ গীতিকার পালায় নেই।

ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালার চরিত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে জীবন-তৃষ্ণা ও জীবন-আকাঙ্খার ব্যাকুলতা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় যে চিত্রিত জনজীবন, তাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খার যে ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা একান্তভাবেই গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের। মানবীয় জীবনতৃষ্ণায় উজ্জীবিত পালার প্রতিটি চরিত্র। মানবিক চেতনায় সচেতন থেকেই পালাকারগণ চরিত্র চিত্রণ করেছেন। মৈমনসিংহ গীতিকায় মানবীয় বৃত্তি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গীতিকার বিভিন্ন পালায় ব্যক্তিক-জীবন ও ব্যক্তি-অনুভূতি সমৃদ্ধ পালাগুলোর সার্থক রূপকার গীতিকার কবিগণ। পালাকারদের গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি, জীবনবোধ, গভীর জীবনদৃষ্টি ও জীবনোপলব্ধিজাত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট চরিত্র নিয়েই মৈমনসিংহ গীতিকার জনজীবন গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিক-জীবন ওব্যক্তিক-অনুভূতিসমৃদ্ধ পালাগুলোর সার্থক রূপকার হিসেবে গীতিকার কবিগণের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। গীতিকার বিভিন্ন চরিত্রের জীবন-তৃষ্ণা, জীবনাগ্রহ, জীবনাচারণ-একেবারেই প্রাত্যহিক এবং ইহলৌকিক। একজন সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃত্ত করা যেতে পারে- 'মৈমনসিংহ গীতিকার সমাজ, মঙ্গলকাব্য কিংবা কবিতার মত স্বর্গ কিংবা বৈকুণ্ঠ কামনা করে না-মর্ত্য জীবনের লাভ-ক্ষতির মধ্যেই ইহার জীবন-স্বপ্ন সীমায়িত'।

মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রসমূহের আত্মবিসর্জন বা আত্মত্যাগের পিছনেও কাজ করে পারলৌকিক মিলনাকাঙ্খা বা পূর্ণ প্রত্যাশা। মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন চরিত্র আত্মবিসর্জন করলেও সব কিছুর মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি তৃষ্ণা, অতৃপ্ত বাসনা ও বেঁচে থাকার আকাঙ্খা। মহুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা-তাদের কেউই প্রেমাস্পদকে মর্ত্যজীবনের বাইরে প্রত্যাশা করেনি। পরলোকে কিংবা অন্য কোনো জগতে তারা মিলনাকাঙ্খী নয়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের জীবনতৃষ্ণা বিপুল।

www.pathagar.com

মৈয়মনসিংহ গীতিকায় আমরা দেখি-আভিজাত্যের মিথ্যা অহংকারের কাছে জয়ী হয়েছে মানবতা, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মানুষের হৃদয়বৃত্তির জয়। মৈমনসিংহ গীতিকার প্রধান প্রধান চরিত্রসমূহ অন্তরের গভীরে সমাজ পার্থক্যকে স্বীকার করেছে। শাশ্বত মানবীয় আবেগ ও মূল্যবোধই মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্ম-শাস্ত্র-সমাজ তাদের আবেগের অনুসারী হয়েছে মাত্র। ময়মনসিংহ গীতিকার চরিত্রসমূহ প্রাণের সজীব স্পন্দনে মুখরিত, প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখর। শত নির্যাতন, নিষ্পেশনেও তাদের গতিরোধ করা যায় না। গীতিকার কবিরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নিজেদের আনন্দ-বেদনার কাহিনী ব্যক্ত করেছে।

ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের মধ্যে আরো রয়েছে-ছড়া, কবিগান, ঘাটু গান, যাত্রা, লাঠিখেলা, পুতুল নাচ, নৌকা বাইচ, বাইন্যার গীত, জারিগান, সারিগান, মুর্শিদী গান, মারফতী গান, পুঁথি পাঠ, শোক গাঁথা ইত্যাদি। চিরন্তন মানবিক বৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই রচিত হয়েছে লোকসাহিত্য। রচনার বহিরাঙ্গগত কাঠামো আধুনিকতার বিচারে ব্যক্তি-অপরিশীলিত। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ভাবের সর্বজনীন আবেদনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। লোকসাহিত্য কোনো ভাবেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমনের সৃষ্টি নয়। এতে সামষ্টিক এবং সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। সংগ্রামশীল মানবগোষ্ঠীর ঘটনাদীর্ণ বিবর্তনশীল জীবনধারার সকল স্পষ্ট স্বাক্ষর নিয়েই লোকসাহিত্য পৃথিবীর সবখানে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদের ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসাহিত্য-কাঠামোর সঙ্গে সমাজের সর্বমুখী আবেগ-অভ্যাস-আচরণের ঘনিষ্ঠ সাধর্ম্যের যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে; তা-ও অমূলক নয়।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.	ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ	কেদারনাথ মজুমদার, জেলা পরিষদ ময়মনসিংহ ১৯৮৭।
২.	বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ)	আবদুল করিম ১৯৯৯ বড়াল প্রকাশনী, ৩৬, বংলা বাজার, ঢাকা।
৩.	ভারত বর্ষের ইতিহাস	কোকা আন্ত্মনোভা, প্রগতী প্রকাশন,মস্কো।
৪.	ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অফ বেংগল	ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী।
৫.	ঢাকার ইতিহাস	যতীন্দ্র মোহন রায়।
৬.	কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র	অনুবাদ ডক্টর রাধা গোবিন্দ বসাক (১৯০১)।
৭.	বৃহৎ বংগঃ ঃ	দীনেশ চন্দ্র সেন।
৮.	ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা	১৯৮৭ময়মনসিংহ জেলা দ্বিশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
৯.	গাজীপুর জেলার ইতিহাস১৯৯৪	আবদুর রশীদ।
১০.	The Encyclopaedia of Bengal Bhear and orissa 1924.	Govt. of Bengal.
১১.	History of India	V.A. Smith.
১২.	The Garo Jungle Book.	REV. william Carey and others 1966.
১৩.	Garo Customary laws and poactices.	Julius Marak Ph.D. 1986.
১৪.	বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপায় ১৯০১, কোলকাতা।
১৫.	আরণ্য জনপদে	আবদুস সাত্তার, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার নভেম্বর/২০০০।
১৬.	বিক্রমপুরের ইতিহাস	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১৭.	তাওয়ারিখে ঢাকা	মুনশী রহমান আলী তায়েশ।
১৮.	বাংলায় ভ্রমণ (১৯৪০)	আসাম, বেংগল, রেলওয়ে বিভাগ।
১৯.	মধ্যকালীন ভারত	ইরফান হবিব সম্পাদিত।
২০.	বাংলার ইতিহাস	সুলতানী আমল, ডঃ আবদুল করিম।

www.pathagar.com